"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

দ্বাদশ বর্ষ]

[মূল্য দেড় টাকা

দ্বাদশ বর্ষ]

[মূল্য দেড় টাকা
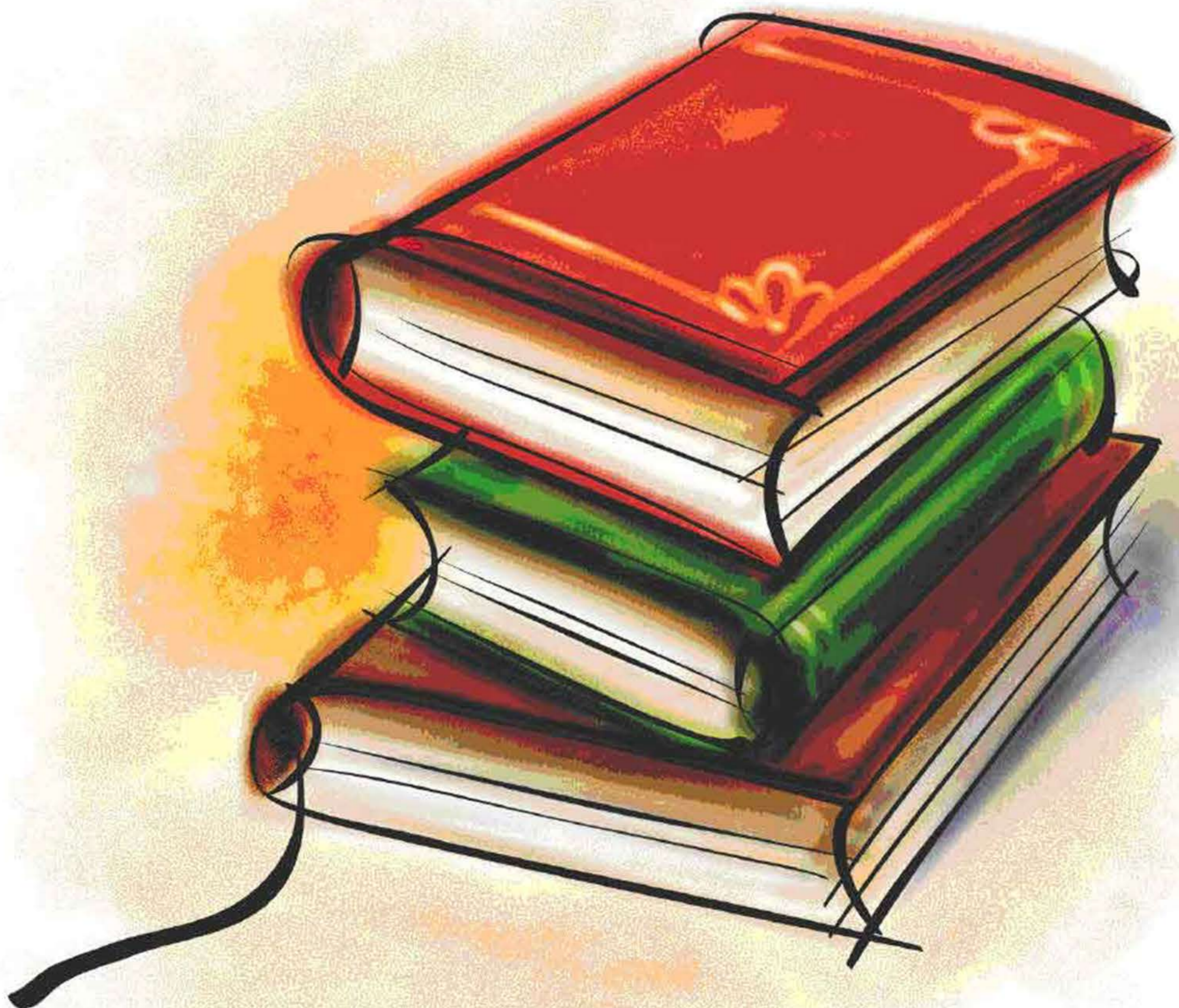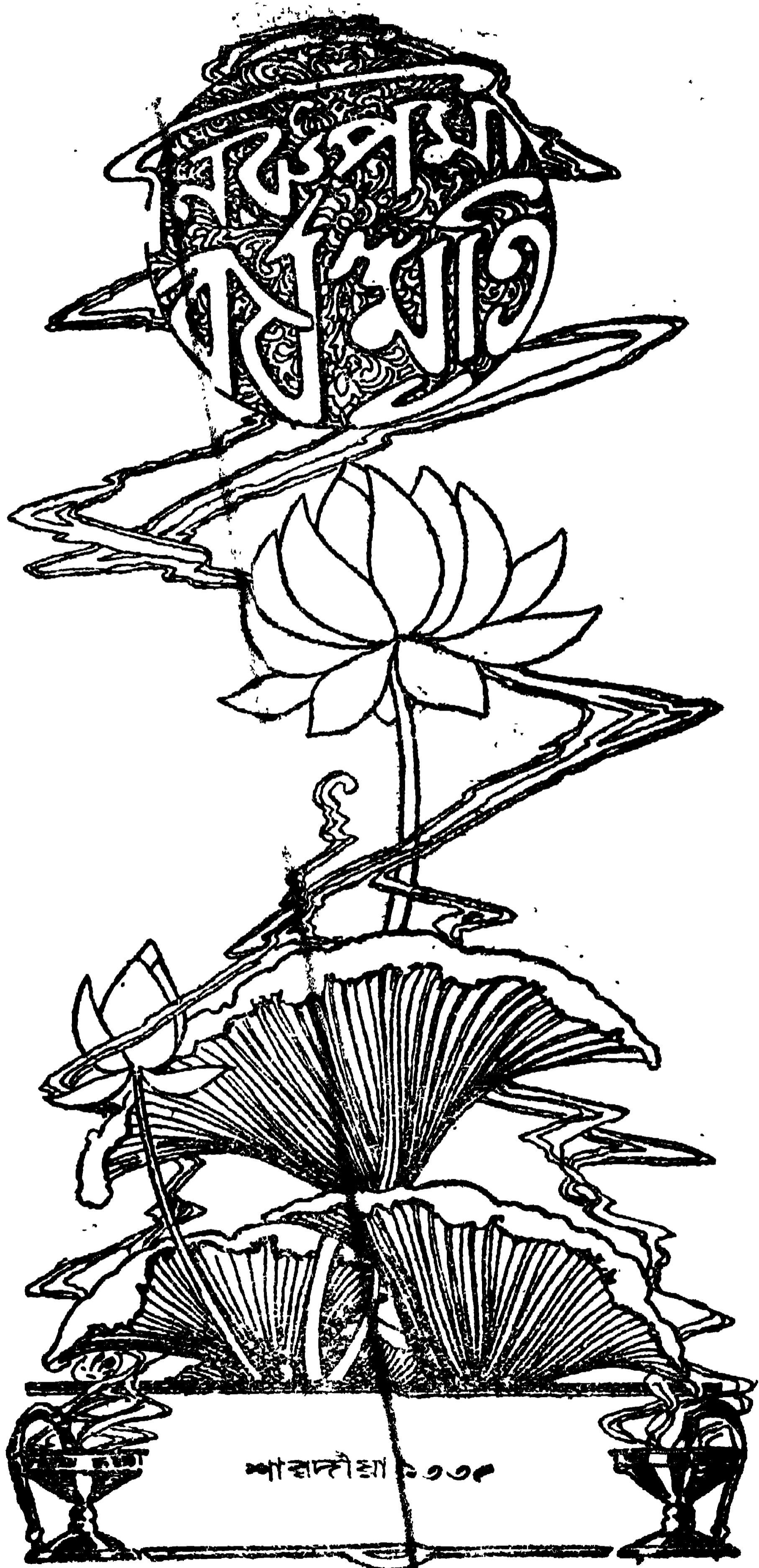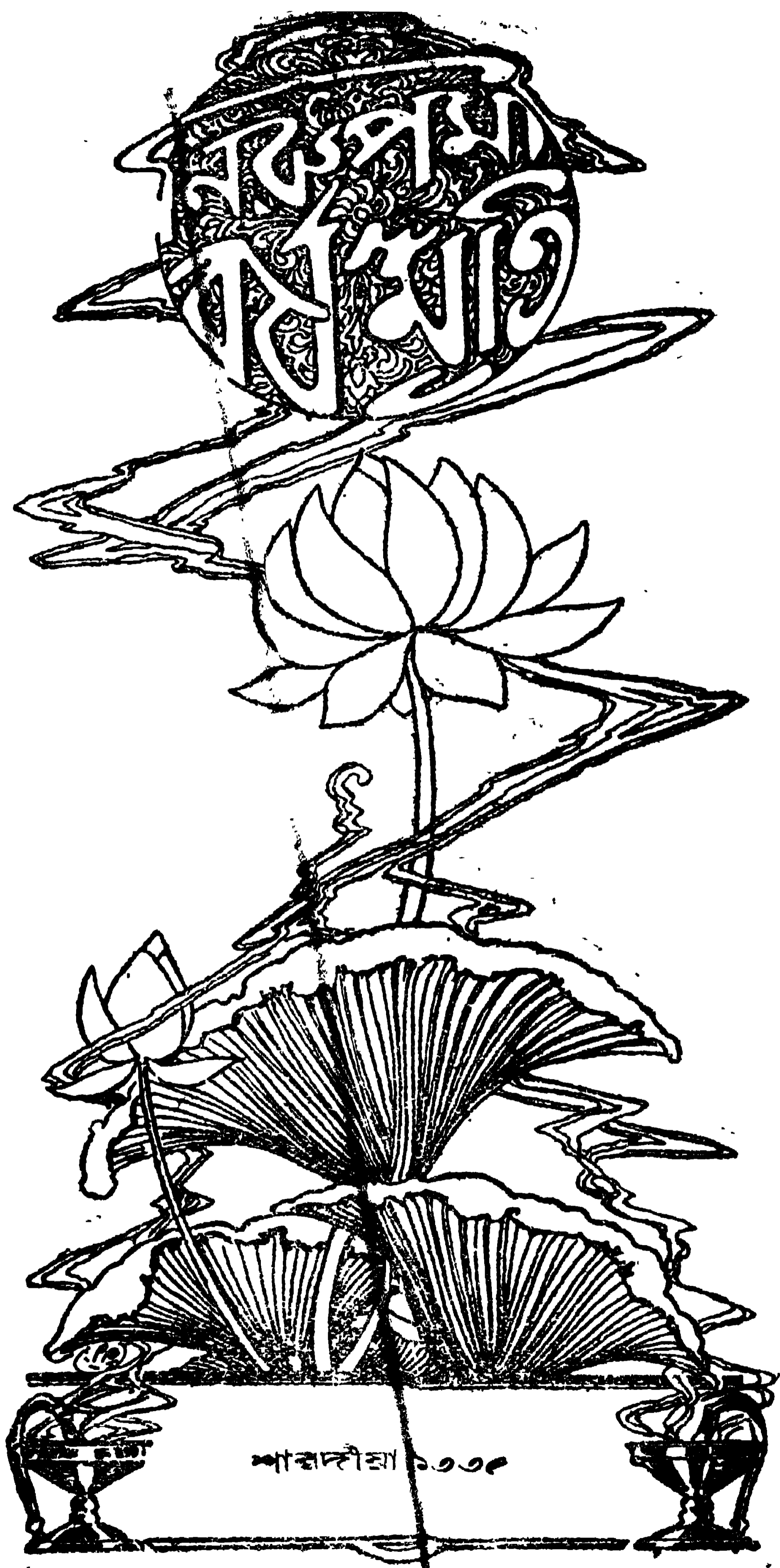
এমন সুন্দর

মন ভুলানো চোখ জুড়ানো

নিরুপমা-বর্ষস্মৃতি

ইচ্ছা করিলে আপনি

বিনামূল্যেও পাইতে পারেন।

কেমন করিয়া জানেন ?

পারফিউমারীর

হিমানী স্নো

তেল (হাউসহোল্ড ব্যতীত)

ট ক্রীম

এসেন্স (১ আঃ শিশি)

সঙ্গে দেওয়া করে "পুরস্কার কুপন"

রকম ২৫ খানা কুপন জমা করে ৩০শে ভাদ্রের মধ্যে নীচের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিন

বিনামূল্যে "বর্ষ-স্মৃতি"

পাইবেন। যদি ডাকে পাঠাবার দরকার হয়, তবে পাঠাবার জন্য ৫০ ষ্ট্যাম্প সঙ্গে দিবেন।

এমন বাঙালী গৃহস্থ কে আছেন—যাঁর সংসারে রকম মিলিয়ে ২৫টা জিনিস বছরে খরচ হয় না ?

কুপন পাঠাইবার ঠিকানা—

৪৩, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং,

কুপন হাতে বা রেজেষ্টারী করে পাঠাবেন, ২৫ খানার কম হ'লে উহা কোন কাজে আসিবে না।

হিমানী প্রেস
মুদ্রাকর—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস-সি
৮৩, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং,
৪৩, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

নিবেদন

এক যুগ পূর্ব্বে "বর্ষস্মৃতি" প্রথম বঙ্গদেশীয় সুধী পাঠক-পাঠিকার চিত্তপটে রেখাপাত করিয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবিকারাই এবার বর্ষস্মৃতি গাঁথিয়াছেন। এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি কি-না তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। আমরা মাত্র ইটুকু বলিতে পারি আমাদের সাহিত্য-ভগিনীগণ বর্ষস্মৃতির সম্মান সম্যকরূপেই রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।

চিত্র শিল্পের দিক দিয়া বর্ষস্মৃতি পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সে বিচারের ভারও অবশ্য পাঠক-পাঠিকার উপর।

"বর্ষস্মৃতি" কোনদিনই ব্যবসায়ের লাভ লোকসানের খাতা খতাইয়া বাহির হয় না; হইতে পারে না। একখানি সুপাঠ্য, সুন্দর, সুশ্রী, শোভন উপহার-গ্রন্থ হিসাবেই আমরা "বর্ষস্মৃতি" প্রকাশ করিয়া থাকি। ইহার জন্য যে প্রচুর অর্থব্যয়, অসামান্য শ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহা খতাইয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু "বর্ষস্মৃতি"র গ্রাহক-গ্রাহিকাদের মনে ও প্রাণে যে আনন্দ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে, তাহাই সকল শ্রম ও ব্যয়ের অঙ্ক পূর্ণ করিয়া দেয়।

পরিশেষে আমাদের লেখিকা মহোদয়াগণকে ও শিল্পীবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া এ বৎসরের মত বিদায় গ্রহণ করিলাম। অলমতি বিস্তরেণ—

শারদীয়া
১৩৩৫

সম্পাদকস্য

চিত্র-সূচী

পাঠ্য-সূচী

সারা বছরের
আনন্দ ও সুখের
স্মৃতি উজ্জ্বল
রাখিবার মানসে
নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতি
উপহার
দিলাম
শারদীয়া ১৩৩৫

মুক্তি

শ্রীধরিত্রী দেবী

১

মানুষ অবস্থার দাস—সত্য। কিন্তু যে অবস্থার দান দাসত্ব, সে অবস্থা-চক্রের নিয়ামক—ঐ মানুষই।

অবস্থাচক্রে অতখানি বিশ্বাস-স্থাপন করিতে হইয়াছিল ভৃত্যের উপর। সে অবস্থা এঁদের বাড়িতে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন কে তা জানি না। কিন্তু বিয়ের পর আসিয়া দেখিলাম চাকর-দের প্রতিপত্তি এ সংসারে খুব জাঁকাল। নফর খানসামার স্পর্দ্ধার অন্ত ছিল না। এমন কি বাড়ীর কর্ত্তা শ্বশুর ঠাকুরকে তামাক দিবার পূর্ব্বেও নফর কলিকায় টান দিয়া সেই উচ্ছিষ্ট তাঁর আলবোলার উপর বসাইয়া দিত। স্বামীর সঙ্গে লজ্জার সম্পর্ক কাটাইয়া উঠিবার পর গুরুজনের হিতকল্পে একদিন তাঁকে বলিলাম—নফরের ভারি স্পর্দ্ধা—বৈঠকখানার বাহিরে দাঁড়িয়ে বাবার তামাক উচ্ছিষ্ট করে।

স্বামী বলিলেন—বাবার হুকুমে

আমি বিস্মিত হলাম। একি কথা। আমার পিতৃগৃহে চাকর চাপরাশী এমন বেয়াদবীর স্বপ্নও দেখিতে পায় না।

আমি বলিলাম—হ্যাঁগা কি বলছ? গুরুজনকে উচ্ছিষ্ট দেবে? ছিঃ!

প্রভু বলিলেন—তুমি তামাকের রহস্য কি বোঝ, ইলা? তামাকের মাঝটা সার, তাই নফর টেনে ধরিয়ে দেয়। ওর মধ্যে বেআদবী নেই। রঘুনন্দনের উচ্ছিষ্টের নিয়মের বাহিরে গন্ধকূট।

আমি বলিলাম—লেখাপড়া শিখে তুমি মূর্খ। রঘুবাবুকে জানি না বটে। কিন্তু শোভন অশোভনের মোটামুটি একটা ধারণা আমার আছে। আমার বাবা সরকারের বড় ডাক্তার। তিনি তাঁর নিজের পাতের জিনিষ অবধি আমাদের খেতে দেন না।

"যে আজ্ঞে, পণ্ডিত-মশায়"—বলে নমস্কার করে স্বামী রণে-পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু এমন সাহস তাঁর হ'ল না যে নফর খানসামাকে শিষ্টতার শৃঙ্খলের মধ্যে আনেন।

একদিন নফরের অঙ্গে দেখিলাম স্বামীর একটা পিরাণ। আমার পিতার দান—মাতার বড় সাধের জামাইষষ্ঠীর উপঢৌকনের অংশ।

শ্বশুরকে বলিলাম—বাবা, নফর না ব'লে পিরাণ নেয়, গেঞ্জি নেয়।

সদাশিব শ্বশুর আমার—প্রথমটা শাসনের খুব আড়ম্বর। চীৎকার করে নফরকে ডাকিলেন। বিচারের পূর্ব্বেই চটি ছুঁড়ে তাকে প্রহার করিলেন। তারপর বলিলেন—পাজি, নচ্ছার, ওরাঙ্‌ ওটাং, সজারু—জামা কেন চুরি করে গায়ে দিয়েছিস?

সে চটিটা ঝাড়নে মুছিতে মুছিতে স্পষ্ট নির্লজ্জভাবে বলিল—আজ্ঞে, চাকরী করি আপনার বাড়ি আর চুরি করতে যাব কি দাদাবাবুর শ্বশুর বাড়ি?

শ্বশুর বলিলেন—শুনলে বৌমা বেটার কথা।—আসুক মেরে বেটাকে তুলোধুনে দিতে বলব।

স্বামী ফুটবল খেলে বাড়ী এলেন। নফরের অঙ্গে সেই পিরাণ। সে তাঁর পা ধুইয়ে দিল—চা তৈরি করে দিল—পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ হ'ল—নফরের চুরির কথা বা বে-আদবীর কথা মোটে উঠিল না। আমি পরের মেয়ে চুপ করে রইলাম। কিন্তু ভারি কষ্ট হ'ল। যে বাড়ীর শাসনের এমন শৃঙ্খলা সে বাড়ির চাকরদের সাহস বাড়িবার অন্তরায় তো কিছু ছিল না। পুরাতন ভৃত্যের কবিতার কথা উঠিলেই স্বামী বলিতেন আমাদের নফর হ'চ্চে কেষ্টা বেটা। কিন্তু অতি প্রশান্ত কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে নফরচন্দ্রের চরিত্রের সাদৃশ্য আমার চোখে কোনদিন পড়িত না।

২

আজ আমি বাড়ীর গৃহিণী। শ্বশুরঠাকুর স্বর্গে। স্বামী জমিদার। দশ বৎসরে এঁদের বাড়ির সব ঘর-করণা ক্রিয়া-কর্ত্তব্য বিধি-নিষেধ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছি। যারা তাঁর আমলে ছিল আমার চক্ষুশূল, শ্বশুরমহাশয়ের স্মৃতির অবমাননা হবার ভয়ে তাঁদের নিজের করে নিয়েছিলাম।

হারিয়ে তবে বুঝেছিলাম—তাঁর অমন স্নেহ ছিল কত পবিত্র কত উচ্চ। আর নফরের চোখের জল আমায় শিখিয়েছিল দয়া হীনকে কত আপন করে, উন্নত করে। তার উপর আমার বিদ্বেষ ম্লান হ'য়েছিল। তারও বেয়াদবী, স্পর্দ্ধার কথা-বার্ত্তা, চাল-চলন বাড়ীর কর্ত্তামহাশয়ের চিতায় ভস্মীভূত হ'য়েছিল।

এ বাড়িতে আর একজন ব্যক্তি ছিল যাকে আমি পূর্ব্বে কোনও দিন স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারি নাই। সে আমার এক দেবর সতীশ—স্বামীর পিস্‌তুতো ভাই। কুচরিত্র কটু-ভাষী সতীশ শ্বশুরঠাকুরের মৃত্যু-শয্যার উপর যখন আছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল তখন তার উপর আমার

স্নেহ জন্মিল। আমি একদিন স্বামীকে বলিলাম—সতীশঠাকুরপো বাবাকে এত ভালবাসতেন তা' জানতাম না। মায়া-মমতা সবার ভিতরই আছে।

স্বামী বলিলেন—ওতো ওর বাবাকে দেখেনি। বাবাও ওর সঙ্গে আমার কোনও প্রভেদ করে মানুষ করেন নি। ওর লেখাপড়া হ'লনা—নেশা ভাঙ করতে শিখলে সে ওর অদৃষ্ট।

তারপর সতীশ শুধরেও গিয়েছিল। সদর নায়েবের অধীনে সে কাজ শিখিতেছিল।। লক্ষ্মীশ্রী তার কথাবার্ত্তা, কাজে কর্ম্মে ক্রমে ফুটে উঠেছিল।

৩

কিন্তু আমাদের শাসনের অভাবে বা অবস্থার দোষে আবার ঐ দুজনের মধ্যে দোষ দেখা দিল। পরম্পরায় শুনিলাম নফর, কুঞ্জগোয়ালার বিধবা ভাইঝিকে চুরি করিয়া গান্ধর্ব্ব-বিবাহ করিয়াছে।

আমার নিজের দেবর ঝুনু কলিকাতায় পড়িত। সে একদিন বলিল—বৌ-দি সতীশ দা কলকাতায় গিয়ে মদ খেয়ে নাট্য-মন্দিরে কি সব কেলেঙ্কারী করে এসেছে। এখানে নফরাও তো বদ্‌মায়েস হ'য়েছে।

আমি বলিলাম—ভাই, আমি স্ত্রীলোক এসব কাজ তোমার দাদার। ওঁরা দু'জনেই তোমার বাবার আদরের ছিলেন"—

"তা ব'লে সকলের নাম ডুবাবে ?"

আমি ঝুনুর কথায় খুসি হইলাম। বলিলাম—"বম্ ভোলানাথ দাদাকে বল। আমি কিছু বললে বলেন—লোকের প্রাইভেট্ চরিত্রের আলোচনায় আমার অধিকার নাই।"

ঝুনু বলিল—দাদা হ'তে চান অজাত-শত্রু। যাক্ একটু চা করতো বউদি। দার্জ্জিলিঙ চা।

এঁদের বংশের ঐ ধারা। কঠোরতা এবং কর্ত্তব্য-বোধ আসে—কিন্তু তখনই চা কিম্বা সরবতের বন্যায় সেটা ভেসে যায়। স্বামী ঘরে ফিরে এলে এর একটা বিহিত করিবার সঙ্কল্প করিলাম।

৪

কিন্তু সেই রাত্রেই এক ভীষণ কাণ্ড আমাকে একেবারে পাগল করিল। সন্ধ্যায় কাপড় কাচিতে যাবার সময় আমার জননীর দেওয়া মতির সেলি আর শাশুড়ীর দেওয়া মতির মাস্তাসা বাক্সের উপর রাখিয়া গিয়াছিলাম। ডোর ছিঁড়িয়াছিল; সারা দুপুর এদের নিজের হাতে গাঁথিয়াছিলাম। আমার বিবাহ রজনীর দান—স্বর্গীয়া দুই গুরুজনের কত মঙ্গলের কামনা, কত শুভ-আশীর্ব্বাদ কত স্নেহ গাঁথা ছিল সেই মুক্তাগুলির সঙ্গে। কত ছেলেমানুষী লালসা,

কৈশোরের আশা, প্রথম যৌবনের গর্ব্ব প্রত্যেক মুক্তাটির সঙ্গে জড়ান ছিল। কক্ষে ফিরিয়া অলঙ্কার দুটি দেখিলাম না। মাত্র নফর সে ঘরে ঢুকিয়াছিল।

আমি কাঁদিলাম। স্বামীর অমঙ্গল, পুত্রের অশুভ, গৃহের অশান্তি আশঙ্কা করিয়া বালিকার মত কাঁদিলাম। স্বামী কলিকাতায়। ঘরে ছিল ঝুনু—সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনা-সঙ্ঘের শিবির হ'তে ফিরে এসেছিল বিশ্রামের জন্য। ছেলেমানুষ, ঘোঁড়ায় চড়ে, পাখি মারে, বহি পড়ে, কুচকাওয়াজ করে, সে নারীর অলঙ্কার চুরির বেদনা কি বুঝিবে? বাহিরে নায়েবের সহিত কি সব তদন্ত করিল, নফরকে জিজ্ঞাসা করিল, পুলিসে দিবার ভয় দেখাইল কিন্তু লুপ্ত আভরণের কোনও কিনারা করিতে পারিল না।

সে আমার কাছে আসিয়া বলিল—বৌদি কেঁদ না। তুমি কি তুচ্ছ হাজার, দেড় হাজার টাকার শোকে কান্নাকাটি ক'রছ। হাল ফ্যাসানের গহনা গড়িয়ে দ'ব।

মূর্খ যুবক। সেই অলঙ্কারের সঙ্গে যে আমার সারা জীবনটা গাঁথা ছিল সে কথা সে বুঝিল না। তাদের মূল্য দেড় শত টাকা কি দেড় পয়সা এ চিন্তা কোনো দিন মনে আসেনি। সে গুলা ছিল বলে নিজেকে বালিকা ভাবিতাম—যাঁরা স্বর্গে আছেন তাঁদের উপস্থিতি উপলব্ধি করে।

আমি বলিলাম—তুমি বুঝবে না ভাই বিয়ের যৌতুকের গহনার কি দাম! এ স্পর্দ্ধার একটা অন্ত হওয়া চাই। ও কি বলে?

"কথা কয় না। কেবল বলে সে নেয়নি। কিন্তু কথা গোপন করছে বোঝা যায়।"

ঝুনু আর কিছু বলিল না। নিস্তব্ধ হ'ল। তারপর আমার আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে টেরি কাটিল, গন্ধদ্রব্য মাখিল, আবার মাথা আঁচড়াইল আরও সাজিল। রাগিলে সে নীরবে সাজিত। মুখে প্রফুল্লতা ছিল না। চক্ষু হ'য়েছিল স্থির, পলক-হীন।

৫

রাত্রে কত স্বপ্ন দেখিলাম—বাবা, মা, শ্বশুর, শাশুড়ী, বৃদ্ধা ঝি, পিসিমা। বুকের উপর কে যেন পাথর চাপাইয়াছিল। দেহে শয্যাত্যাগ করিবার সামর্থ্য নাই। মাথার ঘি গলিয়া টল্‌মল্ করিতেছিল।

সেই এলোমেলো মাথায় এলোমেলো চিন্তার ধারা। কিছু টাকা নিয়ে নফর জিনিষগুলা ফেরত দেয় না। দর্পা গোয়ালিনীকে দু'খানা সোণার গহনা দিলে সে আমার মুক্তার অলঙ্কার দুটা দিতে পারে। ঝুনু কেন একবার সে চেষ্টা করুক না। ছেলেমানুষ সে, নায়েব মহাশয় পর। তারা কি করিবে? যত দোষ স্বামীর। তিনি কলিকাতায় কি করেন—বাড়ীতে তাঁর মন বসে না কেন? সকল শোক, সকল মনোবেদনা এক হিমালয় প্রমাণ অভিমানের আকার

'নারী-পূজার অন্তরালে'—

শ্রী নরকৃষ্ণ বসু

ধারণ করিল এবং সেই গুরু-ভারটি স্বামীর শিরের উপর চাপিল। বাহিরে শুনিলাম একটা গণ্ডগোল। ঢোলের বাজনা, বালকদের কণ্ঠনাদ, রাসভের চীৎকার আর একটা বুক্ ভাঙা আর্ত্তনাদ।

বারান্দার ঝড়োকার ভিতর দিয়া দেখিলাম। একি বিভীষিকা। একটা গাধার উপর নফর -পিছনে কোঁচা সামনে কাঁচা। পিরাণের বোতাম পিঠে, একদিকের গোঁফদাড়ি কামানো। মাথার অর্দ্ধেকটা মুণ্ডিত তার উপর হ'তে ঘোলের ধারা প্রবাহিত। গলায় একটা হাঁসুলি তাতে লেখা—"বিশ্বস্ত ভৃত্য—বৌরাণীর অলঙ্কার চোর—কলির অবতার।"

সে ফুফারিয়া কাঁদিতেছিল—আর্ত্তনাদ করিতেছিল। সামনে ঢুলির দল। তারপর আমাদের জনক তক তকমাধারী বরকন্দাজ আসামোটা হাতে। তাদের পিছনে গর্দ্দভারূঢ় নফর এবং শেষে ছেলের দল।

ঝুনু গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি।

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। একি কাণ্ড! পিতার আমলের ভৃত্য—এখনও তার দোষ প্রমাণ হয়নি। ছেলেমানুষ ঝুনু—অভিসম্পাতের আশঙ্কায় তাকে ডাকাইলাম। সে কঠোর, নির্ম্মম। বলিল—স্পর্দ্ধার একটা অন্ত আছে। বৌদি তোমার কান্না—

সে কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম—লক্ষ্মী ভাই আমার। আর আমি কাঁদব না। ছিঃ! এত নিগ্রহ মানুষকে করতে নাই।

সে শুনিল না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে বাহিরে গেল। সেদিন হাটবার। শোভাযাত্রা হাটের মধ্যে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রত্যুষে কেহ আর নফরের সন্ধান পাইল না।

৬

পূজার ছুটির ভিড়। গাড়ি রিজার্ভ ছিল হরিদ্বারের। কাশীতে স্বামীর বন্ধু টানাটানি করিল—তাঁর বৃহৎ অট্টালিকা—মাত্র তিনি ও তাঁর স্ত্রী—বিশ্বেশ্বর দর্শন না ক'রে যাওয়া বিধেয় নয়। যখন গঙ্গার এপার হ'তে বারাণসীর প্রথম দৃশ্যটা দেখিলাম তখন লোভে প্রাণ নাচিয়াছিল। বাঁধাঘাটের সারি আর মন্দিরের চূড়ার শ্রেণী; তাদের উপর পড়েছিল সূর্য্যের কিরণ আর তাদের নীচে বহিয়া যাইতেছিল—তরল লাবণ্যে মা ভাগিরথী। রজনী বাবু বলিলেন—"আপনি একটু হুকুম করুন তো"—আমি দেবরের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলাম। আর তাঁকে কে পায়। তিনি স্বামীকে মারিতে লাগিলেন—"ষ্টুপিড গাধা, পাপী। বিশ্বনাথ দেখা কি তোর ভাগ্যে। যা তুই যেথা ইচ্ছা যা। ভায়া তোমার বৌদিদিকে নামাও। আমি মালপত্রের বন্দোবস্ত করছি। এস আমার বাবা এস।"

তিনি খোকাকে নামালেন, ঝুনু আমাকে। স্বামী হতভম্ব হইয়া বন্ধুর আদরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

রাত্রে আমাদের মজলিস্ বসিল। স্বামী বলিলেন—এই বিদেশের কাজে নফরা বেটার জুড়ি ছিল না।

আমি বলিলাম—আর ও অপ্রিয় কথা ওঠাবার দরকার কি?

স্বামী বলিলেন—ঝুনু তুই গঙ্গাস্নান করে প্রায়শ্চিত্ত করে যা, মিছিমিছি—

"দাদার ঐকথা! তোমার আস্কারায় ওর অত স্পর্দ্ধা হয়েছিল।"

আমি মধ্যস্থ হয়ে বলিলাম—আর পরের বাড়িতে ভ্রাতৃ-বিরোধে কাজ নেই।

তিনি বলিলেন—আমি সত্য বল্‌চি আমার মন বলচে চুরি নফরা করেনি। আমার একটা ছোট সন্দেহ বলিনি। সে চোরকে জানত কিন্তু তার পাপ ঢাকবার জন্যে এতটা লাঞ্ছনা-ভোগ করলে। চোরকে তোমরা জান।

ঝুনুর ও আমার দৃষ্টির দ্বারা পরস্পরের মনের কথা উভয়ে উভয়কে জ্ঞাপন করিলাম, উভয়ে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলাম—ছিঃ!

তিনি বলিলেন—বাবা বিশ্বনাথ যেন করেন যে আমার সন্দেহ ভুল—ঝুনুর বিচার ঠিক।

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বলিলাম—তথাস্তু।

৭

আমি অশোকাকে স্পষ্ট বলিলাম- যদি এত করতো কালই পালাব। টিকিট কেনা আছে। আর যদি ধীরে সুস্থে থাকতে দাওতো দু'চার দিন কাশীবাসী হই।

সে বলিল, কি করছি ভাই? আচ্ছা আজ শেষ। কাল থেকে বজরার বন্দোবস্ত তোমরা কর।

ভাগিরথীর বুকের উপর বজরা ভাসিতেছিল। যেন পৌরাণিক যুগের একটা স্বপ্নের মত; ঘাটের পর ঘাট মন্দিরের পর মন্দির চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। এত ভিন্ন পোষাক, এক বিভিন্ন ভাষা, এত রকমারি আচার ব্যবহার—তবু যে হিন্দু জাতি এক, তা যেন ঘাটে ঘাটে জনসঙ্ঘ চীৎকার করে ঘোষণা করিতেছিল। হিন্দুজাতির কেন, ভারতবাসীর একতা ঘোষণা করিতেছিল এই পবিত্র প্রাচীন নগর। শিবালয় ঘাটে বাঙ্গালী, টেলেগু, টামিল পূজারিণীর পার্শ্বে তিনজন মুসলমান নমাজ করিতেছিল।

স্বামী বলিলেন—ওঃ! এ কথাটা এতদিন কেন মাথায় আসেনি?

রজনী বাবু বলিলেন—কি আবার তোর মাথায় এল?

"মুসলমানের নমাজের ওঠ বোস গুলা নিরর্থক ভাবতাম। এখন পাশাপাশি দেখে বুঝছি ওগুলা আসন ও মুদ্রামাত্র। মহাপুরুষদের ভাবধারার মধ্যে একটা ঐক্য আছে।"

ঝুমু মুগ্ধ হইল। রজনী বাবু স্বীকার করিলেন আমার স্বামীর একটু বুদ্ধি আছে। আমরা হাসিলাম। অশোকা বলিল, সত্যই তো। কেবল অন্ধ আমরা তাই ভেদ দেখি ঐক্য দেখিনা।

যখন আমরা হনুমান ঘাটে তখন একটা মহা কলরব উত্থিত হল। অস্পষ্ট শব্দের মধ্যে বুঝিলাম আমাদের বজরাকে ঘাটে ভেড়াবার অনুরোধ।

বাবুরা ঘাটে নামিলেন। একটা সন্নাসী একটা স্ত্রীলোককে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। দর্শকেরা দুই দলে বিভক্ত হয়েছে। একদল সন্ন্যাসীর পক্ষে অপর দল তাহার ভণ্ডামীর মুণ্ডপাত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। বিচার কর্ত্তারূপে আহুত হয়েছেন আমাদের বাবুরা।

স্ত্রীলোকটার মুখ দেখিলাম—যুবতী সম্ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইল। কি সর্ব্বনাশ! কি অত্যাচার!

সন্ন্যাসীকে দেখিলাম কণ্ঠস্বর শুনিলাম। কি ব্যাপার! তার একহাতে যুবতী অপর হস্তে সে আমার দেবরকে ধরিল। বলিল, দাদাবাবু বংশের কলঙ্কের জন্য লাঞ্ছনা সহ্য করেছি। কিন্তু তখন বুঝিনি আমাদের বৌরাণীর গহণা এই—

কি কথা! সত্যই তো! আমার শেলি আমার মান্তাসা এই স্ত্রীলোকটার অঙ্গে। আমি বজরার উপর দাঁড়িয়ে উঠিলাম। সন্ন্যাসী আমাকে দেখিল। সন্ন্যাসী নফর!

"বৌরাণী, নফর চোর না মা। সে যখন ঘরে ঢুকেছিল দেখেছিল কে বেরিয়ে গেল। চুরি ধরাপড়বার পর আমি সময় পাইনি তার সঙ্গে কথা কহিতে, তবে নামটা বলিনি চুরি করতে তো দেখিনি আর ঘরের কথা—কর্ত্তাবাবু ছেলেদের মতই—

ঝুমু চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল—কোথা পেলে চুরির গহনা?

স্ত্রীলোকটা ধীরে ধীরে গহনা তার হাতে দিয়ে বল্‌লে—আমায় পুলিসে দেবেন না আমার কি দোষ? সতীশ বাবুর দান—

"সতীশ বাবু!"

"সতীশ বাবু!"

"সতীশ বাবু! কোথা সে?"

আর একজন সন্ন্যাসী তাকে ধ'রেছিল। সে বাহুতে চোখ ঢেকে কাঁদছিল।

৮

রাত্রে মজলিস বসিল। ঝুমু তার পায়ে ধরিতে গেল, আমি কত তোষামোদ করিলাম,

স্বামী বুঝাইল। নফর অটল অচল। সে বলিল—গুরুবল্ যে মরবার আগে বিশ্বনাথ জানিয়ে দিলেন আমি নিষ্পাপ।

অমি বলিলাম—অলঙ্কার দু'টো ভাগিরথীকে দান করি। ওর অঙ্গে উঠেছিল।

নফর বলিল—না বৌরাণী। মঙ্গলের জিনিস। বাবা সব শুদ্ধ করেন। যিনি নফরকে শুদ্ধ করেছেন মুক্তা কোন ছার। বাবার মাথায় ঠেকিয়ে নাও।

অশোকা নীরবে সব শুনিতেছিল। সে খোকাকে নফরের কোলে দিয়া বলিল—সন্ন্যাসী বাবাজী এবার বাবা কেমন তোমায় মুক্তি দেন্ দেখি।

এবার তার বাঁধ ভাঙ্গিল, সে তাকে বক্ষে ধরে কাঁদিতে লাগিল। "বংশের দুলাল—বাবুর নাতি—বাঁধিসনি, বাঁধিসনি বাবা আমাব। সবার মায়া তুচ্ছ কিন্তু তোর—

সে কাঁদিতে কাঁদিতে তার মুখ-চুম্বন করিল। কাতরকণ্ঠে বলিল—দাদাবাবু! দাদাবাবু—বেঁধো না।

চোখ মুছিতে মুছিতে স্বামী খোকাকে তার কোল থেকে নিয়ে বলিলেন—না, ভাই তুমি মুক্ত। আমরা বছরে বছরে এসে তোমায় দর্শন ক'রে যা'ব।

ছিন্নতার　　　　শ্রীহাসিরাশি দেবী

চাদর-চরিতামৃত

ভারতবর্ষের নানারূপ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে চাদর অন্যতম। আবার ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে বঙ্গদেশের উপর ইহার আধিপত্য ছিল প্রচুর। ইংরাজীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চাদরের মাহাত্ম্য লোপ পাইতে থাকে ফলে দেশে নানা প্রকার উন্নতিবিধায়িনী সভার সৃষ্টি হয়; তন্মধ্যে "চাদরনিবারণী সভা" অন্যতম। ১৯০৬ সালের স্বদেশী আন্দোলনের ধাক্কায় চাদরনিবারণী সভা লুপ্ত হয়; তাই ননকোঅপারেশনের যুগে আবার খদ্দরের চাদরে বাঙ্গালীর তনু আবৃত হইতে দেখা যায়। চাদরনিবারণী সভার এক প্রেসিডেন্ট চাদর সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন—চাদরনিবারণী সভা যখন ইনসলভেন্সী ফাইল করে তখন অফিসিয়াল এসাইনির নিলামে ঐ সভার কাগজপত্র একব্যক্তি নগদ সওয়া পাঁচ আনায় খরিদ করিয়া ফেলে। শিল্পী বিনয়কৃষ্ণ চটিজুতা খরিদ করিতে যাইয়া উক্ত কাগজের এক তা জুতার আবরণরূপে পান। সভাপতি মহাশয় নিজের 'থিসিস'টিকে সম্পূর্ণরূপে মানববোধগম্য করিতে যাইয়া চাদরের ব্যবহারপ্রণালী পেন্সিলের সাহায্যে প্রকটিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহা শিল্পী বিনয়কৃষ্ণের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই—সভাপতির প্ল্যানটা অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার মগজে গজগজ করিতে লাগিল ফলে যাহা হইল তাহা নিম্নে অবলোকন করুন—

প্রাইমিটিভ বা পুরাকালের বন্ধন

পাগড়ী হইতে চাদর কিরূপে প্রথমে বাঙ্গালীর গলদেশে চাপিয়া বসিয়াছিল ইহাতে তাহার সূচনা পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে "পরামাণিক" শ্রেণীর মধ্যে ইহার অস্তিত্বে কিছু কিছু অনুভব করা যায়।

পরবর্তী অনেকগুলি স্তরের কোন প্রমাণপত্র পাওয়া যাইতেছে না কিন্তু বিদ্যাধরীর পুনঃ-সংস্কারকালে ঐ সমস্ত নির্গত হইবে অনেক বিশ্বগ্রাসী ঐতিহাসিক এমত অনুমান করেন।

অ'বেষ্টন

অর্থাৎ ঢিলাভাবে মোড়াই যাহাকে ইংরাজেরা Loose packing বলে—ভট্টাচার্য্যগণ এই প্রথার উদ্ভাবনা করেন বোধ হয় ব্রহ্ম-তেজ নির্গত হইবার পথ রাখিবার জন্যই এরূপ পন্থার প্রচলন হয়।

হস্তাবেষ্ট

ভট্টাচার্য্যের বিদ্যা যখন অন্তর ছাড়িয়া বাহিরে পৌঁছিল অর্থাৎ যখন ভট্টাচার্য্যের দল নিজেদের মূর্খতা চাপা দিবার জন্য ঘনঘন নস্য লইতে লাগিলেন—এটা নিশ্চয়ই আকবর বাদশার আমলের পরে, কারণ তখনও পর্য্যন্ত ভারতে তাম্রকুটের প্রচার ছিল না এইরূপ ধারণা সাধারণে প্রবল কিন্তু পূর্ব্বে তাম্রকুট কথাটার অস্তিত্ব ছিল অনেক পণ্ডিত এরূপ সন্দেহ করেন।

না করিয়া প্রাচুর্য্যের জন্যই আক্ষেপ করিতেন। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালীরা যে নিজেরাই প্রত্যেকেই এক একটি সজীব মমী একথাটা তাঁহার মাথায় আসে নাই কেন জানি না।

মণ্ডলাকার

ব্রাহ্মণ যখন মস্তিষ্কের চর্চ্চা ছাড়িয়া উদরের চর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন তখন চাদর হস্ত হইতে উদরের পরিধি বেড়িয়া "অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তযেন চরাচরং" হইয়া দাঁড়াইল। পল্লীগ্রামে এখনও ইহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। (সভাপতি মহাশয় সখেদে বলিয়াছেন—ভারতবর্ষ সভ্য হইলে কি হয় উহারা 'মমী' করা বিদ্যা না জানায় প্রাচীন কিছুর প্রমাণ ও নিদর্শন সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে) তখন এত 'খনন' অর্থাৎ মাটী খোঁড়ার উপদ্রব বোধহয় ছিল না, থাকিলে সভাপতিমহাশয় বোধহয় অভাবের জন্য খেদ

ছত্রবন্ধ

পল্লীগৃহস্থগণ কুটুম্ববাড়ী যাইবার সময় এই সহজ উপায়ে রথদেখা ও কলাবেচা নামক উভয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন চাদর আছে তাহাও প্রমাণিত হইত এবং ভগ্ন ছত্রটিকেও কোনরূপে ব্যবহার্য্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া যাইত।

গোমস্তা-পুঙ্গব

জমিদারী সেরেস্তার কাজ করিয়া দিব্য দুই পয়সা অর্জ্জন করিলেও যাহাদের পোষাক পরিচ্ছদে স্বাচ্ছল্য বিকাশ করিবার নানা অন্তরায় থাকিত তাহারা এইভাবে মলিন চাদর কাঁধে ফেলিয়া প্রভু সন্দর্শনে যাইতেন।

হাফ্ রাউণ্ড বা অর্দ্ধচন্দ্র

বাংলার জমীদারগণ প্রজাপুঞ্জের শোণিত পানে প্রায়ই "ব্যূঢোরস্ক বৃষস্কন্ধঃ" হইয়া থাকেন তবে "শালপ্রাংশু মহাভুজঃ" হইতে ক্বচিৎ কাহাকেও দেখা যায় তাঁহাদের স্কন্ধে কুঞ্চিত চাদরের শোভা সেকালে দেখিবার জিনিস ছিল অধুনা তাঁহারা "হ্যাটকোটপ্যাণ্টাবৃত" থাকেন—সুতরাং এদৃশ্য অন্তর্হিত প্রায়।

গৌরী মূর্ত্তি প্রাচীন চিত্র হইতে

কেরাণী প্যাঁচ

(মধ্যযুগের) স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে কেরাণীদিগের বক্ষে কিঞ্চিৎ বল হইয়াছে দু'একটা ষ্ট্রাইকে তাহা প্রকাশ হইয়াছিল ইহাঁরা এখন দলবদ্ধ হইয়া ফিজিকাল কালচার করেন অর্থাৎ ফুটবল খেলা দেখিতে মাঠে যান—অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন দূর করিবার জন্য দ্বিপ্রহরে রাস্তার ধারে হোটেলে যাহার তাহার প্রস্তুত চা খান আর দেশের উন্নতির জন্য পাড়ায় পাড়ায় নাট্যকলার চর্চ্চা করেন—মিটিংয়েও যান আবার হরতালের দিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও অফিস যান। ইহাঁরা কোথায় গিয়া যে ঠেকিবেন তাহা ভবিষ্যৎও বোধ হয় বলিতে পারে না।

জামাই বন্ধন

এঁরা শ্বশুরবাড়ীর যাত্রী, যাত্রার সময়ে একটু আধটু কায়দা, বেশ ভূষার পারিপাট্য করা অস্বাভাবিক নয়—নিজেকে অন্ততঃ এই দিনের জন্য 'সুদর্শন' করিবার প্রয়াস গোবর-গণেশদের মনেও জাগে ইহা প্রবাদ আছে।

বাবু বন্ধন

বাপের অন্নধ্বংস করিয়া যাহারা নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়ায় তাহারই এ যুগের আদি ও অকৃত্রিম বাবু—ইহা তাহারই একটি নমুনা

কবিবন্ধন

যে সব জিনিষের বন্ধনে কবিরা নিপতিত হন ইহা তাহা নহে—কবি যাহা কামনা করেন তাহাকেই ফাঁদে ফেলিবার জন্য এত উদ্যোগ আয়োজন—কিন্তু শেষটা সবই কল্পনার মত 'অলীক স্বপন' হইয়া দাঁড়ায়।

সেরেস্তাদারী প্যাঁচ

আদালতের সহিত আত্মীয়তার সৌভাগ্য যাঁহারা রাখেন তাহারা মদনমোহন প্যাঁচ ভুলিতে পারিবেন না।

কেরাণী

(সেকালের) বন্ধন নহে মুক্ত—ভাঁজ করিয়া রাখার মধ্যে Economyর প্রচ্ছন্ন পাণ্ডিত্য; মুখে—দারিদ্র্য, চক্ষে—নৈরাশ্য মূর্ত্ত জগতে ইহার মত দুকুলহারা আর কেহ নাই।

উকিলী প্যাঁচ

আকুলি বিকুলি করিয়া "ন্যুব্জপৃষ্ঠ কুব্জদেহ শ্যেনদৃষ্টি উকীলবাবুর ক্ষীণবপুকে Cross wise ভাবে জাপটিয়া ধরে—যেন সর্ব্বভুকের পূর্ণ প্রতীক্।

দোদুল-দুল

এঁরা হচ্চেন ধ্বংস পথের যাত্রী, সুতরাং বাধা বিপত্তি কিছু মানেন না। এঁদের চাদর বিন্যাসেও যথেষ্ট চাতুর্য্য দেখা যায় কেন না এটা শিক্ষিত পটুত্ব—অধীত উচ্ছৃঙ্খলতা। চাদরটা অনেক সময় Danger signalএর কার্য্য করে মনে করিয়ে দেয় "Beware of PickPockets."

সম্পাদকীয়

বয়স যতই কম হউক না কেন গোঁফের রেখা টুকু মুড়াইয়া খদ্দরের পাঞ্জাবী ও চাদরে বর বপু আবৃত করিলেই সম্পাদকীয় গাম্ভীর্য্য পাওয়া যায় ইহা সম্পাদক-পদলাভেচ্ছুগণের বদ্ধমূল ধারণা—বিশেষতঃ চাদরের এই চাতুর্য্যে চমকিত হয় না এমন লোকই নাই—শ্রমিক নেতা হইবার জন্য, বক্তৃতা দিবার জন্য মোটের উপর দেশের যে আপনি হিতকামী তাহা ব্যক্ত করিবার ইহাই একমাত্র পন্থা এবং দেশের কার্য্যে লাগিবার, চাঁদা তুলিবার এবং তাহা পরিপাক করিবার ইহাই একমাত্র পাসপোর্ট নান্যেব গতিরন্যথা।

ছোট্টুর মা

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

এক

গুর্খা ছোট্টুর মাকে সকলে বুড়ী বলিলেও বাস্তবিক সে বৃদ্ধা ছিল না, তাহার বয়স তখনও প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করে নাই। কিন্তু প্রকৃতিতে তাহাকে বৃদ্ধা বলিয়াই মনে হইত।

ছোট্টুর মা'র এই অকাল বার্দ্ধক্যের হেতু অতিরিক্ত কঠোর শ্রম ও চিন্তা। সচরাচর শ্রমিকদের ঘরে মেয়েদের যেরূপ কষ্টসাধ্য কাজ করিতে হয়, ছোট্টুর মা'কে তা'র চেয়ে অনেক বেশী করিতে হইয়াছিল। শৈশবে পিতৃহীন ছোট্টুর পিতার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার লালন পালন ও ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার পথ সুগম করিবার জন্য ছোট্টুর মা প্রথম জীবনে এত বেশী খাটিয়াছিল, যে অনেক পুরুষের পক্ষে সেরূপ পরিশ্রম সম্ভবে না।

ছোট্টুর পিতা পার্ব্বত্যপ্রদেশ 'টিরি' রাজসরকারের অধীনে সৈনিকের কাজ করিত। ভরা যৌবনে সুস্থ সবল দেহ লইয়া সে বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছিল। ছোট্টু তখন নিতান্ত শিশু। ছোট্টুর মা'র বয়সও তখন অল্প। এই পূর্ণযৌবনা বিধবাকে বিবাহ করিবার জন্য অনেক গুর্খা সিপাহীই তখন লালায়িত হইয়াছিল, বিধবাবিবাহ তাহাদের ধর্ম্মে বাধে না, তথাপি বোধ করি ছেলেটীর মুখ চাহিয়াই ছোট্টুর মা তাহাতে সম্মত হয় নাই।

স্বামীর মৃত্যুর পর সে ছেলেটীকে লইয়া 'টিরি' রাজ্য ত্যাগ করিয়া দেরাদুনে চলিয়া আসিল। দেরাদুন সহরের বাহিরের একটী ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে বাস করিত ছোট্টুর মা'র এক দূর সম্পর্কীয় জ্যাঠা, বৃদ্ধের পুত্রকলত্র কেহই ছিল না, থাকিবার মধ্যে ছিল একখানা টিনের চাল দেওয়া মেটে বাড়ী, আর খানিকটা জমী। সে পূর্ব্বে চা বাগানে 'বেলদারের' কাজ করিত, এখন আর পারে না। ঐ জমীটুকুতে চাষবাস করিয়া নিজের উদরান্নের সংস্থান করিয়া লয়।

অনাথা ছোট্টুর মা অনন্যোপায় হইয়া ভাগ্যহীন শিশুপুত্রটীকে লইয়া এই জ্যাঠার কুটীরে আশ্রয় লইল। যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত সৈনিকের স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্য রাজসরকার হইতে কিছু বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল, সে বৃত্তি দুটী প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে যথেষ্ট নহে, কিন্তু জ্যাঠার

আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার চাষবাসের কাজে সাহায্য করিয়া, ছোটুর মা সেই সামান্য আয়েতেই তাহার একমাত্র সন্তানটীকে বুকে বুকে রাখিয়া এমনভাবে মানুষ করিতেছিল যে সেরূপ অকৃত্রিম স্নেহযত্ন ও আদর বোধ হয় অনেক রাজপুত্রের ভাগ্যেও ঘটে না।

ছোটুর বয়স যখন আট বৎসর, তখন ছোটুর মা'র আশ্রয়দাতা সেই জ্যাঠাও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রীর যত্নসেবায় তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ তাঁহার বাড়ী ও জমীটুকু তাহাকেই দান করিয়া গেলেন।

সেই বাড়ীতে বাস করিয়া, জমীতে চাষ করিয়া ছোটুর মা ছেলেটীর জীবন যাহাতে নির্ব্বিবাদে স্বচ্ছন্দে অতীত হয়, কঠোর পরিশ্রম ও যত্নসহকারে সেই প্রচেষ্টাই করিতে লাগিল। তাহার সে চেষ্টা ও শ্রম ব্যর্থ হয় নাই, গ্রামের মধ্যে এখন ছোটু একজন গৃহস্থ, ক্ষেত খামারের কাজ সে এখন নিজেই দেখে, বৃদ্ধা মাতাকে খাটিতে দেয় না।

যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ছোটু একবার যোদ্ধা পিতার মত সৈনিক বিভাগে ভর্ত্তি হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু ছোটুর মা স্বামীর অকালমৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া, বিস্তর কাঁদিয়া কাটিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল, এবং যৌবন-বলদৃপ্ত উদ্ধত পুত্রকে ঘরে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য সে তখন আর এক নূতন নিগড়ের সন্ধান করিতে লাগিল। সন্ধান শীঘ্রই মিলিল।

পাশের গ্রামের গুর্খা কৃপাণ সিংয়ের মেয়েটী বেশ বড় সড়, দেখিতেও সুন্দর, তাহাকে বধূরূপে মনোনীত করিয়া ছোটুর মা পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ পাকাপাকি করিয়া ফেলিল। এই কার্ত্তিক বাদে অগ্রহায়ণের প্রথমেই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া নববধূ ঘরে আনিবে, এই আশা মনে রাখিয়া বুড়ী হৃষ্টচিত্তে দিন গণিতেছিল, এবং ভাবী বধূর জন্য নিজ পছন্দ ও সাধ্যমত বস্ত্রালঙ্কারের যোগাড় করিতেছিল, তা'র কত সাধের কত দুঃখের ধন ছোটু,—তার আবার বউ আসিবে।

দুই

ছোটুদের গ্রামকে ঠিক গ্রাম বলা চলে না।

চাবাগানের কাছাকাছি, গাছপালা লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন একটা বিস্তীর্ণ সমতল শ্যামল ভূমি, সেইখানে দূরে দূরে পনেরো কুড়ি ঘর বসতি। অধিকাংশই কৃষিজীবির পর্ণকুটীর, দুই চারিখানি বাড়ী উহারই মধ্যে একটু বড় ও শ্রীসম্পন্ন। ছোটুর মার আবাসগৃহ এই শ্রেণীর, তবে গ্রামের একেবারে শেষ সীমানায়, সেজন্য স্থানটা আরও নির্জ্জন ও বনাকীর্ণ। একেবারে কাছে না গেলে গৃহের অস্তিত্ব কেহই বুঝিতে পারিত না।

গাছে গাছে মেশামিশি হইয়া শাখা প্রশাখার নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া স্থানটাকে এমন

ছায়াপূর্ণ ও শুষ্ক করিয়া রাখিয়াছিল, যে গোধূলির রক্তিমরাগটুকু নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বেই সেখানে রজনীর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত।

তাই সাধারণ লোকেরা সন্ধ্যার পর সেদিকে একাকী পথ চলিতে ভয় পাইত, কিন্তু সেই বিজন বনাকীর্ণ স্থানে নির্ভীকচিত্তে বাস করিত ছোট্টুর মা!

কার্য্যানুরোধে ছোট্টুকে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাহিরে কাটাইতে হইত, অধিকাংশ সময়ই ছোট্টুর মা সেই নির্জ্জন গৃহে একাকিনী থাকিত, কিন্তু বুড়ীর মনে ভয় ডর ছিল না।

মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত বন্দুক ও তীক্ষ্ণধার 'খুকুরীর' সহায়তায় সে সারা যৌবনকাল নিঃশঙ্কে নিরাপদে সেইখানেই কাটাইয়া দিয়াছে, এখন খেয়া পারে ঠেকিয়াছে,—আর ভয় কিসের?

গ্রামের ছোট বড় সকলেই ছোট্টুর মার সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিল এবং তাহাকে বেশ একটু সমীহ করিয়াই চলিত, সুতরাং চুরীর আশঙ্কাও বড় একটা ছিল না।

কার্ত্তিকের শেষ। হেমন্ত সন্ধ্যার তরল কুয়াশা পার্ব্বত্যদেশের প্রচণ্ড শীতে যেন জমাট বাঁধিবার উপক্রম হইতেছিল। ছোট্টুদের বাড়ী যাইবার তরুলতা ও ঝোপে ঝাপে ঘেরা "পাকডণ্ডী" বা সরু পথখানি ইহারই মধ্যে ঘন তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই অন্ধকারে শুষ্কপথে শুষ্ক গলিত বৃক্ষপত্রের অস্ফুট মর্ম্মর ধ্বনি জাগাইয়া এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে ছোট্টুদের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল,—সরীসৃপের মত তাহার মৃদু লঘু ও সতর্ক গতি,—ব্যাধ ভয়ে ভীত মৃগের মত তাহার চকিত সন্ত্রস্ত ভাব।

দরজার কাছে আসিয়া লোকটা কি ভাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, ছোট্টুর আগমন প্রতীক্ষায় দ্বার তখনও বন্ধ করা হয় নাই শুধু ভেজানো ছিল। ভেজানো কপাট নিঃশব্দে ঈষৎ মুক্ত করিয়া সে কাণ পাতিয়া কি শুনিল, পরক্ষণেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিয়া দিল।

আঙ্গিনা নির্জ্জন, অন্ধকার। কিন্তু রান্নাঘরে প্রচুর আলোক। সেখানে উনান জ্বালিয়া, কাঠের 'ডেলকোর' উপর জ্বলন্ত 'কুপি' রাখিয়া ছোট্টুর মা রান্না করিতেছিল। আজিকার রন্ধনে বেশ একটু বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য ছিল, নিত্যকার শাক সবজী বা দালের পরিবর্ত্তে হরিণের মাংস, 'মক্কা' বা 'জুনরীর' রুটীর বদলে ঘৃত ম্রক্ষিত গমের রুটী, তাহার উপর আবার কাঁচা ধনে পাতা, লঙ্কা ও আমসী সহযোগে ঝাল চাট্‌নী। সুতরাং রন্ধনকারিণীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল। আজ এই আহারের আয়োজন দেখিয়া ছোট্টু কত না খুসী হইবে! হরিণের মাংস খাইতে সে যে বড় ভালবাসে,—তাই তো কত চেষ্টায় বুড়ী এই মাংসটুকু আজ সংগ্রহ করিয়াছে। কেবল মাংস কেন, মায়ের প্রস্তুত সব খাবারই ছোট্টুর ভাল লাগে,—মায়ের হাতের রান্না না খাইলে তাহার পেটই ভরে না।

তাই মাংস ভাজিতে ভাজিতে বুড়ী মনে মনে ভাবিতেছিল, বধূকে ঘরে আনিয়া সে তাহার

পুত্রের প্রিয় খাদ্যগুলি রান্না করিতে সংস্তুই শিখাইয়া দিবে, নহিলে ভবিষ্যতে ছোট্টুর কষ্ট হইবে যে! বুড়ো মা তো আর চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবে না? ঈশ্বরেচ্ছায় সে শুভদিনও সমাগত, মধ্যে আর একটী সপ্তাহ, তাহার পরেই কৃপাণ সিংহের কন্যা নববধূরূপে তাহার শূন্যসংসার পূর্ণ করিবে, আঁধার ঘর আলো করিবে। বুড়ী তা'র অকালবার্দ্ধক্যগ্রস্ত ক্লান্ত শরীরে এইবার সকল দিক হইতেই বিশ্রাম পাইবে। আঃ! সাতটা দিন আর ভালয় ভালয় কাটিয়া গেলে বাঁচা যায়!

উনানের প্রজ্জলিত অনলশিখার তীব্র দীপ্তিতে বুড়ীর আনন্দ প্রদীপ্ত গৌরবর্ণ মুখখানা বেশ উজ্জল দেখাইতেছিল।

দুয়ারের দিকে খুস্ খুস্ করিয়া কিসের শব্দ হইল, কে আসিল ছোট্টু নাকি? কিন্তু সেতো কখনও অমন নিঃশব্দে আসে না, তা'র ভারি 'বুট'পরা সতেজ পদবিক্ষেপের শব্দ যে দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়, তবে ছোট্টুর আসিবার সময়ও হইয়াছে, রোজ প্রায় এই সময়ই সে মাঠ হইতে ঘরে ফিরে।

মাংসের হাঁড়িতে জল ঢালিতে ঢালিতে ছোট্টুর মা রান্নাঘরের ভিতর হইতেই ডাকিয়া বলিল "কেরে? ছোট্টু এলি নাকি? সাড়া আসিল না, আসিল সেই লোকটী। রান্নাঘরের দুয়ারে, আলোক অন্ধকারের সংমিশ্রণ স্থলে দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া সে থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সন্দিগ্ধ চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখিয়া সে মৃদু সতর্ক কণ্ঠে উচ্চারিত করিল "ছোট্টু নয় মা!—আমি"—"কে বাহাদুর! তা ওখানে কেন? ভেতরে আয় না?" বাহাদুর ছোট্টুর বাল্যবন্ধু ও তাহারই সমবয়স্ক।

গৃহস্বামিনীর অনুমতি পাইয়া, সাহসে নির্ভর করিয়া বাহাদুর ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর আসিল, তখন উজ্জল দীপালোকে ছোট্টুর মা দেখিতে পাইল তাহার মুখে চক্ষে কেমন একটা ভীত ত্রস্ত ভাব, বেশভূষাও বিশৃঙ্খল। পায়ে জুতা নাই মাথায় সে বাঁকা টুপী নাই, চুলগুলো উস্কো খুস্কো, পরণের খাকি কোট ও হাফ্‌প্যান্ট্ ধূলিধূসরিত। গরীব গুর্খা হইলেও এই বাহাদুর ছোকরাটী বড় সৌখীন ছিল, দুইবেলা পেট পূরিয়া আহার না জুটিলেও তাহার সাজসজ্জার ত্রুটী কখনও দেখা যাইত না। তাই আজিকার তা'র এই ভাবান্তর ছোট্টুর মাকে বড় বিস্মিত করিল। হাঁড়ীর মুখে ঢাকনী চাপা দিয়া বাহাদুরের কাছে এগাইয়া আসিয়া বুড়ী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে রে বাহাদুর? অমন চুপি চুপি চোরের মতন"—বাহাদুর বাধা দিয়া ওষ্ঠে তর্জ্জনী স্থাপিত করিয়া ত্রস্তে কহিল "চুপ! আস্তে!—ভারি একটা বিপদে পড়েছি আমি, ছোট্টু কোথায়?" বুড়ী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "ছোট্টুতো এখনো আসে নি,—কি বিপদ হয়েছেরে বাহাদুর?"

সে প্রশ্নে বাহাদুরের ভয়ার্ত্ত ভাব আরও বৃদ্ধি হইল। তাহার ছোট ছোট মিট্‌মিটে চক্ষু দুটী

চাঁদনীরাতে　　　　শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
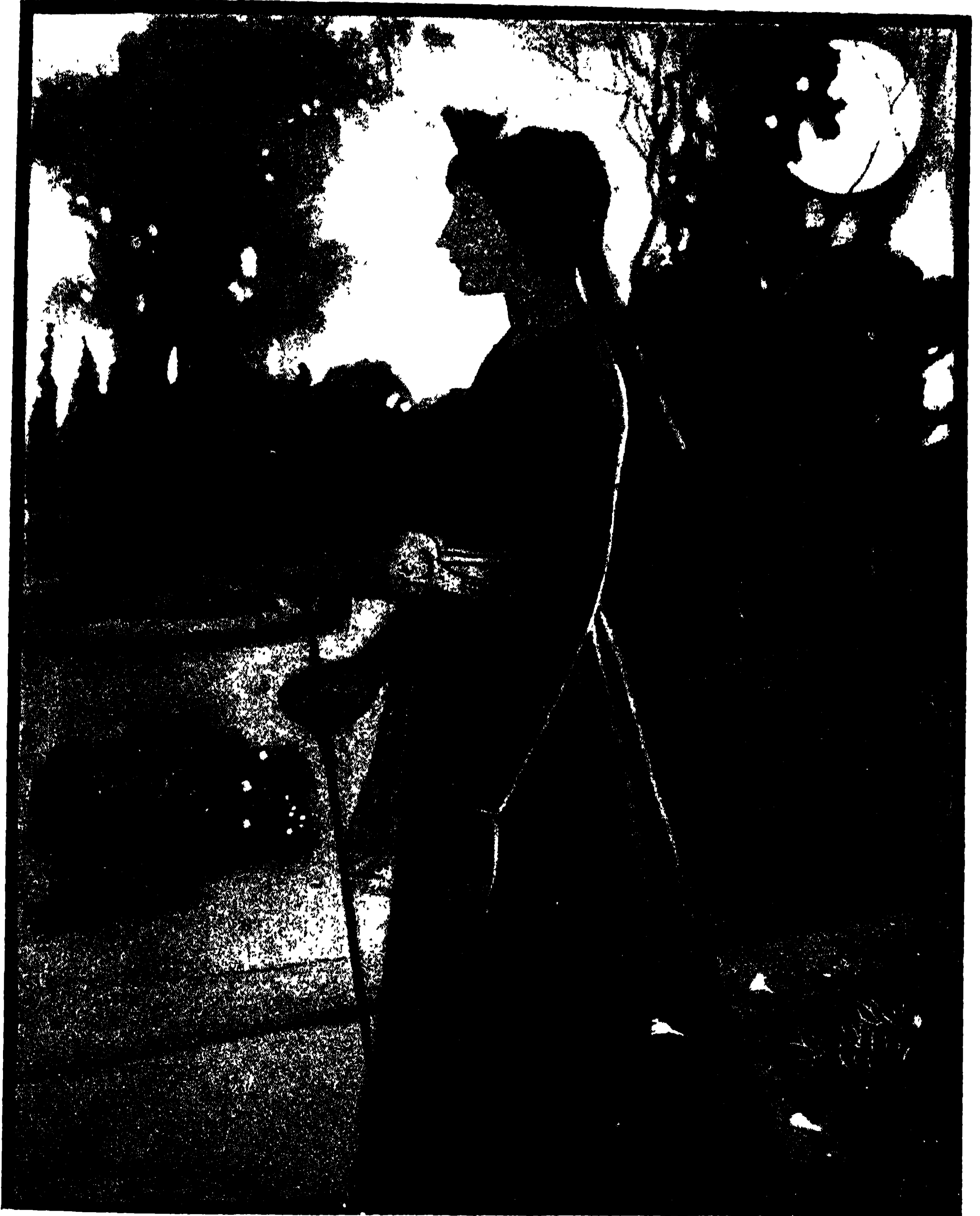
যেন আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। আপনা আপনি শিহরিয়া উঠিয়া সে চাপাগলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল "বড় ভয়ানক!—আমি এই খানিক আগে খরগোস শীকার করতে গিয়ে বোধ হয় মানুষ খুন করেছি মা!"

"অ্যাঁ!—বলিস কি বাহাদুর? কাকে খুন করলি রে?—কেমন করে—"

"চুপ!—তা কি করে বলব?—ঝাপসা অন্ধকারে দূর থেকে বুঝতে পারিনি, তবে মানুষ সেটা ঠিক্!—কারখানা থেকে ফেরবার পথে—

বাহাদুরের মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই যে পথ দিয়া সে আসিয়াছিল, সেই পথে কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। কিন্তু একজনের নহে, অন্ততঃ দুইজনের—"আমাকে বাঁচাও মা! বাঁচাও,—অন্ততঃ তোমার ছোট্টুর বন্ধু বলে—ঐ তা'রা আসছে,—আমাকে এখনি ধরে নিয়ে যাবে—"বলিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহাদুর ছোট্টুর মা'র পা জড়াইয়া ধরিল। ছোট্টুর মা মহা সমস্যায় পড়িল। একজন খুনী আসামীকে ঘরে আশ্রয় দেওয়া, লুকাইয়া রাখা যে কত গুরুতর অপরাধ বুড়ী তাহা জানিত, কিন্তু এই বাহাদুর যে তাহার প্রিয় পুত্রের পরম বন্ধু. ছোটবেলায় দুইজনে একসঙ্গে খেলা করিয়াছে, একসঙ্গে বেড়াইয়াছে, তখন একজন নইলে অন্যজনের একদণ্ডও চলিত না।

তাহারপর যৌবনে পিতা মাতা বা অন্য অভিভাবকহীন বাহাদুর বন্ধন মুক্ত অবস্থায় রাশ ছেঁড়া ঘোড়ার মত অসংযত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেও দুই বিভিন্ন প্রকৃতির বন্ধুর মধ্যে সম্প্রীতির অভাব হয় নাই। এই নষ্ট চরিত্র ছন্নছাড়া ছেলেটীকে ছোট্টুর মা মনে মনে ঘৃণা করিলেও একটুখানি করুণা ও মমতা না দেখাইয়া থাকিতে পারিত না। যতই মন্দ হোক সে, তার ছোট্টু যে তাহাকে ভালবাসে! বিশেষতঃ ইদানীং ছোট্টুর চেষ্টায় চা'য়ের কারখানায় কাজ পাইয়া অবধি বাহাদুর নিজ চরিত্র সংশোধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল সে চেষ্টা তাহার অনেকটা সফল ও হইয়াছিল। এখন খুন করুক আর যা'ই করুক সে ছোট্টুর প্রিয় বন্ধু সে ধরা পড়িয়া ফাঁসী গেলে ছোট্টুর মনে আঘাত লাগিবে! তবে এখন কি করা যায়? ছোট্টু বাড়ী ফেরা পর্য্যন্ত বাহাদুরকে এই খানেই লুকাইয়া রাখিবে কি? আর তো সময় নাই, ঐ যে পদধ্বনি ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, এক জন নয় দুই জন কিন্তু উহার মধ্যে ছোট্টু নাই নিশ্চয়—তাহার পদ শব্দ যে বুড়ীর সুপরিচিত!

রান্নাঘরের ভিতরে আর একটী ছোট কুঠুরী ছিল, বাহির দিক হইতে তাহা একেবারে বন্ধ, আলো বা বাতাস আসিবার একটী ফোকর ও তাহাতে ছিল না, কেবল রান্না ঘরের দিকে একটা ছোট দরজা। এই বন্ধ কুঠরীটীতে ছোট্টুর মা সম্বৎসরের শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত।

বহির্দ্বারে করাঘাত হইল। ছোট্টুর মা কম্পমান বাহাদুরকে এক প্রকার টানিয়া সেই কুঠরীর মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া দুয়ারে শিকল তুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে ডাক আসিল ছোট্টুর মা! ছোট্টুর মা!

ছোট্টুর মা চিনিতে পারিল সে কণ্ঠস্বর গ্রামের চৌকিদার রামস্বরূপের। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিতেই লণ্ঠন ও লাঠি হাতে চৌকিদার ও আর একটী গ্রামবাসী প্রবেশ করিল, তাহারা দুই জনেই হাঁফাইতেছিল, বোধহয় অনেক দূর পথ চলিয়া আসিয়াছে তাই; ছোট্টুর মাকে দেখিবামাত্র চৌকীদার ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল "বাহাদুর কি এখানে এসেছে ছোট্টুর মা? ছোক্‌রা শিকার করতে গিয়ে মানুষ খুন করেছে, করেই পালিয়েছে, আমরা তার সন্ধানে সেই অবধি নাকাল হয়ে বেড়াচ্ছি। সকলই খোঁজ করছে—ছোট্টুর মা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল "ওমা তাই নাকি? ছোঁড়া কাকে খুন করলে"? "সে খবর এখনও জানি না, আমরা সোজা তার পেছনেই ছুটেছিলুম, এদিকে সে এসেছে নাকি ছোট্টুর মা? "না বেটা! বাহাদুর আজ সকালে একবার ছোট্টুর কাছে এসেছিল, তারপর আর তো তাকে দেখিনি। "তাহলে এরি মধ্যে ছোঁড়া কোথায় গায়েব হয়ে গেল? আঃ হতভাগাটা কি রকম হয়রাণ করলে দেখদেখি? এই শীতে, তাকে অন্ধকারে কোথায় যে খুঁজে বেড়াই তার ঠিকঠিকানা নেই। একটু জল দাও তো খেয়ে আবার অন্যদিকে যাই, দেখি অন্য দলেরা যদি কিছু সন্ধান পেয়ে থাকে, সেই অবধি ঘুরে ঘুরে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

জল পান করিয়া দুইজনেই বিদায় হইয়া গেল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে অন্ধকার আরও ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ছোট্টু এখনও আসিল না কেন?

তিন

সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র অন্ধকার কুঠারীর মধ্যে শস্য ভর্ত্তি 'বোরা' গুলির মধ্যে কষ্টে সৃষ্টে দাঁড়াইয়া খুনী আসামী বাহাদুর তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল; শীতে নহে ভয়ে। দারুণ আতঙ্কে তাহার বুকের রক্ত যেন বরফের মত জমাট বাঁধিয়া যাইতেছিল।

উৎকর্ণ, উৎকন্ঠিত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ভাবিতেছিল বুড়ী যদি কথাটা চাপিয়া রাখিতে না পারে, পলাতকের এই গোপন অবস্থিতি যদি তাহারা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে তবেই তো সর্ব্বনাশ!

জীর্ণ কপাটের ফাটলে চক্ষু রাখিয়া বাহাদুর দেখিবার চেষ্টা করিল তাহাকে ধরিবার জন্য কে কে আসিয়াছে কিন্তু দেখিতে পাইল না; বাহির হইতে তাহাদের কথা বার্ত্তা শোনা যাইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাও অস্পষ্ট।

নির্জ্জন রান্নাঘরে জলন্ত চুল্লীর উপর বড় বড় করিয়া মাংস ফুটিতেছিল হাঁড়ীর মুখের ঢাকনীর ফাঁক হইতে বাষ্প উড়িয়া সমস্ত ঘর খানিকে সুগন্ধে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল অতখানি ভয় ও উদ্বেগের মধ্যে ও বাহাদুরের রসনা লোলুপ হইয়া উঠিল। সে আশা করিল এই পাপগুলা বিদায় হইয়া গেলে ছোট্টু ঘরে আসিলে বন্ধুর সঙ্গে সে ও ইহার একটু আধটু ভাগ পাইবে। অন্ততঃ দুইটুকরা মাংস আর একখানা রুটী। আচম্কা একটা বড় ইঁদুর অন্ধকারের মধ্যে তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। বাহাদুর চমকিয়া উঠিল তার মাথাটা অসাবধানে ঠুকিয়া গিয়া খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল। বাহাদুরের দেহের কম্পন বক্ষের স্পন্দন আরও দ্রুত হইল যদি এ শব্দ টুকু উহাদের কানে গিয়া থাকে যদি উহারা তাহার তল্লাসে এখনই কুঠুরী খুলিয়া ফেলে! হে ভগবান! রক্ষা করো রক্ষা করো! তুমিতো অন্তর্যামী জানো এ অপরাধ বাহাদুরের একান্ত অনিচ্ছাকৃত। আর্ত্তের প্রার্থনায় ভগবান কর্ণপাত করিলেন! মিনিট কয়েক পরে বাহাদুর জানিতে পারিল, যাহারা আসিয়াছিল তাহারা চলিয়া গেল। তাহাদের দ্রুত পদধ্বনি দূর বনপথে বিলীন হইতে না হইতে ছোট্টুর মা বহির্দ্বারে শিকল দিয়া রান্নাঘরে উঠিয়া আসিল এবং কুঠরীর দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল "বেরিয়ে এসো"।

বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইয়া বাহাদুর নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল সে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল "গেছে তারা"। "হ্যাঁ কিন্তু কাজটা তুমি বাস্তবিক ভারি অন্যায় করেছ বাহাদুর!"

বুড়ীর গম্ভীর মুখের পানে সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করিয়া অপরাধী বাহাদুর কাতর ভাবে কহিল "তা আমি ও বুঝছি মা! কিন্তু যাহা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই, এখন আমি কি করি, কেমন করে প্রাণ বাঁচাই তাই বলো; ছোট্টু তো এখনও এলো না"। "না রোজ তো এর অনেক আগেই এসে যায়, আজ এত দেরী করছে কেন জানি না, কিন্তু ছোট্টুর পিত্যেশে তোমার এখানে ব'সে থাকা তো চলবে না বাছা!—গ্রামের লোকেরা সবাই নাকি তোমায় খুঁজতে দল বেঁধে বেরিয়েছে, আবার যদি কেউ এসে পড়ে, তাহলেই তো মুস্কিল, আমি তোমাকে কাঁহাতক লুকিয়ে রাখতে পারব?"

"তাইতো? তাহলে আমার দশা কি হবে মা?—আমি এখন কি করি, কোথায় যাই কিছুই যে বুঝতে পারছি না। ছোট্টু এসে পড়লেও বা কিছু ব্যবস্থা করতে পারত।" হতাশ্বাস বাহাদুরের বিপন্ন আর্ত্ত মুখের পানে করুণ নেত্রে চাহিয়া ছোট্টুর মা বলিল আমি বলি তুমি আর মুহূর্ত্ত দেরী না করে রাতারাতি কোথাও পালিয়ে যাও, কোনও দূরদেশে, যেখানে কেউ সহজে তোমার পাত্তা পাবে না—"

—"কিন্তু রাতারাতি দূরদেশে যাবার রাহা খরচ আমি এখন পাই কোথায়? এইতো ক'গণ্ডা পয়সা পকেটে পড়ে আছে—" ছোট্টুর মা নীরবে উঠিয়া গেল এবং কক্ষান্তর হইতে

পাঁচটী টাকা আনিয়া বাহাদুরের হাতে দিয়া বলিল "এই নিয়ে বেরিয়ে পড়ো—আর দেরি করো না, ছোট্টুকে আমি তোমার কথা বলব'খন—"

সে টাকা বুড়ী ছোট্টুর বিবাহের জন্য সঞ্চিত অর্থ হইতে লইয়া আসিয়াছিল, আজ তাহারই কল্যাণকামনায়, তাহারই অসহায় আর্ত্ত বিপন্ন বন্ধুর সাহায্যার্থে দান করিল।

টাকা পাইয়া বাহাদুর যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। গভীর কৃতজ্ঞতায় তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল সে উচ্ছ্বসিত রুদ্ধ কণ্ঠে "তুমি আজ সত্যি সত্যি আমার মায়ের কাজ করলে মা!" বলিয়া ছোট্টুর মায়ের চরণে মাথা লুটাইয়া অজ্ঞাত অনির্দ্দেশ যাত্রার জন্য উঠিতেছিল, ছোট্টুর মা বলিল "বসো, একটু কিছু খেয়ে যাও, কি জানি আবার কখন খাবার জুটবে—"

দুইখানি মোটা মোটা রুটীর উপর একটুখানি মাংস রাখিয়া সে বাহাদুরের হাতে দিল। ক্ষুধার্ত্ত বাহাদুর সেই রুটী ও মাংস পরম আগ্রহভরে এমন তাড়াতাড়ি গিলিতে লাগিল, যে বুড়ীর ভয় হইল, গলায় খাবার বাধিয়া ছেলেটা মারা না পড়ে।

ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করিয়া, বিশেষতঃ ছোট্টুর বন্ধুকে খাওয়াইয়া বুড়ী বেশ একটু তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল মাংসটা কেমন হয়েছে?"

আহার্য্য বস্তু চর্ব্বণ করিতে করিতে বাহাদুর ভারি গলায় তৃপ্তস্বরে বলিল "চমৎকার!—তোমার রান্না কেবেই বা ভাল না হয় মা? ছোট্টু কি সাধে বলে আমার মা'র মত রাঁধতে আর কেউ পারে না।" "হুঁ! তার ঐ এক কথা! এখন সে ঘরে এলে যে বাঁচি, রাত হয়ে গেল, কোথায় বসে গল্প করছে, খাবার দাবার হুঁস নেই।"

ছোট্টুর মার পুত্রগর্ব্বে ও স্নেহে উৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া বাহাদুর একটা ক্ষুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিল, এই ছোট্টুর মা'র মত স্নেহময়ী মমতাময়ী মা যদি তাহার থাকিত, তবে হয়তো সে তা'র বিপথগামী ছন্নছাড়া জীবনের গতি আজ ভিন্ন পথে পরিচালিত করিতে পারিত।

বাহাদুরের শেষ গ্রাস ফুরাইতে না ফুরাইতে বহির্পথে পুনরায় পদধ্বনি শ্রুত হইল। বাহাদুর চকিত হইয়া উঠিয়া বলিল "কে এলো? ছোট্টু নাকি?" বুড়ী কাণ পাতিয়া বলিল "উহুঁ, এ যে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শুনছি,—আবার আর একদল তোমার খোঁজে আসছে বুঝি? তুমি আবার কুঠরীতেই লুকিয়ে পড়ো ঝট্ করে, আমি দেখে আসি কারা এলো।"

অনন্যোপায় হইয়া বাহাদুরকে পুনশ্চ সেই ছুঁচো, ইঁদুর ও আরসুলার আবাস স্থল অন্ধকার বদ্ধ কুঠরীর মধ্যে আশ্রয় লইতে হইল। তাহার বুকের ভিতরটা তখন তোলপাড় করিতেছিল, কি জানি আবার কি নূতন বিভ্রাট সমুপস্থিত।

ছোট্টুর মা দ্বার খুলিয়া দিতেই গ্রামের একজন মাতব্বর প্রবীণ ব্যক্তি প্রবেশ করিল। লোকটী ছোট্টুর মার বিশেষ পরিচিত ও স্বজাতীয়। তাহার পুত্র স্বস্তবীর স্থানীয় রেজিমেন্টে

কাজ করে। তাহাকে দেখিবামাত্র বুড়ী উদ্গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসিল "কে গো? স্বস্তুর বাপ নাকি?—এ সময় কি মনে করে? আসবার পথে আমার ছোট্টুকে দেখেছ কি?"

বৃদ্ধ স্বস্তুর পিতাকে বড়ই শ্রান্ত ও বিষণ্ণ দেখাইতেছিল, পাঁচীলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সে বিমর্ষ গম্ভীর মুখে বলিল "আজ তোমাকে ভারি একটা দুঃসংবাদ দিতে এসেছি ছোট্টুর মা!"

ছোট্টুর মার বুকের ভিতর সজোরে 'ধড়াস্' করিয়া উঠিল, কিসের এ দুঃসংবাদ? তাহার ছোট্টুর সম্বন্ধে কিছু নয়তো? দারুণ সংশয়ে, উদ্বেগে বুড়ীর মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না, সে নির্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া স্বস্তুর পিতার গম্ভীর ম্লান মুখের পানে বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল।

ইতঃস্ততঃ করিবার আর সময় ছিল না, নিরুপায় বৃদ্ধ ছোট্টুর ব্যাকুলা জননীর বক্ষে বিনামেঘে অশনিপাত করিয়া জড়িত কণ্ঠে কহিল "তোমার ছোট্টুর কথা জিজ্ঞাসা করছিলে? তাকেই আমরা এনেছি—কিন্তু তাকে কে গুলী করেছে—"

"অ্যাঁ! বল কি?—গুলী করেছে—আমার ছোট্টুকেই গুলী করেছে?—কই সে কোথায়? আমাকে তার কাছে নিয়ে চল—" ছোট্টুর মা উন্মাদিনীর মত দ্বারাভিমুখে ছুটিতেছিল, স্বস্তুর পিতা তাহাকে নিরস্ত করিল, এবং বাহিরে দণ্ডায়মান সাথীদের ভিতরে ডাকিয়া আনিল।

চার

কুঠরীর দরজার ফাঁক হইতে বাহাদুর উৎসুক অধীর হইয়া দেখিতেছিল ব্যাপার কি? ধীরে ধীরে ধীরে—চারিজন লোক একখানা খাটিয়াতে বহন করিয়া আনিল একটা বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃতদেহ সঙ্গে সেই চৌকীদার রামস্বরূপ, তাহার এক হাতে লণ্ঠন ও অন্য হাতে বাহাদুরের পরিত্যক্ত জুতা, বগলে বাহাদুরের বন্দুক। খাটিয়াখানা আঙ্গিনার মাঝখানে বাহাদুরের বিস্ফারিত ভয়ার্ত্ত নিষ্পলক দৃষ্টির সম্মুখে নামাইয়া রাখিয়া শববাহকেরা নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেল। মৃতের মুখে আচ্ছাদন ছিল না, দুর্ভাগ্য বাহাদুর সবিস্ময়ে সত্রাসে দেখিল সে মুখ তাহার পরিচিত, হত-ব্যক্তি আর কেহ নহে তাহারই প্রাণের বন্ধু ছোট্টু! অজ্ঞাতে অতর্কিতে একটা অস্ফুট আর্ত্ত-ধ্বনি তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে শব্দ তখন কেহই শুনিতে পাইল না। সকলেই ছোট্টুর মাকে লইয়া ব্যস্ত।

হতভাগিনী ছোট্টুর মা তখন মৃত পুত্রের হিমশীতল স্তব্ধ মুখের উপর মুখ রাখিয়া মর্ম্মভেদী আর্ত্তবিহ্বল কণ্ঠে ডাকিতেছিল "ছোট্টু! ছোট্টু! ছোট্টু! বেটা আমার! হীরা আমার! লাল আমার!—"

কিন্তু মায়ের সেই বুকফাটা আকুল স্নেহের আহ্বান আজ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত পুত্রের শ্রবণে পশিল না, জননীর স্নেহরাজ্য হইতে চিরবিদায় লইয়া সে তখন কি জানি কোন্ অজানা অদৃশ্য লোকে চলিয়া গিয়াছে!

পার্শ্বে দণ্ডায়মান স্বস্তুর পিতা একটা ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলিয়া সবিষাদে কহিল "তোর লা'ল কি আর আছে রে বহিন্!—আহা! বাছাকে এক গুলীতেই নিকাশ করে ফেলেছে!" সে ছোট্টুর বক্ষের আচ্ছাদন তুলিয়া দেখাইল, ছোট্টুর মা শিহরিয়া দেখিল বন্দুকের গুলী পুত্রের বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া গিয়াছে, ক্ষতস্থান হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছে,—স্পন্দহীন অসাড় দেহে জীবনের আর কোনও চিহ্নই ছিল না। উঃ! সে কি ভয়ানক কি মর্ম্মান্তিক দৃশ্য!

মৃত সন্তানের অন্তিম শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া দুর্ভাগিনী জননী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল "ছোট্টুরে! তোর বুড়ো মাকে ফেলে কোথায় গেলিরে বাপ?" অপত্যবিয়োগবিধুরা জননীর সেই মর্ম্ম-বিদারী,—পাষাণবিদারী হাহাকার অপরাধী বাহাদুরের ঘন স্পন্দিত, সন্তাপিত বক্ষে যেন তীক্ষ্ণ শেলাঘাত করিল।

ছোট্টু, তাহার আবাল্যের সুহৃদ, চিরদিনের শুভাকাঙ্খী, প্রিয়তম বিশ্বস্ত বন্ধু, তাহার জীবনের সাথীর শেষে সেই হন্তারক হইল! পরম মিত্র হইয়া তা'র অতি বড় শত্রুর কাজ করিল! ধিক্—শত ধিক্ তাহার জীবনে!

দুঃখে ক্ষোভে পরিতাপে বাহাদুরের চক্ষু ফাটিয়া দরদর ধারে অশ্রু বহিল। বিশ্বাসঘাতক বন্দুকের গুলীটা বাছিয়া বাছিয়া কিনা তাহার প্রিয় বন্ধুর বুকেই লাগিল—আর কি সেখানে কেহ ছিল না! হায়! নিষ্ঠুর নির্ম্মম ভবিতব্য!

বাহাদুরের ইচ্ছা হইল কুঠরীর ভিতর হইতে সাড়া দিয়া সে চৌকীদারের হাতে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু মানুষের জীবন বড়ই প্রিয়, বিশেষতঃ এই তরুণ বয়সে, তাহার জীবনের কোনও আকাঙ্খাই যে এখনও পূর্ণ হয় নাই।

বাহাদুর ধরা দিতে পারিল না, শ্বাসপ্রশ্বাস প্রায় রুদ্ধ করিয়া সে শুনিতে লাগিল স্বস্তুর পিতা শোকাকুলা ছোট্টুর মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছে তুমি শান্ত হও বহিন্? যে গেছে সে তো আর ফিরবে না, কিন্তু যে হতভাগা তোমার ছোট্টুর এমন দশা করেছে, তা'র যাতে উচিত শাস্তি হয়, আমাদের এখন সেই চেষ্টাই দেখতে হ'বে, এ সময় ধরপাকোড় না করলে রাতারাতি কোথায় পালিয়ে যাবে।—ছোঁড়া ভারি চালাক,—মানুষ খুন করে, জুতো খুলে, বন্দুক ফেলে প্রাণ নিয়ে কোথায় যে উধাও হয়েছে"—

চৌকীদার বাধা দিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে রুষ্টস্বরে বলিল "উধাও হয়ে যাবে কোথায়? এ ইংরেজের রাজ্য,—দুনিয়ার এককোণ থেকে আর এককোণ পর্য্যন্ত তল্লাসি করে তার হাতে হাতকড়ি দিয়ে টেনে এনে ফাঁসীকাঠে ঝোলাবো, তখন টের পাবেন বাছা শিকার করবার কত মজা!"

সে কথা শুনিয়া বাহাদুরের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন রোধ হইয়া গেল। ছোট্টুর মা তাহার প্রাণাধিক পুত্রের হত্যাকারীকে ফাঁসীকাঠে না ঝুলাইয়া, প্রতিশোধ না লইয়া কি ছাড়িবে? কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা,—ছোট্টুর মা তাহার গৃহে লুক্কায়িত পুত্রহন্তার অস্তিত্ব কাহাকেও জানিতে

দিল না। শীঘ্রই সে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল, এবং চক্ষুর জল মুছিয়া ফেলিয়া স্বস্তর পিতাকে অনুরোধ করিল ছোট্টুর খাটিয়াখানা যেন তাহার শয়নকক্ষে তুলিয়া দেওয়া হয়, আজিকার রাত্রি-টুকু সে তাহার প্রিয়তম পুত্রের কাছে নিভৃতে থাকিতে চায়।

স্বস্তর পিতা অভাগিনীর শেষ সাধ পূর্ণ করিল। ছোট্টুর অন্তিমশয্যা তাহার শয়নমন্দিরে তুলিয়া দিয়া সে বলিল "এখন তুমি যদি একটু ধৈর্য্য ধরে স্থির হয়ে থাকতে পারো ছোট্টুর মা, তাহলে আমি বাড়ী গিয়ে মেয়েদের ডেকে আনি, আমাকে আবার চৌকীদারের সঙ্গে থানায় খবর দিতে সহরে যেতে হবে তো?" চৌকীদার বলিল "তাই করো, আমি ততক্ষণ এখানেই থাকি, ওঁকে এসময় একা রাখাটা ঠিক নয়।"

ছোট্টুর মা আপত্তি তুলিয়া বলিল "না না, তুমিও সঙ্গে যাও রামস্বরূপ, উনি বুড়ো মানুষ এই বনবাদাড় দিয়ে একলাটী কেমন করে যাবেন? আমার জন্যে কোনও ভাবনা নেই।"

স্বস্তর পিতা অগত্যা চৌকীদারকে বলিল "তবে তাই চলো। এখানে কোনও ভয় ভীত্ নেই, আমরা যত শীগ্গির পারি গিয়ে স্বস্তর মাকে নিয়ে আসছি।" ছোট্টুর মাকে সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া থাকিতে বলিয়া বৃদ্ধ চৌকীদারের সহিত তাহাব স্ত্রী-কন্যাকে আনিতে চলিয়া গেল।

তখন শূন্য গৃহে রজনী গাঢ় নিস্তব্ধতার মধ্যে মৃতপুত্র আগলাইয়া রহিল শুধু ছোট্টুর মা, আর একটী ভীত আর্ত্তপ্রাণী, নিবিড় অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া বন্দী অবস্থায় জীবন্তে মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। বাহাদুরের এখন মনে হইতেছিল সে ধরা না দিয়া কেন ঘরের কোণে লুকাইয়া রহিল? তাহার এই দুর্দ্দিনের আশ্রয়দাত্রী জীবনদাত্রী ছোট্টুর মার পুত্রহন্তা-রূপে সে এখন মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া? তার চেয়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়া মরাও যে তাহার শতগুণে শ্রেয় ছিল!

স্বস্তর পিতা চৌকীদারকে লইয়া চলিয়া গেলে ছোট্টুর মা নিভৃতকক্ষে আলো ধরিয়া কতক্ষণ পুত্রের মৃত্যুকালিমাচ্ছন্ন বিবর্ণ মুখের পানে অশ্রুসজল অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল, একটা উত্তপ্ত অন্তর্ভেদী দীর্ঘবিশ্বাস যেন বৃদ্ধার বক্ষপঞ্জর মথিত করিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল। নিবিড় স্নেহে, গভীর ব্যথায় পুত্রের স্পন্দহীন নিথর শীতল মুখখানি চুম্বন করিয়া সে তাহার বক্ষের আচ্ছাদন খুলিল, সমস্ত বুকখানা রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে—এই সাংঘাতিক গুলী যখন লাগিয়াছিল, তখন উ হু হু হু! বাছারে!—কত ব্যথাই না সে বুকে বাজিয়াছে!

মনে পড়িল ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্ নিষ্ঠুর নৃশংস হত্যা যে ব্যক্তি করিয়াছে, যে তাহার এই বার্দ্ধক্যের সম্বল অন্ধের যষ্টিটীকে তাহার বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে, সে হতভাগা এখন তাহারই আশ্রয়ে—তাহারই মুঠার ভিতর। যদি তাহার বক্ষেও এমনি নিষ্ঠুর আঘাত করা যায়, বুড়ীর বুকের কলিজা, নয়নের মণি ছোট্টুর হত্যাকারী যদি এমনি নিস্পন্দ দেহে, রক্তাক্ত বক্ষে

তাহারই মৃতদেহের পাশে শোওয়াইয়া দেওয়া যায়—ওঃ! এযে বড় ভীষণ প্রলোভন! একেবারে হাতে হাতে প্রতিশোধ!

বুড়ীর চক্ষের জল নিমেষে শুকাইয়া গেল। বুকের ভিতর আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইল, সে কি বিষম তীব্র দাহ!—পুত্রহন্তার রক্ত নইলে বুঝি সে জ্বালা আর নিভিবে না!

পুত্রের মৃতদেহ সযত্নে ঢাকিয়া দিয়া ছোট্টুর মা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল। ঘরের কোণে একটা পুরাতন বেতের পেটারি ছিল, সেই পেটারি হইতে সে বাহির করিয়া আনিল ছোট্টুর পিতার 'খুকরী'খানা। উজ্জ্বল দীপালোকে কোষমুক্ত তীক্ষ্ণধার 'খুকরী' যেন সেই অপত্যহারা জননীর তীব্র মর্ম্মজ্বালার মত ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বুড়ীর মনে পড়িল ছোট্টুর আসন্ন বিবাহের ভোজে পাঁটা কাটিবার জন্য মাত্র দুইদিন পূর্ব্বে এ অস্ত্রটীতে সে ছোট্টুকে দিয়াই 'শান্' দেওয়াইয়াছিল। সেই অস্ত্র আজ তা'র হত্যাকারীর বক্ষ বিদীর্ণ করিবে!—নিয়তির একি ভীষণ, নির্ম্মম বিধান!

মৃতের বক্ষ ত্যাগ করিয়া ছোট্টুর মা ধীরে ধীরে আঙ্গিনায় আসিল। তাহার এক হাতে প্রদীপ আর এক হাতে সেই রক্তপিপাসু উলঙ্গ উজ্জ্বল কৃপাণ,—সে যেন প্রতিহিংসার জ্বলন্ত জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! কুঠরীর ভিতর হইতে সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া হতভাগ্য বাহাদুর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। শীতলস্বেদে আপ্লুত হইয়া তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। শরীরের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী যেন পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত অবশ অসাড় হইয়া আসিল—আর রক্ষা নাই! ঐ পুত্র শোকাতুরার উদ্যত কৃপাণ এখন তাহার বক্ষের রক্তপান করিবে! নিদারুণ ত্রাসে, অবসাদে, উচ্ছ্বসিত মর্ম্মবেদনায় বাহাদুরের রুদ্ধপ্রায় শুষ্ক কণ্ঠনালী হইতে অতর্কিতে অজ্ঞাতে বাহির হইয়া গেল। একটা মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তধ্বনি "মা—মাগো!"

সে শব্দ কাণে আসিতেই ছোট্টুর মা চমকিয়া উঠিল। ও কে?—মা বলিয়া ডাকে ও কেরে? ও কার বুকফাটা কাতর আহ্বান?—ছোট্টুর না তা'র গুপ্ত ঘাতকের? ছোট্টুর মা ত্বরিতে গতিরোধ করিয়া সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

অগ্নিবর্ষী জ্বালাময় নয়নের দৃষ্টি উপরে তুলিয়া দেখিল ঊর্দ্ধে অনন্ত অপরিসীম শুব্ধ নৈশাকাশ অগণিত অনিমেষ দীপ্ত আঁখিতারা মেলিয়া নীরবে জাগিয়া আছে,—আর সেই উন্মুক্ত উদার গগণতলে দাঁড়াইয়া তাহারই পুত্র হত্যাকারী আর্ত্তকণ্ঠে তাহাকেই মা বলিয়া ডাকিতেছে, নরশোণিত লিপ্সু সাংঘাতিক অস্ত্রখানা তাহার মুঠার মধ্যে শিথিল হইয়া আসিল, মুহূর্ত্তে বিবেকের তীব্র কষাঘাতে সেই শোকোন্মাদিনীর অন্তরের গোপনপ্রদেশে মূর্চ্ছাহত মাতৃত্ব যেন চেতনা পাইয়া সাড়া দিয়া উঠিল। সে আজ একি করিতেছে?—কেন করিতেছে?—সে না নারী?—সেও না একজন 'মা'! আর হতভাগা বাহাদুর, যদিও সে নরঘাতক, হোক সে তা'র পুত্রহন্তা, তবু সেও তো একটা 'ছেলে'—তাহাতে আবার বিপন্ন, ভয়ার্ত্ত মায়ের শরণাগত—
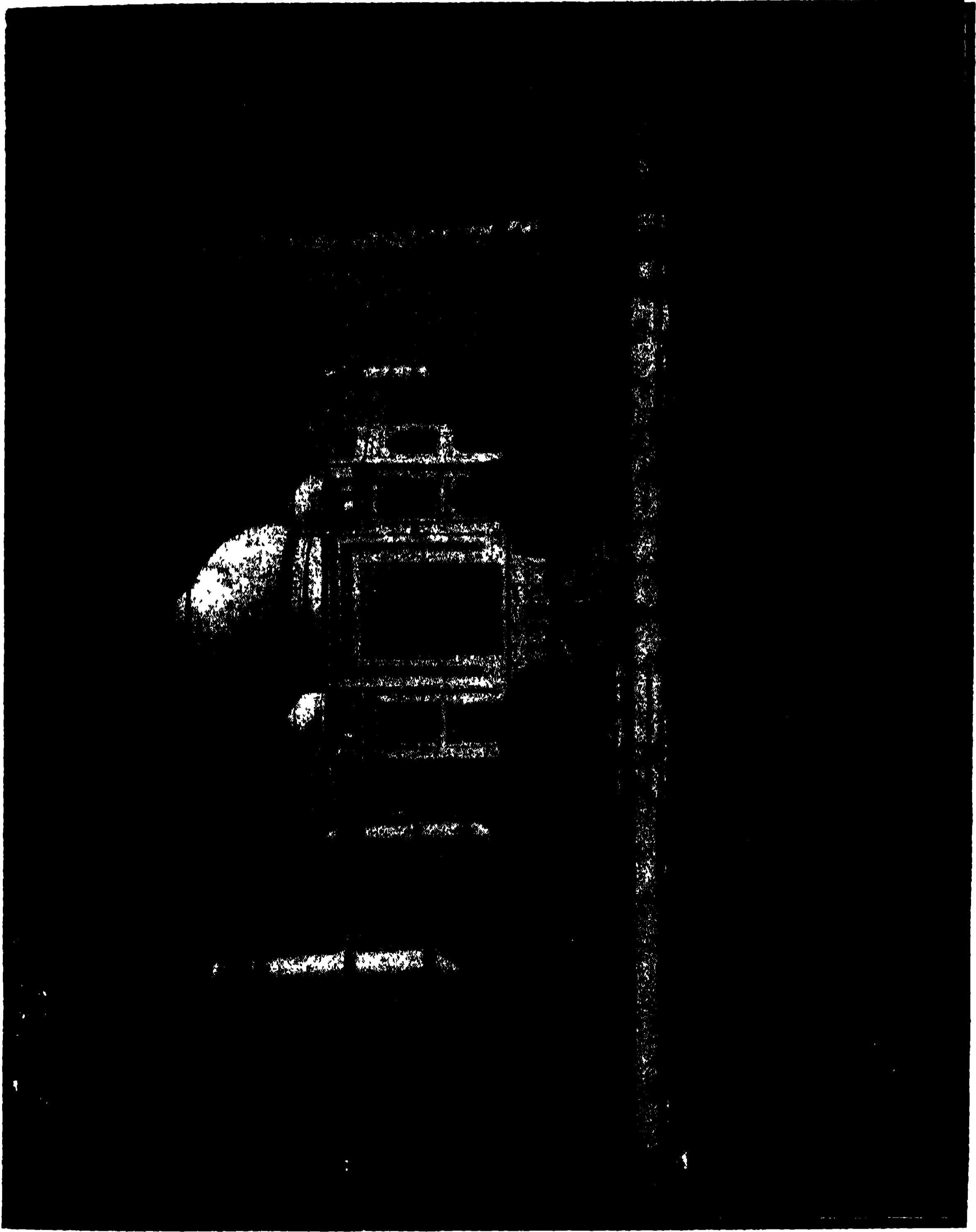
জ্যোৎস্না-স্নাত তাজ

ছোট্টুর মা 'খুকুরীটা' ফেলিয়া দিয়া শশব্যস্তে গিয়া সদর দরজাটা ঝনাৎ করিয়া খুলিয়া দিল, অস্বাভাবিক দ্রুতস্বরে দৃঢ়কণ্ঠে সে বলিল "বেরিয়ে যাও!" তখন অন্তিম আশার উপর নির্ভর করিয়া, ত্রাসে সঙ্কোচে মাথাটা প্রায় বুকের উপর ঝুঁকাইয়া, বলিভয়ে ভীত ছাগশিশুর মত কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া বাহাদুর অপত্য বিয়োগবিধুরা জননীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল। ত্রস্তে দুই পা পিছাইয়া ছোট্টুর মা বাহাদুরকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বহির্দ্বার দেখাইয়া দিয়া বজ্রগম্ভীর দৃপ্তকণ্ঠে কহিল "যাও!—শীগ্‌গির যাও!" সেই কঠোর আদেশ অগ্রাহ্য করিবার মত সাহস বা শক্তি বাহাদুরের তখন ছিল না, চকিত ব্যথিত করুণ কটাক্ষে একবার পুত্রহারা অভাগিনীর পানে চাহিয়া সে নতমুখে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। তাহার ছায়াটুকু নৈশ আঁধারে মিলাইয়া গেলে ছোট্টুর মা একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, আর একবার নক্ষত্রদীপ্ত মুক্ত আকাশের দিকে চাহিল, সে নিশ্বাসে, সে দৃষ্টিতে আর সে অনলের জ্বালা ছিল না, ছিল শুধু সুগভীর স্তব্ধ মর্ম্মব্যথা—আর মৃত্যুর নির্ব্বিকার হিম শীতলতা—

পতিত 'খুকৰী'খানা কুড়াইয়া লইয়া ছোট্টুর মা তখন পুনরায় মৃত পুত্রের কক্ষে ফিরিয়া আসিল এবং ভিতর হইতে কপাটে অর্গল বন্ধ করিয়া দিল।

নারীর প্রাণ

শ্রীসুরুচিবালা রায়

১

পাশের বাড়ীর জানালা হইতে মধুর কণ্ঠের আহ্বান শুনিয়া নিজেদের জানালায় মুখ বাড়াইয়া বেলা কহিল, 'সুরমা দি, ডাক্‌লে নাকি?'

সম্মুখের জানালায় আবার একখানি হাসিমাখা সুন্দর মুখ ফুটিয়া উঠিল, সেদিকে তাকাইয়া বেলা আবার কহিল – সুরমাদি কি আমায় ডাক্‌ছিলে?

হাসিয়া সুরমাদি কহিলেন—'যাহোক্, সাড়া যে তবু মিল্‌লো! আজ বুঝি তোমাদের রোববার?—তাই আর এদিক দিয়ে উঁকি দেবার অবসরটুকুও নেই?'

সলজ্জ হাসি হাসিয়া বেলা কহিল—তুমিই বা ক'বার আজ আমায় ডাক্‌লে সুরমা দি?—রোববার বুঝি একলা খালি আমারই গেলো? সারাদিনটা আজ তুমিই বা কাটালে কোথায়?

যথোচিত উত্তর পাইয়া সুরমা-দি কেবলমাত্র হাসি দ্বারাই উত্তরের প্রত্যুত্তর দিলেন, তারপর হাসিতে হাসিতেই কহিলেন, 'বেশ বেশ, আজ তবে ভালো ক'রেই রোববারটাকে ভোগ করা যাক্, কেমন? সন্ধ্যায় আজ খুব ভালো বায়স্কোপ আছে, চল, যাবে? বলগে যাও তোমার কর্ত্তাটীকে।

—তোমরা দু'জনেই যাচ্ছ বুঝি?

সুরমা কহিল, 'হ্যাঁ দুজনেই, উনিই ত আমায় বল্লেন। আমি ভাবলুম তোকেও বলে আসি গে'- যাস্ নে ত কোথাও।

—কি জানি সুরমাদি পার্ব্বো কি যেতে? মাথাটা ধরেছে বড্ডো ভাই! আচ্ছা দেখি—

—তোর খালি লেগেই আছে, আজ এটা—কাল সেটা, কি যে তোর শরীর বাপু! তা' এখনো ত দেরী আছে ঘণ্টা খানেক! মাথাটা এর ভেতর ভালোও হ'তে পারে ত'।

অন্যমনস্কভাবে বেলা কহিল—আচ্ছা দেখি,—

—তা' হলে তৈরি হ'য়ে নিস্,—চল্লুম আমি—কেমন?

একটুখানি হাসিয়া বেলা কহিল—'হ্যাঁ যাও, অনেকক্ষণ একা আছেন'—

সহাস নেত্রে ভ্রূকুটি আনিয়া সুরমা ছোট একটা কীল দেখাইয়া ঘরের ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

২

চিকিৎসা শাস্ত্রের উচ্চপ্রশংসিত নূতন একখানি বই লণ্ডন হইতে আনাইয়া যোগেন তাহাতেই নিবিষ্টভাবে মগ্ন হইয়াছিল, পর্দ্দা তুলিয়া, মৃদু পাদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বেলা কহিল—'এখনো পড়চো? উঠবে না এখন?'

বই হইতে অন্যমনস্কভাবে একবার মাত্র মাথা তুলিয়া আবার বহির পাতায় চোখ রাখিয়া যোগেন কহিল,—কেন বলত? দরকার আছে নাকি কিছু?

—না: দরকার আর কি। এম্‌নিই বল্‌ছিলুম।

যোগেন একবার মাত্র একটা 'ও:' বলিয়া আবার পড়ায় মন দিল, বেলা টেবিলের বহিগুলি খানিক্ষকণ নাড়াচাড়া করিয়া রাস্তার ওপরের জানালাটিতে দাঁড়াইয়া নীরবে পথের লোক চলাচল দেখিতে লাগিল।—মিনিট কয়েক কাটিয়া গেল, দিনের আলো নিবিবার সঙ্গে সঙ্গে গোধূলির একটা ম্লান আলো ঘরের ভিতরখানিও ক্রমে ক্রমে ছাইয়া ফেলিতেছিল, বহির পাতায় অক্ষর যখন আর স্পষ্ট চেনা যাইতেছিল না,—যোগেন মুখ তুলিয়া কহিল,—'এই যে, তুমি আছো ঘরে! লাইট্‌টা জ্বেলে দাও বেলা!'

ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বেলা হাত বাড়াইয়া সুইচটা টিপিয়া দিল, তারপর টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া দুই একবার একটু ইতস্তত: করিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—সুরমাদি বায়োস্কোপে যাচ্ছে,—যেতে বল্‌ছিল।

—বায়স্কোপ? কেন?

—কেন? কেন আবার কি? দেখতে।

—দেখতে? এই ঘোর শীতে বায়োস্কোপ থিয়েটারে জেগে বসে থাকবার সখ?—না, না, যেতে হবে না তোমার, এর পরে ঠাণ্ডা টাণ্ডা লাগিয়ে এসে বিতিকিচ্ছি একটা কাণ্ড করে বস আর কি?

—তোমায়ও যেতে বলছিল।

—আমায়? পাগল না কি? একে ত' কোনও কালেই এসবে আমার সখ নেই, তার উপর আবার এই ভীষণ ঠাণ্ডায়, আর আমার অবসরই বা কোথায়!

ধীর শান্ত পদে বেলা আবার বাহির হইয়া গেল, ওপাশের জানালা হইতে আহ্বান আসিতেছিল, সেই দিকে গিয়া দাঁড়াইতেই সুরমা কহিল,—ওমা:, তোর এখনো কিছু হয়নি দেখচি! উনি আরো তখন থেকে আমায় তাড়া দিয়ে দিয়ে অস্থির করে তুল্লেন যে!

—কি করে যাবো ভাই সুরমাদি, মাথাটা যে সারলো না ভাই একটুও!

—এখনো সারে নি?

—না ভাই!

—তা' হলে কি আর করা যাবে, তুই তবে ঘুমোগে যা',—আমরা যাই, ভেবেছিলাম সবাই একসঙ্গে যাবো!—যোগেনবাবুও তোকে ফেলে যেতে পার্লে'ন না বুঝি?

—কি করে যাবেন বল?

—তাইত, আচ্ছা চল্লুম।

গভীর ভাবে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বেলা ধীর পাদক্ষেপে রাস্তার উপরের গাড়ী বারান্দাটাতে আসিয়া নীচের পথে একাগ্র দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইল, রাস্তার উপরে প্রকাণ্ড একটা ব্রুহাম গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। প্রথমে সুরমা, তৎপশ্চাৎ পরেশবাবু আস্তে আস্তে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। বহুদূর পর্য্যন্ত সুরমার গোলাপী শাড়ীর আঁচলটুকু উড়িয়া উড়িয়া বেলার চোখে পড়িতে লাগিল, যখন দেখা আর গেল না, বেলা সে স্থান হইতে সরিয়া বারান্দার এক কোণে গিয়া বসিল। ঘণ্টা দুই পরে সহসা ঝির ডাকে একটা কেমন স্বপ্নঘোর হইতে জাগিয়া শুনিল—'মা, ও মা, উঠে এসো না গো, বাবু যে একলাটি বসে খাচ্চেন।

চকিতভাবে বেলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্তভাবে বলিল, খেতে গেছেন? ডাকিস্‌নি কেন আগে?

স্বামী আহারে বসিয়াছেন, সঙ্কুচিতপদে, লজ্জিতভাবে বেলা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।—মুখ তুলিয়া যোগেন কহিল, অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে, শরীর খারাপ হয়নি ত?—

ছোট্ট একটী 'না' বলিয়া বেলা চুপ করিল, আহার শেষ করিয়া যোগেন কহিল,—তাড়াতাড়ি করে খাওয়া দাওয়া শেষ করে চলে এসো বুঝলে? বেশী রাত করো না যেন,—শীতের রাত, কি ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা, আর তুমি কি অনিয়মই কর রোজ রোজ?

তাহার পর আচমন শেষ করিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে চাকরদের ডাকিয়া কহিল,—ওরে ও ভুতো একটু শীগগীর শীগগীর করে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তোরা সব ঘুমো বাপু, অত রাত জেগে বসে থেকে সব আড্ডা দিস নে! শেষকালে অসুখ-টসুখে পড়ে বিপদে ফেল্‌বি যে আমায়!

মাথা হেঁট করিয়া মাছের কাঁটা বাছিতে বাছিতে বেলা ভাবিতে লাগিল, সব্বার জন্যেই চিন্তা, ভাবনা, চাকরবাকরগুলো সাধে কি এত প্রশংসা করে? বেলার নিজের জন্য ভাবনাও ত কারু চেয়ে কিছু কম নয়, কিন্তু—কিন্তু—চাকর বাকর বা সংসারের আর সকল আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তুলনায় বেলার পার্থক্যটা তবে কোথায়!—

মাখা ভাত কতকটা খাইয়া, কতকটা চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া বেলা আঁচাইতে উঠিয়া

গেল। তারপর কলতলায় বসিয়া বসিয়া কতক্ষণ ধরিয়া বেলা চোখই কেবল ধুইতে লাগিল—সংসারের লোক বা পৃথিবীর কেহ জানিল না, কোন্ জলের সংমিশ্রণে আজ কলতলার পাথর লবণাক্ত হইয়া গেল।

৩

আঃ—কি কর্লে বল দিকিনি, কি করে কাটলে হাতটা এমন করে? এসো এসো বেঁধে দিই? কই কই জ্যামবাক্ কই, একটু আইডিন চাই যে আগে,—ও রে ও ভুতো, ও গোপাল!

গৃহকর্ত্তার ব্যস্ত আহ্বানে, গোপাল, গণেশ, ভুতো প্রভৃতি চাকর বাকরগুলির একটু জ্যামবাক ও আইডিনের সন্ধানে বাড়ীময় ছুটাছুটি পড়িয়া গেল, এবং বেলা শুধু নীরবে বসিয়া তাহার তুচ্ছ আঙ্গুলের একটু শুধু রক্তপাতের জন্য স্বামীর অতি-ব্যস্ততা দেখিতে লাগিল। হাত বাঁধা হইয়া গেল, মাঝে মাঝে আইডিন দিয়া আঙ্গুলটা ভিজাইবার উপদেশ দিয়া স্বামী বাহিরে চলিয়া গেলেন, বেলাও উঠিয়া শোবার ঘরে জানালাটির পাশে গিয়া বসিল।

পথে অসংখ্য লোক চলাফেরা করিতেছে, তাহারই মধ্যে সহসা একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, ছোট একটা বছর পাঁচকের ছেলে ছুটতে ছুটিতে কেমন করিয়া আসিয়া সহসা একটা চলন্ত মোটরের তলায় পড়িয়া গেল, একটা অসহনীয় যন্ত্রণা ও আতঙ্কে বেলার কাণে অর্দ্ধস্ফুট চীৎকার একটা ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতে মূর্চ্ছিতা বেলা মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে কতকটা সুস্থ হইয়া বেলা যখন নীচে নামিয়া আসিল, বালকটীকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার এ্যাম্বুলান্স তখনও আসে নাই, রক্তাক্ত শয্যাটীর উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে; যোগেন কম্পাউণ্ডারের সাহায্যে বালকটীর সংজ্ঞা ফিরাইবার জন্য অশেষ রকমের চেষ্টা করিতেছে, বেলা খানিকক্ষণ নীরবে সেবারত তাহার ডাক্তার-স্বামীটীর পানে তাকাইয়া আবার ধীরে উপরে উঠিয়া গেল।

স্বামীর এই সেবারত একান্ত তন্ময় ভাবটী তাহার চোখে আজই শুধু প্রথম নহে, এ মূর্ত্তি দেখিয়া, তাহার মন কতবার বিস্মিত হইয়াছে, মোহিত হইয়াছে, এই মূর্ত্তির পদতলে তাহার ভক্তিনত প্রাণ একান্ত নির্ভয়ে কত বার বার লুটাইয়া পড়িয়াছে।

সবই ত ভালই ছিল, তাহার পিতা কন্যাদের জামাতা নির্ব্বাচনে সংসার খানি ওলট পালট করিয়া দেখিতেন, ডুবুরি যেমন করিয়া সাগর সেঁচিয়া মুক্তা আহরণ করে, তেমনই করিয়া তাহার পিতা দেশটি সেঁচিয়া পাত্র বাছিয়া নিতেন! সত্যই ত, তাহার স্বামীর মত এমন সর্ব্বগুণে গুণী, এমন বিদ্বান, ধার্ম্মিক, এমন জনপ্রিয় স্বামী এই পাড়ায় আর কাহার আছে!—ইঁহাকে পাইয়া শ্বশুর, শাশুড়ী, পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন সকলে খুসী, আহা প্রতিবাসী ইঁহার ব্যবহারে, আলাপ আলোচনায় মুগ্ধ মোহিত; দাসদাসী ইঁহার একটী কথায় প্রাণপণ করিতে

সর্ব্বদা প্রস্তুত,—এমন জ্ঞানবান, এমন হৃদয়বান তাহার স্বামী! তাহার সঙ্গে ব্যবহারেরও তাঁহার কোন ত্রুটি ত' কোন দিন কেহ দেখে নাই, তাহার সুস্থতা অসুস্থতা, বা তাহার কোনো কিছুর অভাবের প্রতিই বা তাঁহার কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এমন স্বামী কি সকলের হয়? যার হয়, সংসারে সেই ত ভাগ্যবতী!

সকলই ভাল, সবই বেশ, তবু এ জীবনটার মধ্যে একটা কিন্তু আসে কেন?—বেদনার্ত্ত প্রাণে বেলা বসিয়া ভাবিতে লাগিল এ 'কিন্তু'র মীমাংসা কবে হইবে! ও কেমন করিয়া হইবে?

৪

স্বামীর পাঠগৃহের চারিপাশে খানিকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেলা শোবার ঘরে আসিয়া অর্গ্যানটীতে হাত দিয়া বসিল, মনে মনে কি ভাবিয়া আবার অর্গ্যানটী বন্ধ করিয়া হাত খানি তুলিয়া নিল। অর্গ্যানটী বহু পুরাতন, তাহার বিবাহের সময়ের যৌতুক পাওয়া, মাঝে মাঝে এর দুই একটা চাবীতে সুর ফোটে না, ভেতরের কোন্ কলে কি দোষ ঘটিয়াছে কে জানে। অর্গ্যানটার বেসুরো বেতালা সুর শুনিয়া সুরমা কতদিন বলিয়াছে, অর্গ্যানটা ঠিক করিস্ নে কেন রে বেলা, কি বিশ্রীই যে বাজে!

বেলা বলে—এই যে এ'বারেই কর্ত্তে দেবো সুরমাদি, মনেই কেমন থাকে না ভাই।

একটু চোখ ঘুরাইয়া, একটু মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া সুরমা কহে—তা' মনে আর কি ক'রে থাকবে ভাই, মনে কি আর তোদের জায়গা আছে!

বেলাও হাসিয়া কহে, ঈশ!

বেশি জোরে প্রতিবাদ করিতে বেলার সাহস হয় না, পাছে সেই প্রতিবাদ করা কথাটিই সুরমাদি বিশ্বাস করিয়া বসে।

ইহার পর আরও দুই চারি দিনও সেই ভাঙ্গা অর্গ্যানেরই সুর শুনিয়া সুরমা কহিলেন—উনি কি বলেন, তা শুনেছিস্ বেলা!

—কি বলেন?

বলেন যে, তোমার বোন বেসুরা বাজনার সঙ্গে গান গেয়ে, তাঁর গলা যে তুলনায় কত মিষ্টি যোগেনকে তাই শুধু শোনাতে চান।

না, না, তা না, কক্ষণো না।

তা' হলে এতকাল ধরে আর একটা অর্গ্যান ঠিক হচ্চে না, যোগেন বাবু ত' খালি বই-এই মাথা গুঁজে পড়ে থাকে দিন রাত! ওর এসব দেখবার সময় হয় না বুঝি!

—না ভাই সুরমাদি, উনি ত চেয়েছিলেন, আমিই পাঠালুম না।

এ যুক্তিহীন কথাগুলি সুরমা কতখানি বিশ্বাস করিল কে জানে, কিন্তু কথাগুলি বলিয়াই

বেলা ঘরে চলিয়া গিয়া ভাবিল—পাশের বাড়ী থেকে সুরমাদিদির বরের কাণেও বেসুরো সুরটী গিয়ে পৌঁছেছে কিন্তু এক বাড়ীতে থেকেও উনি একবারও একথা জানলেন না, উনি শুনলেনও না, বাজনার আমার কোথায় দোষ আছে! আমার গান পথের লোকে দাঁড়িয়ে শুনে যায়, কিন্তু আমি গাই বা না গাই তাতে ওঁর কিছু যায় আসে না! বলবো না ত' আমি, —নিজে থেকে কক্ষণো বলতে যাবো না কিছু! পড়ে থাক আমার এ ভাঙ্গা অর্গ্যান, আমি আর গাইবো না, বাজাবোও না, কক্ষণো না।

বেলা জানিত, আজ মুখ ফুটিয়া একবারটী জানাইলেই তাহার ক'গণ্ডা নতুন অর্গান বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইবে, কিন্তু মনের দুরন্ত অভিমান তার গর্জ্জন করিয়া কহিত—কখনো না, কখনো না! এ কি শুধু বেলা বলেই বেলাকে দেওয়া? নিশ্চয় তা নয়! স্বামী তাহার দয়াবান, দানশীল, সংসারের আর পাঁচজনের অভাব কেমন করিয়া তিনি মোচন করিতে চাহেন; স্ত্রীর অভাবের প্রতিও তেমনই তাঁর দৃষ্টি কিন্তু হায়, বেলা কেমন করিয়া বুঝাইবে, তাহার বুভুক্ষু বক্ষে অপরিমিত ক্ষুধা যে ইহাতেই শুধু মেটে না! নতুন নতুন কেনা পাঁচটা অর্গ্যানেই তাহার কি হইবে! গান যদি তিনি শুনিতেন, খোঁজ যদি তিনি নিতেন, এই ভাঙ্গা অর্গানের গান বাজনাই আজ তাঁহার সার্থক হইয়া উঠিত।

বেলা গান বন্ধ করিল কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। স্বামী একদিনও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন না, 'কই বেলা আর ত' গান কর না।

স্বামী শুধু কহেন বেলা ঠাণ্ডা লাগিয়ো না অসুখ কর্ব্বে!

স্বামী কহেন 'অত রাত জেগো না বেলা ঘুমিয়ে পড় শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর চারিদিকে—

হায়, তাঁহাকে বেলা তখন কেমন করিয়া বুঝাইবে, শরীরে তাহার কোনো পীড়া কোন গ্লানি নাই, এ শরীর তাহার কোনো কিছুতে কোনদিন ভাঙ্গিবে না, কোন দিনই শুকাইবে না—তুচ্ছ এ শরীর! শত ধিক্ এ প্রাণটায় কিন্তু ওগো,—ওগো দেবতা আমার! এ মনটার দিকে একবার ফিরিয়া চাও, তোমার অবহেলায়, তোমার অজানায় এটা যে আজ আমার যায়!—

পাঠ সমাপন করিয়া বহু নতুন তথ্যের নতুন সন্ধান পাইয়া ফুল্ল-পুলকিত চিত্তে স্বামী ঘরে আসেন; হঠাৎ বেলার শুষ্ক মুখখানি, ছল ছল চক্ষুদুটি চোখে পড়িলে ব্যস্ত ভাবে কাছে আসিয়া পত্নীর ললাটস্পর্শ করিয়া দেহের উত্তাপ অনুভব করেন; মণিবন্ধে হাত রাখিয়া নাড়ীর গতি বুঝিতে চাহেন; কখনও বা থার্ম্মোমিটারের সন্ধানে ছুটিয়া যান; মাঝে মাঝে বেলার তখন হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়, তাহার এই তুলতুলে হাত দু'খানিতে চক্‌চকে চুড়ি ক'গাছি দেখিয়া সুরমাদি একদিন রহস্য করিয়া কি একটা

কথা কহিয়াছিল,—বুকের ভিতর একটা কিসের ঝড় বহিয়া যায়, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চক্ষু দুটি জোরে মুদিয়া আসে! বেলা সে ঝড়টা শান্ত করিতে চেষ্টা করে না। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মৃদু অনুযোগ এবং কিছু উপদেশ দিয়া স্বামী আবার বাহিরে চলিয়া যান—আর শূন্য ঘরের শুষ্ক দেওয়াল গুলির পানে চাহিয়া চাহিয়া বেলার শুষ্ক চক্ষুদু'টি কেবল জ্বলিতে থাকে। মাঝে মাঝে প্রায়ই তখন পাশের বাড়ীর জানালায় চুড়ির মৃদু ঠুন্ ঠুন্ শব্দ বাজিয়া উঠে; একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়া একটু দেরী করিয়া বেলা জানালায় আসিয়া দাঁড়ায় ও পাশের জানালাটী হইতে হাসি খুসী-আনন্দে ঝলমল্ করিতে করিতে সুরমাদি কহেন, 'কি গো বেল ফুল, পাত্তাই যে পাওয়া যায় না আর, দাম বড্ডো বেড়েছে বুঝি?

"আহাঃ সুরমাদির যে কথা, আমার আবার দাম"—

"ঈশ্ তোমার কোন দাম নেই। একদম অ-মূল্য! কর্ত্তাটি কোথায়?

"এইমাত্র ভাই নেমে গেলেন উপুর থেকে।"

"ওমা তাই না কি? ডেকে তবে ভুল কল্লু'ম ত বড্ডো, আজ বুঝি তোদের রোববার ছিলো ভাই বেল ফুল?"

"আহা নিজেদের ব্যাপারটা অন্যের উপর চালান দেওয়া ভারী সোজা, না ভাই? তোমরা হচ্চো প্রফেসর মানুষ, রোববারও হচ্চে তোমাদেরই, আমাদের আর কি! আমাদের রোববারও যা, সোমবারও তা' রোজই ছুটি রোজই কাজ।"

একদিন দুপুর বেলা আহারাদির পর বেলা মাদুর পাতিয়া বসিয়া, অর্দ্ধসমাপ্ত একটা টেবিল ক্লথে ফুলের কুঁড়ি তুলিতেছিল, সুরমা আসিয়া তাহাদের বিবাহ তিথির উৎসব উপলক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীকে সেদিনের নৈশ ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল; বেলা হাসিয়া কহিল, কি পেলে, আর কি দিলে, আজকের দিনে ভাই সুরমাদি?

লজ্জিত ভাবে হাসিয়া সুরমা কহিল, 'আর বলিসনি ভাই, তাঁর যা সব কাণ্ড! এক যোড়া হীরের ব্রেসলেট আর বেনারসী শাড়ী, ব্লাউজ, ভাই, নিজে একেবারে পছন্দ করে নিয়ে এলেন কিনে', আমি কত বারণ কল্লুম, বল্লুম, এসব ত আছে, আবার কেন? তা কি আর শোনেন তিনি? বলেন, নতুন নতুন জিনিষ পরিয়ে তাকিয়ে দেখতে তাঁর ভালো লাগে। এরপর আর কি বলতে পারি, বল্ দিকিনি ভাই! এমন পাগল আর দেখেছিস্ কোথাও!

সুরমার চোখে মুখে আনন্দের জ্যোতিঃধারা উছলিয়া উঠিল। বেলা বিহ্বলের ন্যায় সে দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর মুখে হাসি আনিয়া কহিল—'আর তুমি?'

'আমি? আমি কি রোজগার করি যে কিছু দেবো? তা' একেবারেই কি কিছু আর না দিতে ইচ্ছে করে ভাই?'

কাপড় কিনে বিছানার চাদর আর বালিসের ওয়াড় তৈরি ক'রে তাতে এমব্রয়ডারী

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

‘অভেদ আত্মা’

কর্ত্তা ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ, খাদ্যলোভাতুর, ভোজন-রত পুত্রকে দেখিয়া বলিলেন “পাচু—আমায় একটু দেনা ভাই” ছেলে বাপের কথায় ভয় পাইয়া মাকে ডাকিয়া আনিল। গৃহিণীর মুখখানা ভারী দেখিয়াই কর্ত্তা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন আমায় আর কিছু বলিস্ না মা—আমি বুঝেছি যে আত্মার কোন ভেদ নাই—গৃহিণী নির্ব্বাক্।

করে দিয়েছি, আমি আর কি দেবো বল্‌ত' ভাই, তা' এও দেখতে কিছু মন্দ হয় নি, সত্যি বেলা, দেখিস্ গিয়ে।—তা ছাড়া ঐ থান কাপড়খানি আমি কি করে কিনেছিলুম, তা জানিস ভাই বেলী? সেই যে দুটো ব্লটার তৈরি করেছিলুম—ভেলভেটের উপর রেশমী-সুতোর ফুল তুলে। সেই দুটোই বারোটাকায় বিক্রী করিয়ে আনালুম ভাই সেদিন। তা' এ'ত' একরকম আমার রোজগারের টাকা হ'তেই হোল, নয় ভাই বেলা?

বেলা স্তব্ধ হইয়া শুধু বসিয়া রহিল, তাহার পর সুরমা চলিয়া গেলে সেই মাদুরেই উপুড় হইয়া পড়িয়া মুহুর্মুহু কেবলই ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।—হায় প্রভু! স্বাদ যাহার জানি নাই, তার আর না-ইবা কিছু জানিতাম কোনদিন। অন্যের দেখাইয়া দেখাইয়া কেন তার জন্য ক্ষুধা জাগাইয়া দাও? আর দিন পনর পরে বেলারও বিবাহের তিথি আসিতেছে, সে কথা কাহারও মনে আছে কি?

বিলেত চল্লুম।

বিলেত!

হ্যাঁ, তবে বেশি দিনের জন্যে নয়, বছর খানেক থেকে একটা পরীক্ষা দিয়ে আসি গে, কি বল? তা' নইলে আর সুবিধে হচ্ছে না যেন।

বেলা নীরবে শুধু দেয়ালের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

যোগেন পত্নীর পানে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'এই ক'টা দিন তুমি তোমার দাদার ওখানে গিয়েই থাক, কেমন? খালি বাড়ীটায় থাকাত' আর সম্ভব নয়। সর্ব্বদা চিঠি পত্র দিয়ো, আর খুব সাবধানে থেকো, বুঝলে?'

কবে যাবে?

'এই ত এই সামনের মেলেই। বৃহস্পতি বারে!'

রুদ্ধস্বরে বেলা কহিল 'সে ত' আর পাঁচদিন খালি মাঝে আছে!'

হাসিয়া যোগেন সস্নেহে কহিল, তা' পাঁচ দিন কি কিছু কম হ'ল?

জীবনে আজ প্রথম বেলা স্বামীর সম্মুখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া আকুল কণ্ঠে কহিল, 'না গো না, পাঁচ দিন কম না, পাঁচদিন তোমার পক্ষে খুবই বেশি! কিন্তু আমায় আগে বল নি কেন?'

'আগে ত আমি পাকাপাকি কিছুই ঠিক করি নি বেলা, তাই বলি নি, তা ত'াতে কি হয়েছে? মেয়েরা ত এম্‌নিতেও একবছর দেড় বছর বাপের বাড়ী গিয়ে থাকে, তার জন্যে অত আর ভাববার কি আছে, বলত,—ছি! অমন পাগলামো করে কি? রাত ঢের

হ'ল, সকাল সকাল কাল উঠতে হবে, আবার কত কাজই যে জমে আছে, নাও ঘুমিয়ে পড়, আর রাত জাগে না ; অসুখ কর্ব্বে যে শেষে।—

স্বামী নির্ব্বিকার চিত্তে ঘুমাইয়া পড়িলেন, আর বেলা সারা রাত শুধু তাঁর শয্যাপ্রান্তে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাইল।

পাঁচটা দিন—যেন পাঁচটা মিনিটেরই মত দ্রুত উড়িয়া গেল, এই ক'দিন যোগেনের আর মোটে অবসর মিলিল না, জিনিষ পত্র কিনিতে কিনিতে, লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে করিতে, কেমন করিয়া যে যাত্রার মুহূর্ত্তটী একেবারে সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল, সে তাহা জানিতেও পারিল না।—একেবারে নির্ব্বাক শান্তভাবে বেলাও স্বামীর যাত্রার সমুদয় আয়োজন করিয়া দিল, তাহার পর স্বামী চলিয়া গেলে দ্বারটী রুদ্ধ করিয়া তাঁহারই পরিত্যক্ত শয্যাটিতে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল। পরদিন সুরমার বহু অনুরোধে সে দ্বার যখন সে খুলিল তখন তাহার চেহারার পানে তাকাইয়া সুরমার কথা বন্ধ হইয়া গেল। বেলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘরে ঢুকিয়া শয্যাপ্রান্তে বেলার পাশে বসিয়া, সুরমা কহিল 'বেলফুল, এ কি চেহারা করেছিস, ভাই, স্বামী কি কা'রও বিদেশে যায় না ?'

অশ্রুধারা গোপন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি অগোছাল টেবিলটার কাগজ কলমগুলি গুছাইবার ভাণ করিতে করিতে বেলা কহিল,—আহাঃ তাই বুঝি ! শরীরটা খারাপ ছিল, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, আর তাই বোধ হয় খারাপ দেখাচ্ছে।

আচ্ছা, তা আমি বুঝি বেশ, চল, আজ রাত্তিরে তুই আমার কাছে থাকবি, এখন একটু কোথাও ঘুরে আসি গে চল, উনিও বসে আছেন গাড়ীও তৈরি।

বেলা ব্যস্তভাবে খাট বিছানা কাপড় চোপড় ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল,—সে দেখা যাবে পরে, আগে আমি গা ধুয়ে আসি, সুরমাদি, তুমি ততক্ষণ বস ভাই !

পার্শ্বস্থিত স্নানের ঘর খানিতে ঢুকিয়া পড়িয়া দরজাটী বেলা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর বহুক্ষণ,—বহুক্ষণ আর তাহার কোন সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না।—নীরব, নির্জ্জন, অন্ধকারে বদ্ধ ক্ষুদ্র গৃহটীর চঞ্চল জলস্রোতে মিলিয়া এই নিঃসঙ্গ নারীটীর চির আঁধার প্রাণখানির কত শত অপ্রকাশিত ধারা কোন্ পাতালে আজ বহিয়া চলিল,—সংসারের কে তাহার খবর রাখিল !

দিন দুই পরে সুরমা কহিল, তোর বাপের বাড়ী গেলিনে কেন ভাই বেলফুল, তোর মা এসে রাগ করে ফিরে গেলেন।

বেলা শুধু কহিল—'না ভাই।'

'তবে আমার ওখানেই চল, বাড়ী দেখা শোনাও চলবে কাছে থেকে, বেশ হবে।'

'না ভাই সুরমা দি বেশ আছি আমি !'

'একলাই থাকবি ?'

'একলা আর কি, আমার বুড়ো ঝিকে আনিয়েছি, মায়ের মতন সে থাকবে কাছে।'

'তবে থাক্।'

ওবেলা মা রাগ করিয়া গিয়াছেন, এইবেলা সুরমাও চলিয়া গেল, বেলা খানিকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া, এঘরে ওঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কাজ নাই, কি দীর্ঘই এই দিনগুলি! আর কি-ই অভিশপ্ত এই বিপুল অবসর!

খানিকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেলা শাড়ীর ট্রাঙ্ক খানি খুলিয়া গুছাইতে বসিয়া গেল, বৈদ্যুতিক বাতির উজ্জ্বল আলোতে রং বেরংএর শাড়ীগুলি চক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করিতেছে, তাকাইয়া তাকাইয়া বেলার চোখে যেন জ্বালা ধরিয়া গেল, শাড়ীগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে সহসা একখানি অতি পাতলা, ফিকে নীল রংএর শাড়ী হাতে তুলিতেই, কত যে পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল!—এই শাড়ীখানি জন্মদিনে পাওয়া তাহার এক বন্ধুর উপহার। বিবাহের প্রথম বছরটাই শুধু, তাহার জন্মতিথির কথা স্বামীর মনে ছিল, এবং সেবারই প্রথম তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও যত্নে নতুন গয়না নতুন শাড়ীতে বেলাকে নিজের হাতে সাজাইয়া দিয়াছিলেন,—তার পরে, হায়, দিনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষটীও সে স্বামীর কাছে পুরাতন হইয়া আসিতে লাগিল, স্বামীর তাঁহার ব্যবসার পানে মন গেল, টাকার নেশায় মন মাতাল হইল, সংসারের আর কিছু চোখে তাঁহার আর প্রায়ই ফুটিত না, অভিমানে আহত হইয়া বেলার মনও স্বামীর কাছ হইতে দূরে থাকিয়া চলিত।

পরের বছর, জন্মদিনের কথাটি স্বামীর মনে ছিল না, মনে করাইয়া দিবার ইচ্ছাও বেলার হয় নাই, কিন্তু রাণী আসিয়া যখন নিজের হাতে শাড়ীখানি বন্ধুকে পরাইয়া এবং বেলার অজ্ঞাতসারেই তাহার মাথায় ও খোঁপায় কিছু ফুল গুঁজিয়া দিয়া গেল, বেলার তখন আর জোর করিবার ক্ষমতা ছিল না। ফাল্গুনী পূর্ণিমার পাগল-করা এই তিথিটীতে কি মাদকতাই যে সেদিন ছিল, কে তা' জানে! মাঝে মাঝে সাদা চুম্‌কি বসানো, জরিপাড় এই নীলাভ শাড়ীখানির হাস্‌নোহানার গন্ধে, মাথার যুঁই বকুলের একটা মিঠা সুবাস প্রাণের ভিতর তাহার কি একটা আবেগ জাগাইয়া তুলিতেছিল, জোছনামাখা ছাতখানির উপর নিজের ছায়াখানি, নিজের প্রতি পদক্ষেপটী মনে তাহার কি একটা আকুলতার সৃজন করিয়া তুলিতেছিল, কে জানে,—মনে প্রাণে বেলা কেবলই কেমন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল,—স্বামীর তখনো নীচের ঘরে, পড়ার কাজ শেষ হয় নাই, কত রাত্রে শেষ করিয়া কখন আসিবেন, কে জানে! খানিকক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, দেয়াল হইতে সেতার খানি পাড়িয়া আনিয়া, বেলা তাহার মনের সুরের সঙ্গে মিলাইয়া একটা গৎ বাজাইতে বসিল।

—বৌদি—

—এসো ঠাকুর-পো।

বৌদি, আজ তুমি আমায় ডাক নি, তবু, আমি কিন্তু এয়েছি।

বেশ করেচ, খালি কি আমি ডাক্‌লেই আসতে হবে, নিজে থেকে কক্ষণো কি আসতে নেই ভাই!

কিন্তু নিজে থেকেই ত আসি বৌদি, আগে আমার যাবার সময় প্রতিদিন তুমি আবার আসতে বলতে, এখন তো আর তা বল না।

বলি না—তুমি নিজে থেকেই আস কি-না পরীক্ষা কর্ব্বার জন্যে।

—সে পরীক্ষায় জয়ী হয়েচ ত বৌদি! আজ তোমার জন্মতিথি, তোমরা আমায় মনে কর নি, আমি নিজে সে কথা মনে করে এলাম, কার টান বেশি বল দেখি!

কার টান বেশি, এ কথা মুখে বলিবার বেলার আর প্রয়োজন হইল না! আপনাকে সম্বরণ করিবার আগেই সহসা বেলার চোখ দুইটি হইতে ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া অবিশ্রান্ত ধারে বাদলের ধারা ঝরিয়া পড়িল।

প্রকাশ মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া বেলার পায়ের কাছে কতকগুলি ফুলের মালা ও তোড়া রাখিয়া নীরবেই ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল। ইহার পর আসিল চিরহাস্যময়ী চিররঙ্গরহস্যময়ী সুরমা,—কাছে আসিয়া অভিভূত বেলাকে এপাশ ওপাশ হইতে বার বার নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া কহিল,—যদি ছবি তুলতে জানতুম, তা হ'লে আজ একখানা ফটো তুলে নিতুম, কি সুন্দরই তোকে মানিয়েছে ভাই, বেলফুল!—রাণীর পছন্দ আছে, চুম্‌কি বসানো এই সাড়িখানি না হ'লে আজ তোকে যেন মানাতোই না ভাই, আর পায়ের তলায় ও ফুলের ডালিটি কার রে? যোগেন বাবুর বুঝি! কি অনুরক্ত ভক্তই পেয়েছিস ভাই!

প্রস্রবণের যে ধারা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, এক ফোঁটা দুই ফোঁটা করিয়া আবার তাহা শাড়ির সাদা চুমকি গুলির উপর ঝরিয়া পড়িয়া ঝল্‌মল করিতে লাগিল।

স্বামী আসিলেন; রাত্রি দশটার পর একেবারে নীচে হইতে আহারাদি সারিয়া কহিলেন, 'তাই ত' বেলা, তুমি বসে আছো? আমি ভাবলুম আরো ঘুমিয়ে পড়েছো বুঝি,—খেতে ডেকে দিই গে—ও কি, অত ফুল কিসের? নতুন উড়ে মালীটা গেঁথে এনেছে বুঝি? ওঠ, যাও খেয়ে এসো গে, রাত এমনিই অনেক হয়েছে,—ঠাকুর চাকর গুলোরও দেরী হ'য়ে যাচ্ছে শুধু শুধু,—

ঘরের পানে ফিরিতে ফিরিতে স্বামী আবার আসিয়া কহিলেন, 'দেখ বেলা, কাল খুব ভোরে আমায় জাগিয়ে দিয়ো ত',—একজনের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে যেতে হবে।

স্বামী ঘুমাইতে চলিয়া গেলেন—

* * * * * * *

আদর প্রত্যাখ্যানের জিনিষ নহে, এ কথা বেলা হাড়ে হাড়েই বুঝিয়াছিল। তাই সে দিনের

শিলংয়ের পথে

শ্রীহরিদাস গাঙ্গুলী

সেই চুম্‌কি বসানো সাড়ী খানি ও প্রকাশের সেই ফুলের গুচ্ছ শুখাইয়া বেলা সযত্নে বাক্সের কোণায় রাখিয়া দিয়াছিল।

আজ নাড়িতে নাড়িতে সহসা সেইগুলিতে হাত পড়িল। এবং সর্পদষ্টের মত হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বেলা মাটীতে বসিয়া পড়িল!

৭

সম্মানের সহিত পাস করিলেও, এত শীঘ্র দেশে ফিরিবার ইচ্ছা যোগেনের ছিল না, কণ্টি-নেণ্ট ঘুরিয়া ডাক্তারী শাস্ত্র সকল মন্থন করিয়া, সে যখন মনের তৃষ্ণা মিটাইয়া সুধা পান করিতেছিল, তখনই সহসা একদিন পত্নীর কঠিন পীড়ার সংবাদে আর সব ভুলিয়া ছুটিয়া সে দেশে আসিল। কিন্তু যখন আসিল, রোগক্লিষ্ট চক্ষুদুটিতে পত্নী তখন আর স্বামীকে চিনিতেও পারিল না।

মাতা বহুদিন গত হইয়াছিলেন, সংসারে আপনার জন কেহ আর ছিল না, সুরমা তাই সকল কাজ ফেলিয়া রোগশয্যায় আসিয়া সখীর সকল ভার গ্রহণ করিয়াছিল,—আর আসিয়াছিল, সে!—সুখের দিনে নিমন্ত্রণের অপেক্ষাও যে কোন দিন করে নাই, দুঃখের দিনে দুঃখের বোঝাটী মাথা খানি বাড়াইয়া সকলের আগেই যে বহন করিতে সর্বদা আসিয়াছে, বেলার সেই একান্ত প্রকাশ ঠাকুর-পো।

যোগেন কহিল—কি করে এমন হ'ল প্রকাশ! স্বাস্থ্য ত কোনোদিন এমন খারাপ ছিল না, এ যে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে ভাই।

ভাঙ্গিয়া পড়ার মর্ম্মন্তুদ ইতিহাসটা সেই কেবল দীর্ঘ বরষ-মাস ধরিয়া নীরবে, পৃথিবীর অজ্ঞাতে পাঠ করিয়াছিল, আজ ইচ্ছা করিয়াই খানিক আঘাত দিয়া প্রকাশ কহিল—তুমি ত শুধু বাইরের স্বাস্থ্যটাই শুধু দেখতে যোগেন দা, কিন্তু তার চেয়েও যে একটা স্বাস্থ্য মানুষের দেহে আছে, সেই মনের স্বাস্থ্যটার খোঁজ কোন্‌কালে নিয়েছ কি?

মহা আশ্চর্য্য হইয়া যোগেন কহিল,—মানে?

চক্ষু দু'টি বড় বড় করিয়া প্রকাশ কহিল,—দাদা, রাগ কোর না, কথাটা খুব বিশ্রিই শোনাবে হয় ত'—সংসারে আর কেউ না জান্‌লেও কথাটা আমিই শুধু বুঝেছিলুম, তুমি তাকে শুধু স্নেহই করেছিলে চিরকাল, সে তোমার আশ্রিতা ছিল বলে' কিন্তু ভালোবেসেছিলে সত্যি বলত' দাদা, কাকে? বউকে না তোমার বইকে!

চোখের সমুখ হইতে ধীরে ধীরে—অতি ধীরে পুরু পর্দ্দাখানি যোগেনের সরিয়া গেল, সে

আবরণ তলে চোখে তার পড়িল, একটী তরুণী নারীর আকণ্ঠ পিয়াস-কাতর ব্যাকুল একখানি প্রাণ! চোখের চারিধারে তার সুধায় ভরা কতই পেয়ালা, কিন্তু হায়, তার সে তিয়াস ত এ জীবনে আর মিটিল না!

* * * * *

গভীর রাতে একাকী যোগেন পত্নীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিল, দ্বারের ও পাশে একখানি শয্যা পাতিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত প্রকাশ হাত দু'খানি কপালের উপর রাখিয়া একান্তে, শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের শূন্যতার পানে চাহিয়াছিল,—সহসা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া ঘরে ঢুকিল, দেখিল, মাথা-খানি এ পাশে ও পাশে বার দুই তিন নাড়িয়া নাড়িয়া, সম্মুখে উপবিষ্ট স্বামীরই পানে চাহিয়া অস্পষ্ট জড়ানো স্বরে বেলা কহিতেছে,—প্রকাশ, একটি কাজ করবে ভাই?

প্রকাশ তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—এ কথা কেন জিজ্ঞেস্ করছ বৌদি! এ প্রাণটা দিয়েও যদি পারতাম, তোমার কথা রাখতাম! একি তুমি জাননা বৌদি?

"জানি! বৈকি ভাই, জানি!" আস্তে আস্তে অশক্ত শীর্ণ হাতখানি প্রকাশের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া, বেলা কহিল—অন্ততঃ আজকের দিনটা, এই একটা দিন, তুমি নিজে আমার মতন ক'রে নিজের হাতে ওঁর টেবিলটা, বইগুলো গুছিয়ে দিয়ে এস ভাই। যাবার সময়ও জেনে যাই শেষ দিনেও তাঁর পড়ার ক্ষতি হয় নি! তাঁর কোন অসুবিধা হয় নি!

প্রকাশের কণ্ঠে অশ্রু উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিতে গেল—বৌদি—

কোন কথা নয় ভাই!—গুছিয়ে রেখে দিয়ে এস ওঁর কষ্ট না হয়। নারী জীবনের সূচনায় যা করেছি, জীবনের পরিণতিতেও যা করেছি, আজ শেষ মুহূর্ত্তে তোমার হাত দিয়ে তাই করিয়েই যাই ভাই! নিজে পারলুম না বটে, কিন্তু তুমি করলেও সে ত আমারই করা ভাই! —বেলা চক্ষু মুদিয়া স্তব্ধ হইল।

প্রকাশ নিঃশব্দে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া যাইতেই, যোগেন সরিয়া আসিয়া স্ত্রীর পার্শ্বে বসিল। বেলা বলিল—কোথা ছিলে? অনেক ক্ষণ তোমায় দেখিনি! পড়ছিলে? প্রকাশ ঠাকুরপো বিরক্ত করলে বুঝি?

যোগেনের বক্ষে আজ সাগরের তরঙ্গই উচ্ছ্বসিত হইতেছিল, সে বলিল—আমি ত এখানেই রয়েছি বেলা!

পড়নি?

যোগেন বেলার শীর্ণ হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে আস্তে চাপিয়া ধরিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল—বেলা, তবে আমিই তোমায় শেষ করলুম!

বেলা কথা কহিল না—কহিতে পারিল না; যে দৃষ্টি পৃথিবীর কোন দৃশ্যই আর দেখিতে

পাইতেছে না, সেই দৃষ্টিটা মেলিয়াই যোগেনকে দেখিতে,লাগিল। বিশ্বের কোলাহলও যে কর্ণে স্থান পাইতেছে না, সেই কর্ণ দুইটিই আকুল আগ্রহে প্রসারিত করিয়া যেন আরও কথা শুনিবার আশায় উৎকর্ণ হইয়া রহিল। চৈত্রের আকাশতলে চাতকের মত, বৈশাখের খররৌদ্রে বহু বিভক্ত ধরিত্রীর মত, বুকখানি বুকের বাহিরে আসিয়া যোগেনের সামনে প্রকাশ হইয়া

যোগেন—কোন দিন যাহা দেখে নাই ; কোন কালে যাহা দেখিতে চাহেও নাই, জানিতও না, আজ তাহাই দেখিয়া, ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—বেলা, বেলা, তুমি সেরে ওঠ বেলা! আমাকে নূতন ক'রে জীবন আরম্ভ করতে দাও বেলা! আমার সব সাধ, ইচ্ছা তুমি চিরদিন পূর্ণ করেছ, কখনও আমাকেও জানতে দাও নি কিছু, আজ, আজ আমার এই ইচ্ছাও অপূর্ণ রেখো না। এস, আবার আমরা নতুন জীবন আরম্ভ করি!

আতপ-তপ্ত ফুলের মতই, বেলার চক্ষু দু'টি মুদিয়া আসিল। সারাজীবনের যাহা আকাঙ্ক্ষার বস্তু, নারীজন্মের যাহা একান্ত সাধনার ধন, আজ মরণ নদীর তীরে দাঁড়াইয়া বেলার ভাগ্যে তাহাই মিলিল। কিন্তু নারীর প্রাণ, এতখানি তপ্ত স্নেহ সহিতে পারিল না—কোরক মুদ্রিত হইল।

যোগেন মরমভাঙ্গা কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—বেলা, আমার ভুল কি তুমি……

অভাগা ক্ষমা চাহিতেই গিয়াছিল কিন্তু কথা তার শেষ করিতে পারিল না। এক অস্ফুট শব্দ করিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল। যোগেন ভয়ত্রস্ত হইয়া চীৎকার করিতেই যাইতেছিল, দেখিল, সামনেই প্রকাশ! চোখে একটা হিংস্র জ্বালা, সম্বদ্ধ ওষ্ঠাধরে একটা তীব্র ঘৃণা লইয়া তাহারই পানে চাহিয়া, নিশ্চল মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া, প্রকাশ!

আর নারী! চিরদিনের তৃষার্ত্ত, অতৃপ্ত নারীর প্রাণ সে মুহূর্ত্তে কোন্ অসীমে ছুটিয়া গিয়াছে কে জানে, পলকহীন দুই চক্ষু—একটিতে তার অনন্ত ভালবাসা অন্যটিতে অসীম অতৃপ্তি—মরণের পরেও তাহাতে ফুটিয়া রহিয়াছে।

অলক্ষ্মী

শ্রীগিরিবালা দেবী

১

ধনী গৃহের উপযুক্ত কোন সম্পদই আমার ছিল না। 'রূপ', অমন ত পথে ঘাটে অনেকই দেখা যায়। 'গুণ', তা পাড়াগাঁয়ে যতটুকু হওয়া সম্ভব তার বেশী কিছু নয়। পিতার ঐশ্বর্য্য, কয়েক খানি মৃণ্ময় কুটীর, আর অর্দ্ধভগ্ন চতুষ্পাঠী। 'সৌভাগ্য',—আমাকে জন্ম দান করিয়া মা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। মাতৃহীনা শিশুকে যে পিসিমা মাতৃস্নেহে প্রতিপালন করিতে-ছিলেন, শিশুর সৌভাগ্যের জোরে বেশী দিন তাঁহাকেও পৃথিবীর আলো বাতাস উপভোগ করিতে হয় নাই।

মা, পিসিমার পর বৃদ্ধা ক্ষীরি ঝি অল্প সময়ের জন্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু যে অনলে কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া গেল,—সে অনলে শুষ্ক তৃণ কতক্ষণ?

ক্ষীরির পালা সাঙ্গ হইলে স্বজন ও প্রতিবেসিনী মহলে আমার 'অলক্ষ্মী' নাম বিখ্যাত হইয়া পড়িল। অপয়ার সংস্পর্শে, অকল্যাণের আশঙ্কায় পাড়ার বালক-বালিকাদিগকেও আমার সহিত খেলিতে দেওয়া হইত না। যে মেঘে বিদ্যুৎ দেখা গিয়াছে, তাহারই অভ্যন্তরে বজ্রের জ্বালাও লুকাইয়া থাকে ত!

মাতৃহারা অলক্ষ্মী মেয়েটি বিশ্বের দ্বারে স্নেহ মমতার পরিবর্ত্তে ঘৃণা, অবজ্ঞা কুড়াইয়া পাইলেও একজন শুধু তাহাকে ঘৃণা করিতে পারিলেন না 'অলক্ষ্মী নামের প্রতিশব্দ স্বরূপ বাবা আমার 'বনলক্ষ্মী' নামকরণ করিয়া আদরে বুকে তুলিয়া লইলেন।

ভাগ্যের বিচিত্র বিবর্ত্তনে সেই সুবিখ্যাত অলক্ষ্মী মেয়েটাকে ধনীর ভবনের জ্যোতিষী আসিয়া একদিন সর্ব্বসুলক্ষণা নামে অভিহিত করিলেন।—আশ্চর্য্য!

গ্রামের মেয়েদের বিস্ময়ের সীমা চরমে গিয়া পৌঁছিল, তাহারা সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে স্বীকার করিয়া লইল—এক 'বনলক্ষ্মী' নামের জোরেই আমি সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম হইলাম। আমার দৃষ্টান্তে অনেক ছোট মেয়ের সহিত বড়দেরও নাম

ভাস্কর প্রমথনাথ গঠিত মূর্ত্তি হইতে

পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। চিরকালের 'বীণা' 'বনলক্ষ্মীতে' রূপান্তরিত হইল, 'সুরবালা 'সুরলক্ষ্মীতে' গিয়া দাঁড়াইল; রাজেশ্বরী 'রাজলক্ষ্মী'তে পরিণতি লাভ করিল, সাবিত্রীনামের মেয়েটি রাতারাতি সতীলক্ষ্মীর আসনে বসিল; পূর্ণশশী হঠাৎ পূর্ণলক্ষ্মী হইলেন।

গ্রামে লক্ষ্মীর ছড়াছড়ি পড়িয়া গেলেও যে প্রকৃত বনলক্ষ্মী তাহাকেই শুধু স্রোতে ভাসমান ক্ষুদ্র বনফুলটির মত পল্লী জননীর শান্ত শীতল কোল হইতে সহরের শুভ্র মর্ম্মর প্রাসাদে ভাসিয়া আসিতে হইল।

বিদায় কালে বাবা আশীর্ব্বাদ করিলেন "মা ধর্ম্ম যেন তোমার শিরোভূষণ হয়, সত্য যেন তোমার কণ্ঠহার হয়।"

বাবার আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া শ্বশুর বাড়ী আসিলাম। শাশুড়ী ছিলেন না। আত্মীয় বন্ধুরও নিতান্ত অভাব, শ্বশুর হাসি অশ্রুতে উচ্ছ্বসিত হইয়া স্নেহে মমতায় বিগলিত হৃদয়ে 'মালক্ষ্মী' বলিয়া ঘরে তুলিয়া লইলেন।

কথাটা বড়ই নির্লজ্জের মত শুনাইবে, কিন্তু না বলিয়াও পারিতেছি না! যে স্থানে গৃহলক্ষ্মী বা 'হৃদয়লক্ষ্মী' শুনিবার আশা করিয়াছিলাম, তিনি কিন্তু 'লক্ষ্মী' নামের ধারও ধারিলেন না। আদর করিয়া আমায় শকুন্তলা আখ্যায় অভিহিত করিলেন।

আমাদের 'বনগ্রাম' খানি তপোবন না হইলেও বিজন বন বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। বাবার সরল সুন্দর স্নেহ হাস্যময় মুখ-ছবি নিরীক্ষণ করিয়া গ্রামবাসীরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, আমাদের নদীতীরবর্ত্তী কুটীরটি ঋষির পবিত্র আশ্রমের মতই শান্ত গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হইয়া রহিত।

২

স্বামী এম-এ ক্লাশের ছাত্র সদ্যপক্ক ফলের ন্যায় কাব্য রসে পরিপূর্ণ—তাই শকুন্তলা নাম তাঁহাকে কল্পনার কাব্যলোকে লইয়া গিয়াছিল, স্বামী ইংরাজী সাহিত্যে পণ্ডিত হইলেও সংস্কৃত সাহিত্যে আমিও নিতান্ত মূর্খ ছিলাম না। কালিদাসের শকুন্তলার সহিত আমারও পরিচয় ছিল।

অনেকদিন হইতেই আমাদের "রতনপুর" পরগণা লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের সহিত আমার শ্বশুর মহাশয়ের মামলা মোকর্দ্দমা চলিতেছিল। আমার বিবাহের পরে সেই বিরাট মামলা অভাবনীয় রূপে জিতিয়া আমার শ্বশুর অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন।

গৃহে আনন্দ উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। যে বধুর কল্যাণে বিজয়লক্ষ্মী রায় বংশের সমুন্নত অভ্রভেদী চূড়ায় জয় পতাকা উড়াইয়া দিল শ্বশুর মহাশয় বহুমূল্য হীরক বলয় দ্বারা সেই বধুর হস্ত দুইটি বাঁধাইয়া দিলেন।

আমার শ্বশুরের অনুগত ও প্রতিপাল্য জ্যোতিরত্ন কাকাবাবুকে এক জোড়া শাল দিয়া প্রণাম করিলাম, তাঁহার গণনার ফলেই দরিদ্রের দীন কুটীর হাতে ধনীর প্রাসাদে আমার স্থান হইয়াছিল। স্বামী জ্যোতিরত্ন মহাশয়কে কাকাবাবু বলিয়া ডাকিতেন। আমিও তাহাই বলিতাম, আমাকে হীরার বালা পরাইয়া কাকাবাবুকে শাল উপহার দিয়াই শ্বশুর ঠাকুর তৃপ্ত হইলেন না। আমার প্রতি তাঁহার সীমাশূন্য স্নেহ মমতা জন্মিয়াছিল। আমাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলে, আমার নিমিত্ত অসাধ্য সাধন করিতে পারিলে তবেই যেন তিনি প্রসন্ন হইতেন। যাহার আগমনে রতনপুর অধিকারে আসিয়াছিল, তাহার অবস্থিতিতে সমস্ত ভারতবর্ষ স্বাধিকারে আসিলেও বাবা আশ্চর্য্য হইতেন না।

রতনপুরের মামলা মিটিলে পুনরায় আমার কর কোষ্ঠী গণনার ধুম পড়িয়া গেল কাকাবাবু সাবধানে আমার হস্ত রেখা পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন "মা'র ধর্ম্মস্থান অতি উজ্জ্বল, সচরাচর এমন দেখা যায় না, ধনস্থানও চমৎকার। পুত্র স্থান উত্তম শ্বশুর প্রীত হইলেন। আমি লজ্জায় কাকাবাবুর হাতের মধ্য হইতে হাত খানা টানিয়া লইলাম।

গণনার পরেই স্বামীর ডাক পড়িল; ছেলেকে কাছে বসাইয়া বাবা হাসিমুখে কহিলেন "বেবেশ আমার মালক্ষ্মীর ভাগ্যেই রতনপুরটা আমাদের খাস এসেছে; আমার ইচ্ছা হচ্ছে ও-পরগণাটা আমার মা'র নামেই লিখে দিই—ওটা আমার স্নেহের নিদর্শন হয়ে থাকবে কি বলিস্? এতে কি তোর আপত্তি আছে?"

স্বামী সহাস্যে প্রত্যুত্তর করিলেন "আপনি যেমন ভাবে যাকে যা দিয়ে সন্তুষ্ট হন, তাতে আমার আবার আপত্তি কি থাকতে পারে বাবা?"

কাকাবাবু সায় দিলেন "না, আপত্তি হবে কেন? সব যার এটাও তারই রইল। শুধু নামের অদল বদল বৈ তো নয়, গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার মত।"

এ সকল ব্যবস্থার মধ্যে আমি কথা বলিতে পারিলাম না। কিন্তু মন আমার এক অজানা আশঙ্কার ভারে ভারাক্রান্ত হইল। এসব কি? ইহার তো কোনই প্রয়োজন ছিল না।

"কৃষ্ণকান্তের উইলে"র পুনরাভিনয় না করিলে বাবার স্নেহের নিদর্শন কি রহিত না!

স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি কহিলাম "রতনপুর টুর আমার নামে লেখা পড়ায় কাজ নেই, ও সব আমি চাই না, তুমি বাবাকে বারণ কর। তুমি বারণ না করলে আমি নিজেই তাঁকে বারণ করবো।"

তিনি আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন "কেন লক্ষ্মী, এতে তোমার আপত্তি কি? তোমার নামও যা, আমার নামও তাই, আমরা তো পৃথক নই। তোমার পয়ে যে পরগণা আমাদের হাতে এসেছে তার বুকে আমার লক্ষ্মীরাণীর বনলক্ষ্মী নামটি যে ভূষণ হয়ে শোভা

পাবে এই তাঁর ইচ্ছা। যাঁর জিনিস তিনি যদি দিয়ে খুসী হন—সেখানে তুমি আমি বারণ করবার কে ?"

আমি দুই হাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া কহিলাম, ওগো, আমার ভয় করে। ধন ঐশ্বর্য্যে অনেকের বুদ্ধির বিকার ঘটে। মেয়েদের স্বামীই সে সকল সম্পত্তির বড় সম্পত্তি। স্বামী ছাড়া তাদের স্বতন্ত্র সম্পত্তি থাকতে নেই। নকল জিনিস রাখলে আসলটিও লোকসান হয়।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "ওগো আমার বনের হরিণী, সব তাতেই তোমার ভয়। নকলের লোভ দেখিয়ে তোমার আসল কেউ কেড়ে নিতে আসবে না গো, ভয় নেই। নকল যা তা' চিরকাল নকল হয়ে বাইরেই পড়ে থাকবে, আসল থাকবে তোমার এই আঁচলে বাঁধা।"

বলিলাম "ভ্রমরেরও আঁচলে বাঁধাই ছিল, নকলের ভারে আসল একদিন আঁচল ছিঁড়ে হারিয়ে গেল। সংসারে রোহিণীর, অভাব নেই, ভয় না ক'রে কি করি বল ?"

স্বামী অভিমান করিয়া আমার নিকট হইতে সরিয়া গেলেন। তাঁহার চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন "সংসারে রোহিণীর অভাব না থাকুক, কিন্তু আমার ভালবাসার কি মূল্য নাই লক্ষ্মী! এত ভালবাসা পেয়ে তবু তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পার না! ছিঃ ছিঃ তোমাদের এমনি সন্দিগ্ধ অন্তঃকরণ। রোহিণী ত রোহিণী, শত রোহিণীর সাধ্য হবে না, আমার লক্ষ্মীর কমল আসন স্পর্শ করে। আমি ভগবানের নাম নিয়ে বলচি—আমার ধর্ম্মপত্নী ছাড়া যেদিন অন্য স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে যাব—সেদিন যেন আমার মরণ হয়।"

আমি তাঁহার মুখখানি বুকে টানিয়া লইয়া মনে মনে কহিলাম "তোমাকে অবিশ্বাস করি নাই প্রিয়তম, তোমার প্রতি আমার সন্দেহ নাই। আমার হৃদয়ের শতদলের উপর চির-নির্ম্মল, চিরশুভ্র রূপে তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া আমি যেন মরিতে পারি। ভগবান না করুন কিন্তু তবুও যদি আমার ভাগ্যাকাশে দুঃখের মেঘ ঘনীভূত হয় সেদিন আমি যেন তোমায় রক্ষা করিতে পারি। শত প্রলোভন, পাপ, অধর্ম্ম হইতে তোমায় রক্ষা করিতে পারি।

৩

দানপত্রে বনলক্ষ্মীর নামে রতনপুর দান করিয়া আমার শ্বশুরের ভাগ্যে বধূর প্রজাপালন আর প্রত্যক্ষ হইল না। অকস্মাৎ একদিন আমাদের আনন্দ ভবনে মৃত্যুর আহ্বান আসিল। পিতাকে ছাড়িয়া যে পিতার স্নেহের পরিবেষ্টনের মধ্যে আপনার নিরাপদ নীড়খানি রচনা করিয়া-

ছিলাম, নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে আমার চিরনির্ভর স্থল সেই সাধের নীড়ও ভাঙ্গিয়া গেল। যে স্নেহ তরুর ছায়ায় আমরা উভয়ে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতাম, সহসা ভীষণ ঝড়ে সে তরু ভূপতিত হইল।

শোকে দুঃখে স্বামী অভিভূত হইয়া পড়িলেন, নিদারুণ আঘাতে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুর্ণ বিচুর্ণ হইল। কিন্তু আমি অভিভূত হইতে পারিলাম না। তিনি যে সংসারে একাকী, আমি দিশাহারা হইলে কে তাঁহাকে দেখিবে? কে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে? এ বিশাল বিশ্বে আমি ছাড়া আর তাঁহার কে আছে?

কিন্তু ভুল, মহা ভুল! ধীরে ধীরে কালের স্নিগ্ধ প্রলেপে তাঁহার শোকের তীব্র জ্বালা জুড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলাম, আমি ছাড়া তাঁহার অনেক অবলম্বন আছে। কিন্তু আমার! তিনি ভিন্ন আর যে আমার কিছুই নাই।

প্রভুত্ব ও অর্থ এ দুইটা জিনিস ভাল নহে। উহাতে মনের কোমলতা দেখিতে দেখিতে কঠিন হইয়া যায়। পিতার বিয়োগের কিছু দিন পর হইতে আমি স্বামীর পরিবর্ত্তন বেশ বুঝিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে ন্যায়, অন্যায়, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার যে একটা বেদনা বোধ ছিল, সেটা যেন ক্রমে ক্রমে অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল। কপট বন্ধু ও স্তাবকের দলেরও অভাব হইল না।

যে সহজ, সরল, সুন্দর পথে আমরা যাত্রা করিয়াছিলাম হঠাৎ সে পথের ভেদ দেখা হইল। কিন্তু স্বামী যেমন আমার পথ হইতে সরিয়া গেলেন অমনি কি আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি? হায় নারী যে অনন্তের যাত্রী। কিন্তু কোথায় তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিব, এ বহির্জগত হইতে লোক চক্ষুর অন্তরালে আমার হৃদয় দুর্গে কিরূপে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিব! ভাবিলাম সহরের কোলাহল হইতে, কঠোরতা হইতে, পল্লীর শান্তশীতল কোলে আবার শান্তির জীবন যাত্রা আরম্ভ করিব।

মনের সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার আশায় একদিন স্বামীকে কহিলাম "কলকাতা ভাল লাগছে না। সহরের গোলমাল থেকে চল আমরা দূরে, রতনপুরে গিয়ে কিছু দিন থেকে আসি। বাবা বলতেন রতনপুর জায়গাটা নাকি ভারী সুন্দর।"

স্বামী কোনই আপত্তি করিলেন না, বরং নূতন স্থানে বাস করিবার আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। কিন্তু গোল হইল রতনপুরের বাগান বাড়ীটা লইয়া। সংস্কার অভাবে বাড়ীটা অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছিল।

স্বামী লোকজন লইয়া পূর্ণ উদ্যমে গৃহ সংস্কার করিতে গেলেন। কিন্তু তাঁহার এত আগ্রহেও বাড়ীটা সারা শেষ হইতে যেন চাহে না। এই গৃহসংস্কার উপলক্ষে তাঁহাকে ঘন ঘন রতনপুরে ছুটিতে হয়। অবশেষে বিরক্ত হইয়া আমি বলিলাম "নূতন জায়গা দেখার সাধ ঘরে বসেই

যদি মিটে যায় তা হলে সেখানে যাওয়া বিড়ম্বনা। এখান থেকে আরো বেশী লোক পাঠিয়ে দাও, শিগ্‌গির কাজ শেষ করে ফেলুক।"

তিনি হাসি মুখে বলিলেন "শিগ্‌গিরই শেষ করতে চাচ্ছি, তোমার তাড়া দিতে হবে না। রতনপুরে তো যে সে যাবে না, স্বয়ং মহারাণী যে বাস করতে যাবেন, রাজভবন না হলে তাঁকে মানাবে কেন?"

বলিলাম "মহারাণীর রাজভবনের জন্যে মহারাজ বার বার ছুটে যান কেন? লোক জন দিয়ে দেখালে শোনালেই ত হয়।"

"নিজে না দেখলে শুনলে কি চলে? দেখোনি, প্রত্যেক কাজটি বাবা নিজে দেখতেন। মহারাজ কাকে বলছ? আমি অন্য প্রদেশের মহারাজ হ'লেও রতনপুরের মহারাণীর নফর মাত্র।"

আমি রাগের ভাণ করিয়া তাঁহার কথার জবাব দিলাম না।

৪

মাঘ মাসের প্রথমেই আমরা রতনপুর গেলাম। বাল্যকালের সেই স্নিগ্ধ সজীবতার মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিলাম। আমার রূপ-রসময়ী শ্যামলা পল্লী-জননী প্রবাসী তনয়ার দিকে দুইখানি ব্যগ্রবাহু যেন মেলিয়া দিলেন। শিশিরসিক্ত আম্রকাননের কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সোনা ঢালা সরিষা ক্ষেতের অনির্ব্বচনীয় শোভা, ক্লান্ত পাখীর করুণ গান, রাখালের বাঁশীর মোহন রব আমাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিল।

ভূস্বামিনীর শুভাগমনের সংবাদ পাইয়া অনেক অন্তঃপুরচারিণী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। একদিন আসিল, আমাদের কাছারীর সরকার বেচারাম চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী, ও কন্যা। কয়েক বছর পূর্ব্বে আমার শ্বশুর মাসিক বারো টাকা মাহিনায় বেচারামকে নিযুক্ত করিয়া কাছারী বাড়ীর পশ্চাতে বাসস্থান দিয়াছিলেন।

বেচারামের মেয়েটিকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, মেয়েটি সুন্দরী, ভাদ্রের ভরা নদীর মতই যৌবনের উচ্ছ্বাসে কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

মেয়েটিকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার নাম কি?"

মেয়েটি আমাকে প্রণাম করিয়া নাম বলিল "ছায়া"।

বেচারামের স্ত্রীকে বলিলাম "আপনার মেয়েটি বড় সুন্দর, নামটিও বেশ। কিন্তু মেয়ে তো বড় হ'য়েছে বিয়ের কি কোরছেন?"

বেচারাম-পত্নী সরোদনে উত্তর করিল "গরীবের মেয়ের আবার বিয়ে মা, বারো টাকায়

৭

পেটে খেতেই কুলোয় না, কি দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেব। বিনা পয়সায় গরীব লোকের মেয়ে কে নেবে? আজকালকার বাজারে রূপ গুণের তো আদর নেই, আদর কেবল টাকার।"

মেয়েটি আনত মুখে বসিয়া রহিল।

আমি কহিলাম "আপনার মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করুন, টাকার জন্যে আটকাবে না।"

ব্রাহ্মণ কন্যার চোখে জল আসিল, তিনি আনন্দে গদগদ কণ্ঠে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সন্ধ্যার সময় স্বামী কাছারী হইতে ফিরিলে তাঁহার নিকটে বেচারাম চক্রবর্ত্তীর মেয়ের বিবাহের কথা পাড়িলাম। সে প্রসঙ্গে তিনি যেন কেমন অন্যমনা হইলেন। তাঁহার মুখখানি শুখাইয়া গেল। মুহূর্ত্তকাল চিন্তার পর স্বামী ম্লানমুখে কহিলেন "বিয়ের টাকা, তা তোমার যদি ইচ্ছা হয়, দিও। ওদের সঙ্গে—ওরা বুঝি আজ তোমার কাছে এসেছিল?"

আমি সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া তাঁহার সহিত অন্য আলোচনা আরম্ভ করিলাম। কিন্তু মন আমার বিষাদে আচ্ছন্ন। মনে হইল, স্বামী আমা হইতে যেন স্বতন্ত্র ও সুদূর হইয়া গিয়াছেন। আমাদের দুই স্বচ্ছ হৃদয়ের মাঝখানে কিসের যেন একটা গোপনতার আভাস্ পড়িয়া গিয়াছে। সে গোপনতার অন্তরালে দাঁড়াইয়া আমি ডাকিয়া ডাকিয়া তাঁহার সাড়া পাইতেছি না।

সেদিন ফাল্গুনের অলস মধ্যাহ্নে নির্জ্জন কক্ষে শয্যায় পড়িয়া বাহিরে প্রকৃতির দ্বারে বসন্তের অভিনব সজ্জা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। আনন্দে উল্লাসে ধরণী রোমাঞ্চিত, পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। সে পুলকের প্লাবন গগণে, পবনে পত্রপুষ্পে বিচ্ছুরিত হইতেছে।

দূর প্রান্তরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বসন্তের স্নিগ্ধ বায়ু স্পর্শে আমার চক্ষু দুইটি নিদ্রার আবেশে জড়াইয়া গেল।

কতক্ষণ যে ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিলাম, তাঁহার ঘরে কাহারা যেন মৃদুস্বরে বাক্যালাপ করিতেছে। এসময় তাঁহার নিকটে কে আসিবে? কাহারো তো আসার কথা নহে। দাস, দাসী, সরকার ছাড়া এখানে আর কেহই নাই। আমি এখানে আসিবার সময় কাকাবাবুকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি এসময় ওঘরে যে আসিবেন না, তাহা আমার বিলক্ষণরূপে জানা ছিল।

ভারী কৌতূহল হইল; পা টীপিয়া টিপিয়া আমি দ্বার প্রান্তে গিয়া আশ্রয় লইলাম। পর্দ্দার ফাঁক দিয়া এ কি দেখিলাম? হায়, ভগবান, আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল না কেন? এ দৃশ্য দেখিবার পূর্ব্বে আমি মরিলাম না কেন?

স্বামী সোফায় বসিয়া আছেন। তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া ছায়া। ছায়ার একখানি বাহু তাঁহারই কোলের উপর বিন্যস্ত।

স্বামী গম্ভীর স্বরে কহিতেছেন, "বিয়েতে অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রে তুমি আমার মাথায় কলঙ্ক পসরা দিওনা ছায়া। আমার সঙ্গে তোমার যা কিছু সম্পর্ক, ছেলে খেলা মনে করে তা তুমি

ভুলে যাও। তোমার বিয়ের জন্যে যত টাকা দরকার সব আমি দেব, তুমি আর আমার কাছে এস না। এই আমাদের শেষ দেখা!

ছায়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "আপনি বুঝতে পারছেন না, আপনি আমার কি সর্ব্বনাশ করেছেন। আপনি যখন তখন আমাদের বাড়ী গিয়ে আমার রূপের প্রশংসা করে, ভালবাসা দেখিয়ে আজ আমার এমন দশা করেছেন। এখন জলে ডুবে মরা আমার পক্ষে যত সোজা অন্য কাউকে বিয়ে করা তত সোজা নয়। আমার কলঙ্কিত দেহ, কলঙ্কিত মন, আর কাউকে আমি দিতে পারবো না।"

ইহার অধিক শুনিতে পারিলাম না। আমার বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া গেল, দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া সেই খানে লুটাইয়া ডাকিলাম 'ভগবান, আমার হৃদয়ে বল দাও। তোমার আঘাত মাথায় লইবার শক্তি দাও। আমার ধর্ম্মকে, আমার সত্যকে নষ্ট হইতে দিও না।" আমার অন্তর্যামীকে আমার দুঃখ নিবেদন করিলাম বটে কিন্তু অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বক্ষের মধ্যে যে অশ্রু ভরিয়া আসিতেছে, তাহা ফেলিবার অবসর কৈ!

স্বামীকে রক্ষা করিতে হইবে। অধর্ম্ম হইতে আমি তাঁহাকে রক্ষা না করিলে রাখিতে যে পারিব না, হারাইয়া ফেলিব।

দূরাগত বংশীধ্বনির মত বিস্মৃতির অতল সাগর হইতে তাঁহারি কণ্ঠস্বরে স্মৃতি আসিয়া আমার কাণে কাণে কহিল "ভগবানের নাম নিয়ে বলছি, আমার ধর্ম্মপত্নী ছাড়া যেদিন অন্য স্ত্রীলোকের সংসর্গে যাব সেদিন যেন আমার মরণ হয়।" হা রে পুরুষ! আর হা রে তার প্রতিজ্ঞা!

৮

অপরাহ্ণে কাকাবাবুকে ডাকিয়া কহিলাম "বিয়ের মন্তর তন্তর গুলো তো আপনার ঠিক আছে কাকাবাবু, ঠিক না থাকলে ঠিক করে রাখবেন। আজ সন্ধ্যায় আপনাকে বিবাহের পুরোহিত হতে হবে।"

কাকাবাবু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কার বিয়ে মা! তোমার পোষা কুকুরের সঙ্গে বিড়ালের বিয়ে, না—গোলাপ গাছের সঙ্গে টগর ফুলের বিয়ে? হ্যাঁ, মা, তোমার মুখ চোখ অমন হ'য়ে গেছে কেন, অসুখ করেছে বুঝি?"

হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রনা হৃদয়ে চাপিয়া সংক্ষেপে উত্তর দিলাম "না, অসুখ নয়, কাকাবাবু। সত্যিই আপনাকে বিয়ে দিতে হবে, কুকুর বেড়ালের নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিয়ে।"

স্বামী অন্দরে আসিলে তাঁহাকেও বলিলাম "সন্ধ্যাবেলা তুমি ভেতরে থেকো, কোথাও যেয়ো না। আমার প্রয়োজন আছে।"

প্রশ্ন হইল "কিসের প্রয়োজন !"

বলিলাম "আজ আমার বিবাহের তিথি, তোমার মঙ্গলের জন্যে একটা অনুষ্ঠান কোরব।"

তিনি নিরুত্তরে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে সুনীল অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া লজ্জাবতী নববধূটির মতন ধরিত্রীর বুকের উপর সন্ধ্যা আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশের বুকে একটির পর একটি করিয়া তারকার হাসি ফুটিয়া উঠিল। কাননে কান্তারে ফুলকুল হৃদয়ের সুরভি ভাণ্ডার খুলিয়া মন্দ সমীরণকে অভিনন্দিত করিল।

স্বামী হাসিমুখে আসিয়া বলিলেন "কি অনুষ্ঠান করবে লক্ষ্মী, সময় তার এখনো হয় নি !"

হায় পুরুষ, এখনো হাসি, এখনো ছলনা, এখনো এই প্রিয় সম্বোধন !

আমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমার শয়ন কক্ষে লইয়া গেলাম। সেখানে বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত ছিল, কাকাবাবুও আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঝিকে পাঠাইয়া আমি ছায়াকেও ডাকিয়া আনাইয়াছিলাম।

ছায়ার হাত ধরিয়া আমি গৃহে প্রবেশ করিতেই স্বামী বজ্রাহতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। নিমেষের মধ্যে তাঁহার গৌরবর্ণ মুখকান্তি বিবর্ণ হইয়া গেল।

কাকাবাবু বিস্মিত হইয়া আমার মুখের পানে চাহিলেন।

আমি স্থিরকণ্ঠে কহিলাম "কাকাবাবু আর দেরী কোরবেন না। বিবাহের পাত্র পাত্রী, সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, এইবার আপনি আপনার কাজ করুন।"

কাকাবাবুর বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটে নাই, তিনি তেমনি বিস্ফারিত নয়নে আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা এ সব কি ? আমি তো এর অর্থ বুঝতে পারছি না।"

কহিলাম "আপনি না একদিন বলেছিলেন, আমার ধর্ম্ম স্থান অতি উজ্জ্বল, সেই উজ্জ্বলতায় মলিনতা স্পর্শে করবার ভয়ে পাপ হতে, অধর্ম্ম হ'তে আমার স্বামীকে আমি রক্ষা করচি কাকাবাবু—এ তারই অনুষ্ঠান।"

এতক্ষণে স্বামী অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। আমার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন "তুমি যা মনে করেচ তা হবে না। আমার ভুল হতে পারে, ভ্রান্তি হতে পারে, কিন্তু কিছুতেই এ বিয়ে হতে পারে না। আমাকে জিজ্ঞাসা না করে এসব আয়োজন করতে কি করে তুমি সাহসী হলে ? কে তোমায় এ অধিকার দিলে ?"

আমার শিরায় শিরায় তীব্র রক্তস্রোত ছুটিতে লাগিল, হৃদয়ের মধ্যে প্রলয়ের বিষাণ ধ্বনিত হইতে লাগিল। আমি স্থান, কাল, পাত্র বিস্মৃত হইয়া রুদ্ধদ্বারে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া,

অতি তরুণ সাহিত্য সাধক — শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলাম "বিয়ে তোমায় করতেই হবে। আমি রতনপুরের রাণী, তুমি রতনপুরের অতিথি, আমার প্রজার, কুল-কন্যার মান সম্ভ্রম রক্ষার ভার আমার শ্বশুর আমায় দিয়ে গেছেন। আমি সেই অধিকারে তোমার অপরাধের শাস্তি বিধান করচি। তুমি ইচ্ছায় সম্মত না হলে আমাকে জোর করতে হবে। এখানে তুমি অভ্যাগত, আমি মালিক।"

স্বামীর মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল, শরীর বেতস পত্রের মত কাঁপতে লাগিল। তিনি স্বপ্নচালিতের ন্যায় বিবাহের আসনের উপর বসিয়া পড়িলেন।

আমি কাকাবাবুকে কি বলিলাম, কি করিলাম কিছুই আমার স্মরণ নাই, আমার চক্ষুর সম্মুখে কি হইল তাহাও আমি জানি না। জানিব কি করিয়া অগ্নি কি নিজের দহনের জ্বালা নিজে বুঝিতে পারে! বজ্র কি নিজের গর্জ্জন নিজে শুনিতে পায়।

জানি না, কতক্ষণ পর কাকাবাবুর আহ্বানে আমার লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কাকাবাবু বলিলেন "মা শান্ত হও, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।"

অতি কষ্টে রুদ্ধ কণ্ঠস্বরটা পরিষ্কার করিয়া বলিলাম "আপনি অনেকদিন আগে কাশীবাস করতে চেয়েছিলেন আমিই আপনাকে যেতে দিই নাই। এইবার আপনাকে মুক্তি দিলাম কাকাবাবু। চলুন এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। বনগ্রামে আমাকে বাবার কাছে রেখে আপনি কাশী চলে যাবেন।"

কাকাবাবু আমাকে কি যেন বলিতে গিয়ে বলিতে পারিলেন না। নিঃশব্দে চক্ষু মুছিলেন।

একটি ঝি, একটি চাকর লইয়া কাকাবাবুর সহিত সেই রাত্রেই আমি রতনপুর পরিত্যাগ করিলাম।

যাত্রাকালে অপরাধীর বেশে স্বামী আসিয়া বলিলেন "আমি যা করেচি, জানি তার ক্ষমা নাই। তবু বলচি তুমি দেবী, চেষ্টা করে আমায় ক্ষমা কর। এমন ভাবে আমায় ত্যাগ করে যেয়ো না।"

বলিলাম "ক্ষমা কিসের? আমাকে যেতেই হবে। রতনপুরের রাণী তার ক্ষুদ্র এক ভৃত্য কন্যার সাথে একাসনে থাকতে পারবে না। সে দেবী নয়,—মানবী।"

৬

সেই বনগ্রাম, শৈশবের লীলাভূমি, কৈশোরের মধু বৃন্দাবন অনাগত যৌবনের নিধুবন, সেই ছায়া স্নিগ্ধ শত স্মৃতি বিজড়িত আমাদের পবিত্র আশ্রম। বাবার স্নেহমমতার উচ্ছল ধারা। কিন্তু শান্তি কোথায়! শান্তির কুঞ্জে যে আপনার হস্তে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া আসিয়াছি। তাই বুঝি শান্তি নাই।

এক বছরের বেশী হইতে গেল তাঁহাকে ফেলিয়া আসিয়াছি। ইহার ভিতর তাঁহার সংবাদ পাই নাই। সংবাদ পাইতে ইচ্ছাও করি নাই। কিন্তু দিনে দিনে আমার নিষ্ঠার তেজ যে ম্লান হইয়া আসিতেছে! নিজেকে আর কত বঞ্চনা করিব! হায়, অপরাধী দয়িত আমার, এত সহজে কি করিয়া তুমি আমাকে মুক্তি দিয়াছিলে, আমার সেই সীমাশূন্য অভিমান, অস্বাভাবিক দর্প এসবের অন্তরালে নারী হৃদয়খানিকে একবারও খুঁজিয়া দেখিলে না! আমি যেমন 'যাই' বলিলাম, অমনি তুমি যাইতে দিলে, ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা কি তোমার ছিল না! দুইটি বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে বাঁধিয়া একটিবার 'শকুন্তলা' বলিয়া ডাকিলে না কেন প্রিয় আমার!

দ্বিপ্রহরে নির্জ্জনে বসিয়া বিষাদের অশ্রুসাগরে ভাসিতেছিলাম। বাবা ডাকিলেন "মা"।

ত্রস্তে চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু তাঁহাকে কি লুকাইতে পারিলাম?

বাবা স্নেহভরে আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন "অনেক দিন দেবেশের কোনই খবর নেওয়া হয় নাই। এটা আমাদের পক্ষে ভারী অন্যায় হয়েছে মা। এত দিন বলি নাই, কিন্তু না বলেও আর থাকতে পারচি না, অমন ভাবে দেবেশের ওপর জুলুম ক'রে, তোমার এখানে চলে আসা ভাল হয় নি। সংসারে প্রত্যেক মানুষেরই ভুল ত্রুটী আছে। তাড়াতাড়ি না করে ধীরে সুস্থে তা সংশোধন করতে হয়। সমস্ত পৃথিবীর অধিশ্বরী হ'লেও স্বামীর কাছে স্ত্রী, স্ত্রীই থাকে। পথের ভিক্ষুক স্বামী হলেও সে স্বামীই থাকে। এ যে বিধাতার বন্ধন, এখানে মানুষের হাত নেই। সত্য যেমন ধর্ম্ম, ক্ষমাও সেই ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত। সত্য পালন ক'রে ক্ষমা যদি না করা যায় তা হলে যে সত্যের মূল্য থাকে না মা। দেবেশ বোধহয় এখন কলকাতাতেই আছে, তাকে একবার আসতে লিখলে হয়।"

আমি ভয়ে বাবার দিকে চাহিতে পারিলাম না। তাঁহার এত কথার একটাও প্রত্যুত্তর দিতে পারিলাম না। আমি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিব, আমার অশান্ত হৃদয় সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গ উঠিয়াছে, কি উপায়ে হৃদয় শান্ত করিব! হায় ধর্ম্ম, হায় সত্য, মূঢ় নারী তোমার মহিমা কেমন করিয়া বুঝিবে? তাহার জ্ঞান কত টুকু! বুদ্ধি কত টুকু!

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নদীতীরবর্ত্তী বকুল বৃক্ষের ঘনছায়াতলে লুকাইয়া পরপারের বনরাজীর পানে চাহিয়াছিলাম। অল্পক্ষণ হইল সূর্য্যদেব বিদায় লইয়াছেন তাঁহার বিদায় চিহ্ন বক্ষে আঁকিয়া আকাশের খানিকটা এখনো রাঙ্গা হইয়া রহিয়াছে। কুলায় আগত পাখীর কল কাকলী ঝঙ্কারে সমস্ত বনস্থলী মুখরিত। ব্যাত্যাক্ষুব্ধ নদীর মৃদু শব্দগুলি কাহার সকরুণ কণ্ঠস্বরের ন্যায় আমার কর্ণমূলে বারম্বার আঘাত করিতে লাগিল। পুষ্পদল আজ কাহার অঙ্গ সৌরভ আনিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিল।

আজ কাল আমি নির্জ্জনের প্রয়াসী হইয়াছি। নিভৃতে চিন্তা করিতেই আমার অধিকাংশ

সময় কাটিয়া যায়। কিন্তু আমার চিন্তাই তো চূড়ান্ত নহে, আমার নিমিত্ত বাবার উৎকণ্ঠাও দেখিতে হইবে। বিলম্বে বাবা খুঁজিতে আসিবেন ভাবিয়া উঠিতে চাহিলাম কিন্তু পারিলাম কৈ ?

এ কে ? এতকাল পর এ কাহার মূর্ত্তি আমার সম্মুখে ? একি সত্য ! হায়, প্রিয়তম, আসিয়াছ ? এত দিনের পর নারী হৃদয়ের সন্ধান লইতে আসিয়াছ !

আমি উঠিতে যাইয়া পারিলাম না ; কথা কহিতে পারিলাম না। আমার তৃষিত দৃষ্টিটা জীবন দেবতার মুখের পানে মেলিয়া দিয়া আমি পাষাণ প্রতিমার মত বসিয়া রহিলাম।

স্বামী গায়ের চাদরখানা অপসারিত করিয়া আমার কোলের উপর একটি চারি মাসের শুভ্র সুন্দর কুন্দকোরক তুল্য নিদ্রিত শিশু সমর্পণ করিয়া মধুর কণ্ঠে কহিলেন "লক্ষ্মী, এই তোমার ছেলে নাও। আমার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে চার মাস হল ছায়া চলে গেছে, যাবার সময় খোকাকে তোমায় দিয়ে গেছে, আমায় দিয়ে যায় নি।"

ছায়া নাই, চলিয়া গেছে, কিন্তু আমি যে ভ্রমেও এমন কামনা করি নাই। আমি ছায়ার শিশুটিকে বুকের মধ্যে নিবিড় করিয়া চাপিয়া ধরিলাম। আমার অবাধ্য চোখের জল ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

স্বামী বলিলেন "কেঁদোনা লক্ষ্মী, জীবনের ওপর কখনও কখনও যে ছায়া পড়ে চিরদিন তা থাকে না। এতদিনে আমি নিশ্চয় করে বুঝেছি তোমাকে ছাড়া জগতে আমার কোনই সুখ নাই। এতদিন সাহস করে কাছে আসতে পারি নাই। একদিন যাঁর কাছ থেকে তোমায় পেয়েছিলাম আজ তাঁর ডাকেই তোমায় ফিরে পেতে এসেছি। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে আমার রতনপুরের রাণী, আমার অন্ধকার ঘরে ফিরে চল।"

আমি তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিলাম, এখন রতনপুরের রাজা হয়েছে। রাণী বলে আর কেউ নেই। যে আছে সে তোমারি দাসী, তুমি প্রসন্ন হয়ে আজ তার সব অপরাধ মাপ কর।"

"রতনপুরের রাণী দাসী নয়, রাজমাতা, আমার মহারাণী শকুন্তলা," বলিয়া স্বামী সাদরে আমার ললাট চুম্বন করিলেন।

অলক্ষণা

শ্রীপ্রভা দেবী সরস্বতী

১

নগদ এক পয়সাও না লইয়া কেবল মাত্র গহনা পত্রাদিতে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া বিনোদলাল কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমেন্দ্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।

হেমেন্দ্র তখন বি, এ, পড়িতেছিল। প্রথমে তাহার বিবাহ করিবার মত ছিল না, তাহার একমাত্র ইচ্ছা ছিল সে বিলাতে যাইবে। বিনোদলাল তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন তাহার বিলাত যাওয়ার ব্যয় তিনি শ্বশুরের উপর চাপাইয়া দিবেন, অতএব সে বিবাহটা শেষ করিয়া বিলাতে যাক।

হেমেন নগদ টাকা চাহে নাই, কাজেই দাদার মতে আপত্তি করে নাই।

শুভদৃষ্টির সময়ে বধূর পানে তাকাইয়া হেমেন আড়ষ্ট হইয়া গেল। তাহার দাদা তাহাকে বলিয়াছিলেন বধূ নিভা অনিন্দ্যসুন্দরী, কিন্তু এ যে শ্যামবর্ণা। রাগ করিয়া হেমেন বধূর পানে আর তাকায় নাই, তাকাইলে হয়তো দেখিতে পাইত তাহার দাদা যাহা বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। নিভা শ্যামবর্ণা হইলেও তাহার মুখ, দৈহিক গঠন বড় সুন্দর, একমাত্র গৌরবর্ণের অভাবই তাহাকে হেয় করিয়া ফেলিয়াছে।

বর বধূ বরণ করিয়া গৃহে তুলিয়া হেমাঙ্গিনী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউ কেমন হল ঠাকুরপো?"

হেমেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করছো বউদি?"

হেমাঙ্গিনী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন ঠাকুরপো?"

হেমেন রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমি তোমাদের কি ক্ষতি করেছিলুম বউদি যার জন্যে তোমরা আমার এমন সর্ব্বনাশ করলে, আমার ভবিষ্যতের সুখের আশা সমূলে নষ্ট করে দিলে? ওই কালো ভূতটাকে নিয়ে আমি ঘর করতে কখনো পারব না, সে কথা আমি আগেই বলে দিচ্ছি।"

গর্জ্জন করিয়া সে চলিয়া গেল।

স্ত্রীর মুখে সব কথা শুনিয়া বিনোদলাল চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আড় হইয়া পড়িয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতে টানিতে চিন্তিত মুখে বলিলেন, "তাই তো, এখন কি উপায় করি বল দেখি?"

হেমাঙ্গিনী রাগ করিয়া বলিলেন, দোষ তো তোমারই, তুমি তো তোমার ভাইকে চেন, চিনেও কেন এ কাজ করতে গেলে বল দেখি?"

বিনোদলাল গড়গড়ার নলটা পার্শ্বে ফেলিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, চিনেও কেন এ কাজ করতে গেলুম জানো হেম? ও ছোট বেলা হতে বড় একরোখা, যা ধরবে তা করে বসবেই ঝোঁক ধরেছে বিলেতে যাবে,—যাতে না যেতে পারে সেই জন্যেই তাড়াতাড়ি করে বিয়ে দিলুম।"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "বিয়ে তো দিলে, চোখ দুটো মেয়ে দেখবার বেলায় কোথায় ছিল? সত্যিই তো—ওই কালো মেয়ে—আমাদের বাড়ীর কারোরা সঙ্গে ওর গায়ের রং মেলে না। চোখে দেখে শুনে ওই কালো মেয়ে আনলে কি করে?"

. অস্থির হইয়া বিনোদলাল বলিলেন, "কালো মেয়ে, বউ মা কালো? ও কথা বলো না হেম, আমি নিজের চোখে দেখেছি, আরও অনেকেই দেখেছে, সবাই বলেছে এমন সুশ্রী মেয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। তোমরা কোন চোখ দিয়ে দেখেছ বল দেখি—আশ্চর্য্য তোমাদের চোখ।"

হেমাঙ্গিনী একটু হাসিয়া বলিলেন, "হুঁ, কার চোখ যে ভাল তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কালো মেয়েটাকে এনে ওর ঘাড়ে তো চাপালে এখন ও বউকে নিলে হয়।"

"নেবে না,—তুমি বল কি হেম,—এ কি কখনও হতে পারে? অমন বউ নেবে না?"

বিনোদলাল যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

হেমাঙ্গিনী নরম সুরে বলিলেন, "জানি নে কি করবে কিন্তু এখন সে তো এই কথাই বলে গেল।"

গড়গড়ার নলটা আবার হাতে তুলিয়া লইয়া আশ্বস্ত ভাবে বিনোদলাল বলিলেন, "ওঃ, তা বলুক গিয়ে। দু'দিন বাদে ওর মনের ভাব আপনিই বদলে যাবে ঠিক দেখে নিয়ো। আমি যা বউ এনেছি দু' দিন বাদে গুণ বুঝতে পারবে। বউ মার বাপ আজই না হয় গরীব হয়ে পড়েছেন, কিন্তু বনেদী বংশ বটে, ও বংশের মেয়ে হীরের টুকরো হবে। সেই তো একটী সুন্দরী মেয়ের কথা তুমি বলেছিলে না, খোঁজ নিয়ে জানলুম তাদের বংশ অতি নীচ, সে বংশের মেয়ে আনলে দু'দিনে আমাদের লক্ষীছাড়া হতে হতো। অনেক বেছে মা লক্ষীকে পেয়েছি। দেখো হেম, মায়ের যেন আমার অমর্য্যাদা হয় না, মনে রেখো বউ মা এ সংসারের লক্ষী এসে-

ছেন। ওঁর কতগুলো লক্ষণ আমি দেখেছি, সে গুলো বড় সাধারণ নয়, তাতেই আমি বুঝেছি তিনি লক্ষ্মী। সর্ব্ব সুলক্ষণা মাকে যেন অযত্ন কোর না হেম, বার বার বলে দিচ্ছি।"

নূতন বউয়ের দিকে স্বামীর এতটা পক্ষপাত হেমাঙ্গিনীর তত ভাল লাগে নাই, মুখে তিনি কিছু বলিলেন না। শুধু বলিলেন, "ভাল, তোমার সুলক্ষণার কাজ দেখা যাক।

২

বিনোদলালের পিতা কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, এই বিপুল সম্পত্তি তাঁহার স্বোপার্জ্জিত। নিজে তিনি হাইকোর্টের উকিল ছিলেন, অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল, যে মোকর্দ্দমায় হাত দিতেন তাহাতেই জয়লাভ করিতেন।

হেমেন্দ্রলাল তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহার চেয়ে সতের বৎসরের ছোট।

বিনোদলালের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী ধনীর কন্যা হইলেও সরল স্বভাবা, অহঙ্কার তাঁহার ছিল না। যখন তিনি বধূরূপে গৃহে আসিয়াছিলেন তখন শাশুড়ী বর্ত্তমান ছিলেন, হেমেন তখন চার বৎসরের বালক মাত্র।

পাঁচ বৎসরের হেমেনকে পুত্রবধূর হাতে দিয়া শাশুড়ী ইহলোক ত্যাগ করেন, সে আজ ষোল বৎসরের কথা। হেমাঙ্গিনী পুত্রসম দেবরকে সন্তানের মতন নিজের কোলে টানিয়া লইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি তাহার সকল আবদার যত্নের সহিত মিটাইয়া আসিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি স্বামীর নিকটেও গোপন করিয়া যাইতেন।

আজ তিনি চারটী সন্তানের জননী, কিন্তু সকল সন্তানের চেয়ে মাতৃহীন হেমেনকে তিনি বেশী স্নেহ করেন। হেমেন ও তাঁহার নিকট কোন কথা কোন দিন গোপন করে নাই। দাদাকে সে ভয় করিত, দাদার নিকট অনেক কথা গোপন করিত, বউদির নিকটে সে সঙ্কোচ করিবার হেতু কিছুই ছিল না।

সম্প্রতি বিলাতে যাইবার জন্য সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, এবং দাদার নিকট এ প্রস্তাব তুলিবার ভার বউদির উপর দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া গা ঢাকা দিয়াছিল। সে বিলাত যাইতে চায় শুনিয়া বিনোদলাল অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিলাতে গেলে যে জাতি ধর্ম্ম লোপ পায়, এ জন্য নহে, বিদেশে যদি কিছু হয় কে দেখিবে সেই ভয়ে। যাহাতে তাহার বিলাত যাওয়া না হয় সে উপায় তিনি হেমাঙ্গিনীকে ঠিক করিবার ভার দিয়াছিলেন।

বিবাহ দিলে আর সে বিলাতে যাইতে পারিবে না এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বিনোদলাল তাহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

নিভার পিতা বনিয়াদী বংশের ছেলে, দেখিয়া শুনিয়া বিনোদলাল নিভার সহিত ভাইয়ের বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিয়া ফেলিলেন।

বাস্তবিক নিভা যে শ্যামবর্ণা ইহা তাঁহার চোখে পড়ে নাই। তিনি তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি দেখিয়াছিলেন, দেহের গঠন দেখিয়াছিলেন, কয়েকটী লক্ষণ দেখিয়াছিলেন। হেমাঙ্গিনী হেমেনকে নিজের চোখে পাত্রী দেখিয়া আসিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু হেমেন লজ্জায় পড়িয়া যায় নাই; বিশেষ বিনোদলাল জোর করিয়া বলিয়াছিলেন মেয়েটী পরম সুন্দরী, এ অবস্থায় নিজে দেখিতে যাওয়া অর্থে জ্যেষ্ঠকে অপমান করা।

সংসারে যে অশান্তি মেঘ উঠিয়াছে, নিভাও আঁচে তাহা কতকটা বুঝিয়াছিল, তাহাকে লইয়াই যে এত কাণ্ড তাহা কিন্তু সে তখনও স্পষ্ট বুঝিতে পারে নাই।

ফুলশয্যার রাত্রে হেমাঙ্গিনী কিছুতেই হেমেনকে ভিতরে আনিতে পারিলেন না; বাহির হইতে সে খবর পাঠাইল কোন কাজে আজ সে বাড়ী আসিতে পারিবে না, বন্ধুর বাড়ী যাইতেছে।

মুখ ভার করিয়া হেমাঙ্গিনী বিনোদলালের নিকটে গিয়া পড়িলেন, "নাও, এখন তোমার যা খুসি তুমি তাই কর, আমি আর কিছু পারব না বলেদিচ্ছি।"

বিনোদলাল সংসারের ভিতরকার কোন সংবাদই রাখেন না, মোকর্দ্দমার কাগজ পত্র দেখিতে ছিলেন। সে গুলো পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া বিস্মিত চোখে স্ত্রীর পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, আজ আবার কি হল?"

বিনোদলালের নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, তিনি বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, কোন খোঁজ তো রাখ না সংসারের কোথায় কি হচ্ছে। আজ ফুলশয্যা, সব যোগাড় করেছি, ঠাকুরপো যে বাড়ী ছেড়ে পালালো।"

বিনোদলাল খানিক হাঁ করিয়া স্ত্রীর পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, "তা আমি" কি করব?"

"করবে আমার মাথা আর মুণ্ডু। কি বিয়েই যে দিলেন, আজ কয়দিনের মধ্যে ঠাকুরপো বাড়ীর মধ্যে এল না, বাইরে কি খাচ্ছে না খাচ্ছে তার ঠিক নেই, সে সব কিছু তো খোঁজ রাখো না। দিব্যি নিজে খাচ্ছো ঘুমুচ্ছো ফুরিয়ে গেল লেঠা,—আর কি।"

বলিতে বলিতে তিনি একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

বিস্মিত বিনোদলাল খানিক হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তাহার পর যখন হেমেনের খোঁজে বাহিরে আসিলেন তাহার অনেক আগেই সে বাহির হইয়া গিয়াছে।

ফুলশয্যার আয়োজন অসমাপ্ত রহিল। আজ নিভা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহাকে লইয়াই ইহাদের শান্তির সংসারে দারুণ অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। সে কালো এই তাহার অপরাধ।

এ কি লাঞ্ছনা তাহার। সে কালো—ভাসুর তাহাকে তো দেখিয়া শুনিয়াই আনিয়াছেন, সে গরীবের কন্যা তাহা তো সকলেই জানে, সে তো প্রতারণা করিয়া ইহাদের সংসারে আসে নাই।

কতক্ষণ সে গুম হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর উঠিয়া হেমাঙ্গিনীর সন্ধানে গেল।

অত্যন্ত রাগ করিয়াই হেমাঙ্গিনী কোলের আট মাসের দুরন্ত ছেলেটীকে চড় মারিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ছেলেটী দাসীর নিকটেই থাকে, যখন হেমাঙ্গিনীর রাগ হয় তখনই সে মাতৃক্রোড়ে আসিতে পায়।

মায়ের কোলে আসিয়া শিশুর চোখে ঘুম ছিল না। প্রবল দোলায় ও কাণের উপর প্রবল চড়ের জন্য সে চোখ বুজিয়া মাথা কাত করিয়া পড়িয়াছিল, এক একবার ইহারই ফাঁকে মাথাটা একটু ফিরাইয়া মায়ের মুখখানা দেখিয়া লইতেছিল, আবার তখনই ঘুমের ভাণ করিতেছিল।

নিভাকে দেখিয়া হেমাঙ্গিনী শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, "ছোট বউ যে, বসো।"

নিভা বসিল,—হাত বাড়াইতেই খোকা ঘুমের ভাণ ছাড়িয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এই কয়দিনের মধ্যেই সে নিভার অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। পিত্রালয়ে ঠিক এত বড় ছোট ভাইটীকে রাখিয়া আসিয়া নিভার হৃদয়খানা গোপনে গুমরিয়া কাঁদিতেছিল, খোকাকে লইয়া সে অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল।

খোকাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে নিভা বলিল, "আমায় কবে সেখানে পাঠাবে দিদি?"

সেখানে অর্থাৎ পিত্রালয়ে।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "আমি কি করে বলব ভাই তোমার ভাসুর জানেন কবে তোমায় পাঠান হবে। তিনিই তোমায় এনেছেন, তোমার সম্বন্ধে যা কিছু—"

নিভা তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, কাঁদিয়া বলিল, "আমার বড় মন কেমন করছে দিদি, আপনি একবার তাঁকে বলুন, তিনি আমায় পাঠিয়ে দেবেন।"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "আমি এখনি তাঁকে বলছি।"

কিন্তু পাঠানোর কথা তাঁহাকে বলিতে হইল না, বউমা কাঁদিয়াছে শুনিয়া বিনোদলাল অস্থির হইয়া পড়িলেন, বলিলেন, "তবে এখনি বউমাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক। আজই হরিনাথকে বলি সে রেখে আসবে এখন।"

অপ্রসন্ন মুখে হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "আজই কেমন করে হবে? দিন ক্ষণ দেখিতে হবে তো —ঘরের বউ—"

বিনোদলাল হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বউমার জন্য দিনক্ষণ দেখতে হবে না গো, বউমা নিজেই সর্ব্ব সুলক্ষণা। দিন ক্ষণ দেখেই বা কি লাভ হয়, না দেখলেই বা কি হয়।"

অন্ধকারপূর্ণ মুখে হেমাঙ্গিনী সরিয়া গেলেন। সেই দিনই নিভা পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।"

৩

মাস তিনেক কাটিয়া গিয়াছে।

নূতন বউকে আনার প্রস্তাব কেহই করে না। সংসার আবার পূর্ব্বের মতই চলিতেছে, মাঝখানে একজন কে এ সংসারের বাহির হইতে আসিয়াছিল, বাধা পাইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে তাহার নাম আজ কেহই করে না।

বি, এ, একজামিনের ফল বাহির হইল, হেমেন সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে, বাড়ীতে আনন্দ স্রোত বহিল, হেমেনের বন্ধুরা একদিন ভোজের দাবী করিল, হেমেনের বউদি সানন্দে রাজি হইলেন।

ইহারই মধ্যে বিনোদলালের মনে গভীর ব্যথা বাজিতেছিল। হায় রে, এ আনন্দ যে সমস্ত হৃদয় দিয়া অনুভব করিবে সে আজ কোথায়? যাহাকে তিনি পছন্দ করিয়া লক্ষ্মীরূপে গৃহে আনিলেন, তাহাকে ইহারা এমন করিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিল?

বিষণ্ণ নেত্রে তিনি আনন্দোৎসব দেখিতেছিলেন। একবার মুখ ফুটিয়া বলিলেন, "বউমাকে আনলে ভাল হতো না হেম?"

হেমাঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "অর্থাৎ তোমার ইচ্ছে ঠাকুরপোকে বাড়ী হতে তাড়ালে কেমন তো? জানছো ছোট বউ এলেই ও বাড়ী ছাড়বে তবু তাকে আনার ইচ্ছা অর্থ ঠাকরপোকে তাড়ান,—"

গভীর মর্ম্মব্যথা পাইয়া বিনোদলাল নীরব হইয়া গেলেন।

হায় রে, সেই মেয়েটীর সর্ব্বনাশ তিনিই তো করিলেন, তাহার জীবনটা একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। জগতে তাহার পাত্রের অভাব তো হইত না, সেও সুখী হইতে পারিত।

আত্মগ্লানিতে বিনোদলালের সমস্ত অন্তরখানা ভরিয়া উঠিয়াছিল। বাড়ীতে স্ত্রী, ভাই কাহারও তিনি মন পান নাই, সেই মেয়েটীর সর্ব্বনাশ তিনিই করিয়াছেন, সেও কি তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে পারিবে?

গোপনে তবু তিনি স্নেহের বউমাকে একখানি পত্র দিলেন। তাহাতে জানাইলেন— তোমাকে শীঘ্রই এখানে নিয়ে আসব মা, তুমি না এলে আমার দিন চলছে না।

আসল কথাটা কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারিলেন না, জানাইতে পারিলেন না তিনি তাহাকে যে বেদনা দিয়াছেন সে বেদনা নিজের স্নেহ ভালবাসা দিয়া মুছিয়া দিতে চান। এই বিবাহে যে গরল উঠিয়াছে সে গরল তিনি নিজে পান করিতে চান, আর কাহাকেও সে গরল দিতে চান না। সিন্ধু মথিতে যে গরল উঠিয়াছে, সে গরল তিনি নিজেই গ্রহণ করিতেন।

নিভা ও তাঁহাকে পত্র দিল। সে বুঝিয়াছিল এ সংসারে প্রকৃত মানুষ তাহার এই ভাসুরটী।

তাঁহার চোখে মুখে এমন একটা শান্ত ভাব ফুটিয়া উঠিতে সে দেখিয়াছিল যাহাকে তাহার সেখানকার কোন অপমান লাঞ্ছনা পীড়ন করিতে পারে নাই। সে বুঝিয়াছিল তাহাকে আনার অপরাধে এই নিরীহ মানুষটাকে বড় কম লাঞ্ছিত হইতে হইতেছে না। উৎপীড়িতই উৎপীড়িতের বেদনা বুঝে, দুঃখী না হইলে দুঃখীর কষ্ট বুঝিতে পারে না!

ভাসুর ও নূতন বধূর পত্র আদান প্রদানের কথাটা হেমাঙ্গিনীর নিকটে গোপন রহিল না, তাঁহার মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মত থম থম করিতে লাগিল।

সে দিন তিনি কি কথায় অকস্মাৎ রুষ্ট ভাবে বলিলেন, "আমাদের জন্যে তোমার তো মাথা ব্যথা বিশেষ নেই, তোমার বউমার জন্যেই যখন তোমার প্রাণ অত পোড়ে তখন তাকে নিয়ে এসো, আমরা তফাতে যাই।"

ব্যথিত কণ্ঠে বিনোদলাল বলিলেন, "এ তোমার বড় অন্যায় কথা হেম। সে ছোট মেয়ে, তোমার মেয়ের মত, তার'পরে তোমার এত রাগ করা উচিত নয়। আমি তাকে নিয়ে এসেছি, ও তোমরা যখন তার দিকে কেউ চাইলে না, তখন তাকে আমাকেই দেখতে হবে ত তোমাদের মন পাষাণে গড়া, কিন্তু আমি তোমাদের মত পাষাণ হতে পারি নি। তোমরা তাকে কেউ স্নেহ করতে পারলে না,—আমি দেখি যে ক্ষত তার বুকে আমিই উৎপন্ন করেছি যদি তাতে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে পারি। বড় দুঃখ রইল হেম, আমার মাকে তোমরা কেউ চিনলে না, তাকে দূরে রেখেই চললে।"

একটু থামিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "তার এ অবস্থার জন্যে আমিই তো দায়ী আর কেউ দায়ী নয়। একটী জীবন একেবারে ব্যর্থ করে দিয়েছি, রাজেন্দ্রাণী করতে নিয়ে তাকে আমি ভিখারিনী সাজিয়েছি, ছেলে হয়ে যদি তাকে এতটুকু শান্তি দিতে পারি ত সে চেষ্টা ও কি অন্যায় হবে হেম? আমি তাকে নিয়ে আসব,—তোমরা কেউ তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখো না, সে আমার কাছে থাকবে, তবু চিরকাল তাকে আমি বাপের বাড়ী পড়ে থাকতে দেব না।"

অন্ধকার পূর্ণ মুখে হেমাঙ্গিনী উঠিয়া গেলেন, বিনোদলাল পত্নীর সে ভাবের পানে দৃষ্টিপাত করিলেন না,—রাগ করিয়া তিনি ও দুদিন পত্নীর সহিত কথা বলিলেন না।

ঠিক এই সময়ে নিভার পিতা ও মাতা উভয়েই কলেরায় মারা গেলেন, নিভার শিশু ভাইটী ও মারা গেল, পিত্রালয়ে তাহার আর কেহই রহিল না।

সংবাদ পাইয়া বিনোদলাল ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, হেমেনকে ডাকিয়া বলিলেন "একবার সেখানে যা হেমেন হাজার হোক বিয়ে যখন করেছিস তখন কর্ত্তব্য ও তো আছে সে কথা মনে রাখিস, তার জীবনের ভার তোর হাতে সে কথা ভুলে যাসনে আমাদের ঘরের বউ আজ অনাথিনী অবস্থায় পরের ঘরে থাকবে তাতে অপমান তো আমাদেরই ভাই, —।"

হেমেন বুঝিয়া দেখিল কথাটা সত্য, তবু একবার অস্ফুট স্বরে বলিতে গেল "আমার পড়া—"

রাগ করিয়া বিনোদলাল বলিলেন, "চুলোয় যাক পড়া। আমি যা বলছি আমার কথা তুই শুনবি কি না বল দেখি হেমেন।"

হেমেন আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না, বাধ্য হইয়া তাহাকে সেই দিনই শ্রীরামপুরে রওনা হইতে হইল এবং সন্ধ্যার সময় সে নিভাকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

অশ্রুমুখী নিভা বিনোদলালের পায়ের ধূলি লইল হেমাঙ্গিনীকে প্রণাম করিল শুষ্ক কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া হেমাঙ্গিনী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

কন্যাসম ভ্রাতৃবধূকে লক্ষ্য করিয়া বিনোদলাল শান্ত কণ্ঠে বলিলেন তোমায় একটা কথা বলে রাখি বউ মা তোমার যখন যা কষ্ট হবে, অভাব অনাটন হবে আমাকে জানিয়ো আর কাউকে জানানোর দরকার তোমার হবে না, আমায় যেন লজ্জা কোরোনা মা, তুমি আমার মেয়ের মত অসঙ্কোচে তোমার যা বলবার থাকে আমায় বলো।

নিভার দুই চোখ অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে মাথা নত করিয়া জানাইল যাহা কিছু অভাব হইবে কষ্ট হইবে সে বিনোদলালকে জানাইবে, তাঁহাকে সে লজ্জা করিবে না।

৪

হেমাঙ্গিনী মনে করিতেন নিভা আসিয়া তাঁহার স্বামীকে পর করিয়া দিয়াছে। বিনোদলাল যাহা কিছু কথাবার্ত্তা সব নিভাকেই বলিতেন এমন কি কোনদিন তিনি কি খাইবেন সে ব্যবস্থা ও নিভা করিয়া দিত, এমন করিয়া সংসারের সব ভার একে একে সে কবে যে গ্রহণ করিল তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

হেমাঙ্গিনী দেখিতে ছিলেন ছোটবউ তাঁহার স্বামী পুত্র কন্যা সকলকেই পর করিয়া দিল অভিমানে দুঃখে তাঁহার হৃদয় শতধা হইয়া যাইত ছোট বউকে তিনি কোন দিনই সুচোখে দেখিতে পারেন নাই, এই সব ব্যাপারে তাঁহার মন আর ও খারাপ হইয়া গেল।

বিনোদলাল সমস্ত ভার নিভার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন তবু তাঁহার বড় দুঃখ ছিল ভাইয়ের ও স্ত্রীর বিমুখ চিত্ত তিনি তাঁহার লক্ষ্মীরূপিণী বউমার প্রতি ফিরাইতে পারিলেন না।

নিভার পানে তাকাইয়া হাসিমুখে তিনি বলিতেন "সবই ঠিক হয়ে যাবে মা, মানুষের মন চিরদিন সমান থাকে না, একদিন না একদিন চির বিমুখের পানে ফিরে থাকে।"

কিন্তু সে জন্য নিভা কোনদিনই ব্যগ্র হয় নাই ভাসুর যখনই এরূপ কোন কথা বলিতেন সে ভারি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত তাহার মনে হইত হেমেনের দিক চাহিয়া ভাসুর এ কথা বলিতেছেন মুখ খানা লাল করিয়া সে সরিয়া যাইত।

হেমেন তাহাকে যতটা এড়াইয়া চলিতে চাহিত সে তাহাপেক্ষা অনেক দূরে সরিয়া থাকিত কোনদিন হেমেন তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পায় নাই। ইহাতে সে বেশ সুখীই ছিল।

অভিমানে নিভার হৃদয় সময় সময় বড় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। সে কালো কিন্তু তা'বলে সে কি মানুষ নয়? কালোর কি হৃদয় নাই, সে কি সুখ, দুঃখ, বেদনা অনুভব করে না?

একদিন হেমেনের বড় জ্বর হইয়াছিল, যন্ত্রনায় সে ছটফট করিতেছিল, দ্বারের নিকটে নিভাকে দেখিয়াই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়াছিল, পাশ ফিরিয়া নিস্তব্ধ হইয়া শুইয়াছিল, নিভা তাহা লক্ষ্যও করিয়াছিল অভিমানে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, দ্রুতপদে সে ফিরিয়া আসিতেছিল, সে দিনে সে চোখের জল চাপিতে পারে নাই।

সেই হেমেন, যে তাহার মুখদর্শন করিতেও ঘৃণা বোধ করে সে যখন একদিন রাত্রে নিঃশব্দে চোরের মত তাহারই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল তখন নিভা বড় কম বিস্মিত হয় নাই। আজ সে কি ভাবে অপমান করিতে আসিয়াছে কল্পনায় তাহাই মনে করিয়া সে বিবর্ণ মুখে হেমেনের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

শুষ্ক কণ্ঠে হেমেন বলিল "তোমার কাছে বড় দরকারে এসেছি বড় বিপদে পড়েছি এ বিপদ হতে আমায় পরিত্রাণ কর! তুমি স্ত্রী স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করবে মনে করি।

সে স্ত্রী, স্বামীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্য পালন করিবে কথাটা শুনিয়া নিভার হাসি পাইল, আজ সাতমাস বিবাহ হইয়াছে, তিনমাস সে এখানে আছে, ইহার মধ্যে কই স্ত্রীর কোন অধিকারই তো পায় নাই, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালনের এতটুকু অবকাশ তাহাকে দেওয়া হয় নাই।

সে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে স্বামীর পানে চাহিল। কোন ভূমিকা না করিয়াই হেমেন একনিঃশ্বাসে বলিয়া গেল আমি বিলেতে যাব এই সোমবারে জাহাজ ছাড়বে সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলে এখন শুধু টাকার জন্যে কিছু হচ্ছে না। আমায় এ যাত্রা তুমি বাঁচাও যাতে আমার বিলাত যাওয়া হয় তাই কর।

রুদ্ধকণ্ঠে নিভা বলিল "আমি কি করতে পারব?" হেমেন বলিল তুমি মন করলেই আমি টাকা পেতে পারি।"

নিভা বলিল "বড়ঠাকুরের কাছে চাইলেই তো তিনি দেবেন।"

হেমেন বলিল "সে তিনি দেবেন না টাকা চাইলে জানতে পারবেন আমি বিলেত যাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে আমার যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

"আসিতে পথে ফিরে, আঁধার তরু শিরে,
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।"

—রবীন্দ্র নাথ—

নিভা জিজ্ঞাসা করিল "তবে আমি কোথায় পাব? হেমেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "তোমার অনেক গহনা আছে কিছু আমায় দিলে আমার যাওয়ার খরচ হয়ে যায়।

নিভা স্থিরনেত্রে তাহার মুখের পানে খানিক তাকাইয়া রহিল, হেমেন মুখ ফিরাইলে নিভা ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "তারপর সেখানে কি করে চলবে?

হেমেন বলিল যেমন করেই হোক একটা উপায় করে নেব।

নিভা নতমুখে খানিক বসিয়া রহিল। একবার অন্তরটা তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল কেন সে গহনা দিবে ইহার সহিত তাহার সম্পর্ক কি? সে কেবল মাত্র বিবাহই করিয়াছে যাহার সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই সে আজ স্বামীত্বের দাবী করিতে আসিয়াছে কেবল কি নিজের স্বার্থের জন্য?

পরক্ষণে মনে হইল তাহার অলঙ্কারেই ব আবশ্যক কি? সে তো কোন গহনাই পরে না, সবই বাক্সে বন্ধ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। অনর্থক এ গুলা বন্ধ করিয়া রাখিয়াই বা কি লাভ?

সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল, বাক্স খুলিল, সমস্ত গহনাগুলি কুড়াইয়া নিজের হাতে কেবলমাত্র চুড়ি কয়গাছি রাখিয়া আর সব খুলিয়া একটী ছোট বাক্সে করিয়া স্বামীর সম্মুখে রাখিল।

বৈদ্যুতিক আলোতে জড়োয়া গহনাগুলি ঝিক্‌মিক করিয়া উঠিল। নিরাভরণা নিভার পানে তাকাইয়া বিস্মিত হেমেন বলিল, "এ কি, সব নিয়ে আমি কি করব?"

"ও সব তুমি নিয়ে যাও। সেখানে গিয়ে খরচের অভাবে কষ্ট পাবে, তার পরে যা হয় করে চালিয়ো। শুনেছি সেখানে বড্ড বেশী খরচ হয়, এতেও হয়তো তোমার কুলাবে না। আমার গহনার কোন দরকার নেই, আমি গহনা পরতে ভালবাসি নে—।"

নিভা তাড়াতাড়ি পার্শ্ববর্ত্তী বারাণ্ডায় চলিয়া গেল। উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে সে আপন মনে বলিল,—"কি দরকার আমার ও সবে, যার জীবনটাই ব্যর্থ তার দেহের উপর আর কতকগুলো বোঝা চাপিয়ে তাকে বিব্রত করে তোলা কেন?"

ফিরিয়া সে যখন গৃহমধ্যে আসিল তখন হেমেন গহনার বাক্স লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

দরজা ভেজাইয়া দিয়া আলো নিভাইয়া নিভা মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল,—কাঁদিয়া ডাকিল—"ভগবান—"

৫

সংবাদটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

হেমেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে খোঁজ লইতে গিয়া বিনোদলাল শুনিতে পাইলেন—গতকল্য যে জাহাজ বিলাত যাত্রা করিয়াছে, হেমেন তাহাতে বিলাত গিয়াছে।

দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল—হা রে অকৃতজ্ঞ! এতটুকু বেলা হইতে কোলে পিঠে করিয়া

মানুষ করিয়াছেন, এতটুকু কষ্ট হইলে তিনি কত না ব্যস্ত হইতেন না? সে একটীবার ভাবিল না, যে দাদা তাহাকে একদিন না দেখিলে পাগল হইয়া যাইতেন, তাহার এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী প্রবাসযাত্রা তাঁহাকে কতখানি বেদনা দিবে।

দুই দিন তিনি মোটে উঠিতে পারিলেন না, আহার করিলেন না, ঘুমাইতে পারিলেন না।

হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া ভাসাইলেন,—স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কি সুলক্ষণা মেয়েই যে এনেছ তা জানি নে।—হেমেন কি যেতে পারত—টাকা পেত কোথায়, তোমার সুলক্ষণা ভাই-বউ যে সমস্ত গহনা তার হাতে তুলে দিয়েছে। বাপের বাড়ীর পাঁচ হাজার টাকার গহনা, এখানকার পাঁচ সাত হাজার টাকার গহনা, এই দশ বারো হাজার টাকার গহনা সে পেয়েছে তাই তো যেতে পারলে, না হলে যেতে পারত? ওগো, ও বউটিকে তুমি বড় কম মনে করো না,—আমি তখনি বুঝেছিলুম ও আমার সোণার সংসারে আগুণ ধরাতে এসেছে। অমন অপয়া সর্ব্বনাশী যদি আর কেউ থাকে। এখন প্রাণে প্রাণে সব বেঁচে থাকলে বাঁচি।"

অপর গৃহে নিভার কাণে এ কথাগুলি পৌঁছিল, সে শিহরিয়া উঠিল। দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিল—তুমি দেখো ঠাকুর, কারও প্রাণের হানি যেন হয় না, আমায় এ অপবাদ হতে রক্ষা করো।—"

সেদিনে সে ভাসুরের সম্মুখে বাহির হইতে পারিতেছিল না, তাহার মনে হইতেছিল এ মুখ সে কেমন করিয়া তাঁহাকে দেখাইবে। যদি তিনিও বিশ্বাস করিয়া থাকেন সে অপয়া সর্ব্বনাশী, যে সূতায় কতকগুলি ফুল গাঁথা আছে, সেই সূতা ছিঁড়িয়া ফুলগুলিকে ছড়াইয়া ফেলিবার জন্যই আসিয়াছে।

বিনোদলাল তাহাকে অনেকবার ডাকিয়া পাঠাইলেন, সে যাইতে পারিল না, কাহাকেও মুখ দেখাইল না। হেমাঙ্গিনী যাহাকে দেখিতেছিলেন, কাঁদিয়া তাহারই নিকট পরিচয় দিতে-ছিলেন—ছোট বউ বড় কম মেয়ে নয়, মুখে কথা নাই কিন্তু অন্তর উহার বদমায়েসীতে ভরা। কবে চুপি চুপি নিজের গহনাগুলা হেমেনকে ধরিয়া দিয়াছে, নহিলে হেমেনের সাধ্য কি যে সে বিলাতে যায়। ইহার অর্থ আর কিছুই না, সে তাঁহার সাজানো সংসার চুরমার করিয়া দিতে আসিয়াছে, সকলকে তফাৎ করিতে আসিয়াছে।

নিভার নিজের গৃহে শুইয়া পড়িয়া নীরবে কেবল চোখের জল মুছিতে লাগিল।

"মা, বউ মা—"

দরজার কাছে বিনোদলালের স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া সে ধড়মড় করিয়া বসিল, গায়ে মাথায় ভাল করিয়া কাপড় টানিয়া দিল।

গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে বিনোদলাল বলিলেন,—"কতবার তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি, আমার কাছে যাও নি কেন মা? লোকে যে যাই বলুক, আমি তো কোন কথায় কাণ দেই নি

মা, আমি তো কোন কথা বিশ্বাস করি নি। কেন মা তুমি আমার কাছে আজ যাও নি, আমার খাওয়ার সময় কাছে থাকো নি?"

অস্ফুটকণ্ঠে নিভা কি বলিল বুঝা গেল না।

বিনোদলাল স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি নিজের গহনাগুলি সব তাকে দিয়েছ নইলে তার যাওয়া হতো না এ কথা ঠিক, কিন্তু কেন দিলে মা, তোমার জিনিস, ওতে তার তো কোন অধিকার ছিল না।"

রুদ্ধকণ্ঠে নিভা বলিল, "আমি গহনা নিয়ে কি করব, আমি তো পরিনে. ওগুলো বাক্সেই বন্ধ থাকত।"

বিনোদলাল বলিলেন, "তবু ভবিষ্যতের সম্বল—"

চাপা স্বরে নিভা বলিল, "আমি ভবিষ্যত্যের দিকে কোনদিন চাইনি। ভগবান শুকিয়ে রাখবেন না, মণ্টু নান্টু বড় হলে তাদের কাকিমাকে একমুঠো খেতে দেবে না কি?"

একটু হাসিয়া বিনোদলাল বলিলেন, "নিশ্চয়ই দেবে। আমি এর জন্যে তোমায় এতটুকু নিন্দে করি নে মা, তুমি যা করেছ তা তোমার কর্ত্তব্য বোধে করেছ, কিন্তু যাকে এমন করে সব ধরে দিলে, সে কি কোনদিন এ কৃতজ্ঞতা মানবে? সে হয়তো তোমার কাছে এসে চেয়েছে, নিশ্চয়ই বলেছে ফিরে এসে সে এ কথা স্বীকার করবে, কিন্তু তা হয় তো সে করবে না, অন্ততঃ আমার বিশ্বাস তাই। না করুক, তাতেই বা দুঃখ কি মা? জগতের সব মেয়েই সংসারে সুখী হতে পারে না।"

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া নিভা বলিল,—"আমি তা চাইও না। আশীর্ব্বাদ করুন—আপনাদের সেবা করে আপনাদের কাজ করে আমার জীবন যেন কেটে যায়। আমার জীবন যেন এই সেবার মধ্যে দিয়েই সার্থকতা পায়—"

তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, অকস্মাৎ চক্ষু ভাসাইয়া ঝর ঝর করিয়া খানিকটা জল ঝরিয়া পড়িল, সে জল বিনোদলাল দেখিতে পাইলেন, ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন,—"বউমা—"

এই তরুণীটির মনের মধ্যে কতখানি বেদনা যে লুকাইয়া রহিয়াছে তাহা বিনোদলাল বেশ বুঝিতেন, কিন্তু ইহার প্রতিবিধানের উপায় তিনি খুঁজিয়া না পাইয়া, অধীর ভাবে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

সেইদিন রাত্রে হেমাঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "ছোট বউমাকে কিছু বলো না হেম। মনে বুঝে দেখ সে যা করেছে তা কিছুমাত্র অন্যায় হয় নি; বরং হেমেন গহনা চাইলে সে যদি না দিত, বুঝতুম তার মন বড় সঙ্কীর্ণ, অনুদার। আমি তো তেমন বংশের মেয়ে আনি নি হেম—এ বংশের মেয়ে কখনও নিজের জিনিষ আগলাতে প্রাণপণ করবে না, জিনিসকে এরা অতি তুচ্ছ বলে মনে করে।"

হেমাঙ্গিনী কোন উত্তরও দিলেন না।

৬

দিনগুলা আসিতে লাগিল—আবার যাইতেও লাগিল। হেমেন বিলাত হইতে পত্র দিয়াছিল, দাদার কাছে ক্ষমাও চাহিয়াছিল। দাদা তাহার সকল দোষ ভুলিয়া গেলেন, আবার তাহাকে পত্র দিলেন।

সংসার আগের মতই চলিতে লাগিল। নিভা মুখ বুজিয়া আগেকার মতই তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাইতে লাগিল, হেমাঙ্গিনী পূর্ব্বের মতই তাহার সম্পর্ক এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন।

এই নির্জ্জনতার মাঝে সদাপ্রফুল্ল বিনোদলাল যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল হেমেন ফিরিয়া আসিলে তিনি যেন বাঁচিয়া যান। মনে হইতেছিল সে ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরিবারের এই বিষণ্ণতা দূর হইয়া যাইবে।

হঠাৎ একদিন দৃষ্টি পড়িল নিভার দিকে, সে যেন কেমন শুকাইয়া উঠিয়াছে। একদিন লক্ষ্য করিলেন সে বড় রোগা হইয়া গিয়াছে, আগে সে যতটা উৎসাহের সহিত কাজ করিতে ছুটাছুটি করিত, এখন সে আর তত ছুটাছুটি করিতে পারে না, অল্পেতেই যেন হাঁপাইয়া উঠে। তাহার কর্ম্মময় জীবনে যেন শ্রান্তি আসিয়াছে, সে আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের যেন কোলে লইতেও পারে না।

মাস চলিতে চলিতে বৎসর, বৎসর চলিতে চলিতে চার বৎসর কাটিয় গেল।

হেমেনের পত্র আসিল সে ফিরিয়া আসিতেছে।

সেই পত্র প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ পাওয়া গেল হেমেন সেখানে একটী ইউরোপীয়ান মহিলাকে বিবাহ করিয়াছে, সস্ত্রীক সে ফিরিয়া আসিতেছে।

শুষ্ক হাসিয়া পত্নীকে ডাকিয়া বিনোদলাল বলিলেন, "এবার ভারি খুসী হবে হেম, তোমার এবার গৌরাঙ্গিনী জা' আসছে। তবে আমি ভাবছি এ জা'য়ের সঙ্গে ঘর করতে পারবে কি না।"

হেমেন ফিরিয়া আসিতেছে শুনিয়া হেমাঙ্গিনী বাস্তবিকই বড় আনন্দিত হইয়া উঠিলেন, সকলকে ডাকিয়া শুনাইলেন হেমেন আসিতেছে এবং সে মেম বিবাহ করিয়াছে।

মেম বিবাহ করিবার অপরাধ কি ? এই কালো বউ তাহার মনের মত হয় নাই সে কেন চিরকাল সে কষ্ট বহন করিবে, তাহার স্বাধীনতা আছে, নিজের পছন্দ মত বিবাহ করিয়াছে।

নিভাকে উদ্দেশ করিয়া পুত্র মণ্টুকে বলিলেন, "শুনেছিস মণ্টু, তোর মেম-কাকিমা আসছে যে, ঠিক সাহেবদের মত না হতে পারলে তোর নতুন কাকি তোকে ভালবাসবে না, কাছেও যেতে দেবে না বুঝলি ?"

শুনিয়া নিভা হাসিল,—সে হাসি মুহূর্ত্তের জন্য ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল।
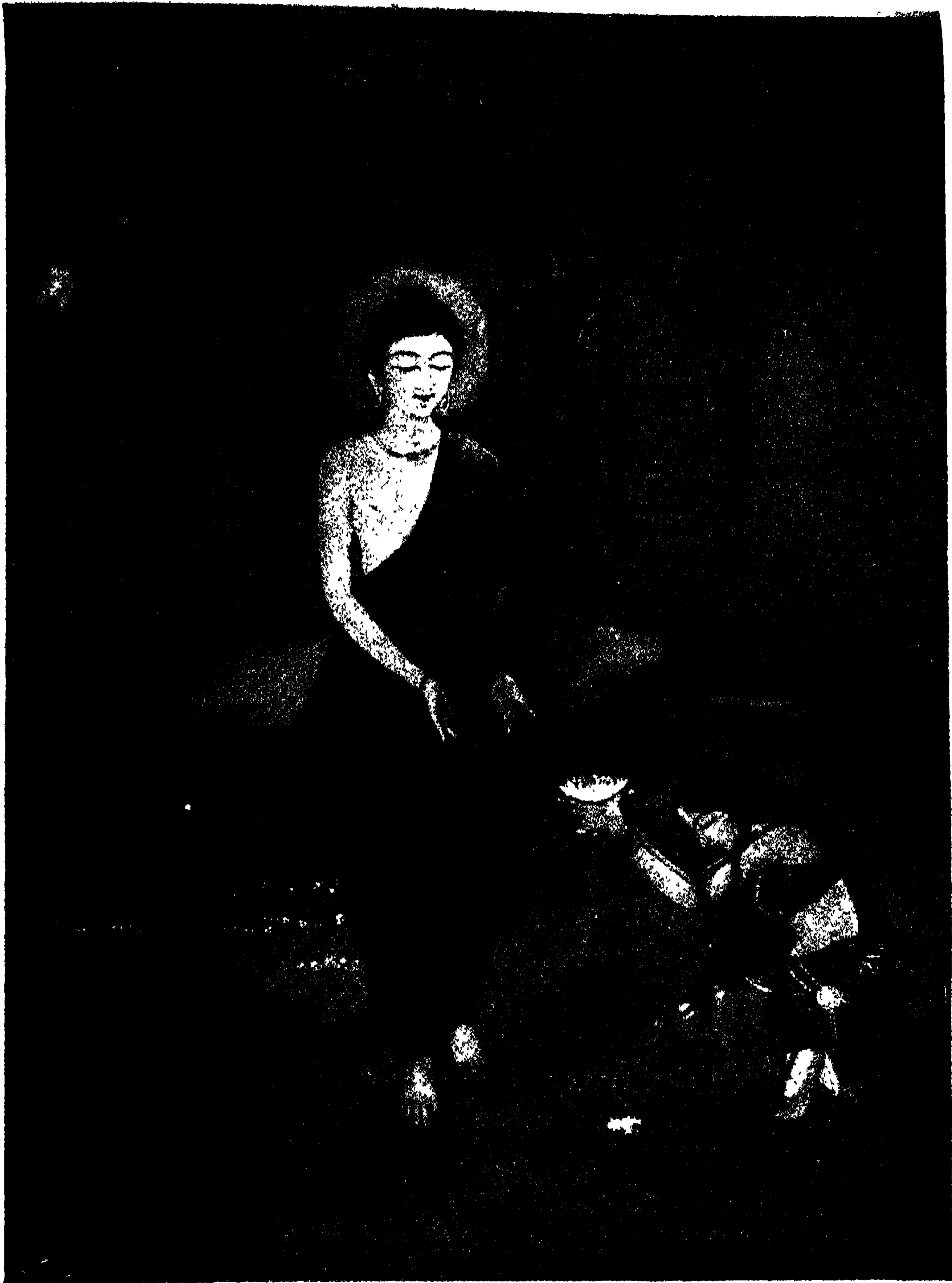
যেদিন হেমেনের কলিকাতায় ফিরিবার কথা তাহার দু'দিন আগে নিভার মেসোমহাশয় অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত - নিভাকে কিছুদিনের জন্য তাঁহার নিকটে পাঠাইতে হইবে।

নিভা মাসিমাকে কাশীতে পত্র দিয়াছিল, সমস্ত অবস্থা খুলিয়া লিখিয়াছিল—এ দারুণ অপমান হইতে বাঁচাইয়া আমায় তোমার কাছে লইয়া যাও মাসিমা, নচেৎ আমি আত্মহত্যা করিব।—"

নিঃসন্তানা মাসীমার বড় স্নেহের পাত্রী ছিল সে, তাহার অদৃষ্টে যে এরূপ শাস্তি ঘটিয়াছে তাহা তিনি জানিতেন না। সেই পত্র পাইয়াই কাঁদিয়া কাটিয়া তিনি স্বামীকে এখানে পাঠাইয়াছেন।

হেমাঙ্গিনী সে কথা শুনিয়া বিস্ময়ে বলিলেন, "ওমা, সে ছেলেটা এই পাঁচ বছর বাদে দেশে ফিরছে এসময় কি বউকে সেখানে পাঠান চলে ?

বিনোদলাল বলিলেন, "তাই বটে, সপত্নীর সঙ্গে তার স্বামীকে না দেখতে পেলে তার জীবনটা বোধ হয় ব্যর্থ হয়ে যাবে না হেম ? জানি নে, মেয়ে মানুষ হয়ে মেয়েদের এদিকটা কেন তুমি দেখতে পাওনা ? আমি কিন্তু বউমাকে এ সময় এখানে রাখছি নে হেম, নিজেও এ সময় থাকব না। সে হতভাগা যখন আমার দান অগ্রাহ্য করেছে, তখন তার মুখদর্শন করতেও আমি চাই নে। আশীর্ব্বাদ করছি—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি সে সুখী হোক, কিন্তু আমার সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক রইল না। যার সুখ আহ্লাদ, সাধ আনন্দ নিজের হাতে ঘুচিয়েছি—আমার সেই মা-টীকে যদি কোন রকমে এতটুকু খুসি রাখতে পারি সেই চেষ্টা করব।"

নিভাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বউ মা, আমিও কাশী যাব, আমার কাপড় চোপড় দু'চার খানা গুছিয়ে নাও তো মা।"

ভাই আসিতেছে, যে ভাইয়ের জন্য বিনোদলাল কত ব্যগ্র—সেই ভাই কাল বাড়ী আসিবে, তিনি আজ চলিয়া যাইতে চান, ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া নিভা তাঁহার মুখের পানে আশ্চর্য্য ভাবে তাকাইয়া রহিল।

শুষ্ক হাসিয়া বিনোদলাল বলিলেন, "আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছো—না মা ? কিন্তু আশ্চর্য্য হওয়ার এতে কিছুই নেই বউ মা। সে যে আমায় কতখানি আঘাত দিয়েছে তা কাউকে বুঝাতে পারব না দেখাবার হলে বরং দেখাতে পারতুম। তবু মনে আশা ছিল সে এতটা অকৃতজ্ঞ হতে পারবে না, আমার দানের মর্য্যাদা বুঝবে, কিন্তু সে তা বুঝলে না; আমি তার হাতে যে মালা আদর করে তুলে দিয়েছিলুম তা যখন সে ছিঁড়ে ফেলে দিলে, তখন আর তার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক ? চল মা, তোমার সঙ্গে আমিও যাব, ওদের সংসার নিয়ে ওরা থাকুক, আমি দিন কতক একটু বেড়িয়ে আসি। এই সংসারের জন্যে ভূতের মত খেটেছি, দিন নেই, রাত নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, শুধুই খেটেছি, অনেক করেছি আর পারছি নে। দিন কতক এখন বিশ্রামের দরকার কিছু দিন তাই বার হতে চাই।

নিভা বেশ বুঝিয়াছিল কেবল তাহার জন্যই তিনি চলিয়া যাইতেছেন, সে-ই দুইটী ভাইয়ের মাঝখানে প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে, স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে ব্যবধান হইয়াছে। সে যদি না আসিত সত্যই এ সংসার যেমন ছিল তেমনি থাকিত। কি অলক্ষণা সে,—হেমাঙ্গিনী যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থই সত্য।

সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "আপনি এখন যাবেন না,—আপনি এখন থাকুন, এর পরে—"

সস্নেহে তাহার মাথায় হাত দিয়া বিনোদলাল বলিলেন, "আর পরে নয় মা, আমি আজই তোমার সঙ্গে যাব এতে তোমার আপত্তির কারণ কি? বুঝতে পারছ না—এরা তোমায় আমায় অপমান করবার জন্যই এই আয়োজন করেছে। হেমেন যখন তার গৌরাঙ্গিনী স্ত্রী নিয়ে এসে এখানে দাঁড়াবে, তখন তোমার অবস্থা যাই হোক, আমার অবস্থা কি রকম হবে তা একবার ভেবে দেখেছ কি? না, আমি নিজেকে সে আঘাত থেকে রক্ষা করতে চাই, তোমাকেও সে আঘাত হতে রক্ষা করতে চাই।"

নিভা উত্তর দিতে গেল কিন্তু তাহার কণ্ঠে কথা সরিল না।

ছোট জাতের মেয়ে

শ্রীহাসিরাশি দেবী

১

বহুদূরে বাঁশী বাজিতে ছিল। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। যশোদা তাহার কুটীরের ছোট দাওয়ায়, একটি বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়া শ্রান্ত ভাবে মেঘমণ্ডিত সুনীল গগনের প্রতি চাহিয়াছিল।

কয়েক দিন হইতে ক্রমাগত বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল আজ তাহা ছাড়িয়া গিয়াছে। শুধু মাঝে মাঝে সজল বাতাস আসিয়া গাছের পাতার জলবিন্দুগুলি ঝরাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতে ছিল। সারাদিন জর ভোগের পরে যশোদা এই সন্ধ্যার সময় বাহিরে আসিয়া বসিয়াছিল।

এমন সময় বেড়ার ওপার হইতে গম্ভীর স্বরে ডাক আসিল যশোদা দিদি—

যশোদা চমকিয়া উঠিয়া শ্লথ গাত্রবস্ত্র সংযত করিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল কহিল কে?—

আমি তারক! বাবু একবার তোমার খবরটা নেবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন তাই এলাম!

যশোদা তারককে দেখিয়া একবার সভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া শুধু কহিল—উঠে বস দাঁড়িয়ে কেন?

তারক বসিল না দাওয়ার অন্য একটি বাঁশের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়া কহিল আজ যে বড় কাজে যাওনি? যশোদা কাতর স্বরে উত্তর দিল আজ বড় জর এসেছিল তারক! উঠতে পারিনি, সারা দিন মাথাও তুলতে পারিনি নইলে যেতুম। আজ ক'দিন ধরেই একটু একটু করে জর হচ্ছে কিন্তু তা গ্রাহ্য করিনি তারক কিন্তু আজ আর পারলুম না কি করবো—

বাধা দিয়া তারক বলিয়া উঠিল কিন্তু কামাই ক'রলে কি আর পরের কাজকরা পোষায় যশোদা দিদি এই দেখনা আমার কথাই বলি, কতদিন জরে বিজরে এসেও মনিবের কাজ করে দিয়েছি, এক দিনও কামাই পড়েছে—কথা কেউ বুকের পাটা রেখে বলতে পারে?

আর তা'হলে চলিবে কেন, কামাই করলে মনিবই বা কাজে বাহাল রাখবেন কেন? তাঁকেও তো পয়সা দিয়ে তবে ঝি চাকর রাখতে হয়। আর তুমি দিদি কিছু বড়মানুষও নও যে বসে বসে কামাই করলে তোমার দিন কেটে যাবে।

আর এমন অবস্থায় কি কামাই করে মাইনের থেকে যে পয়সা কাটান যাবে আর তার বাকি পয়সায় কি তোমার মাস কাটবে ভোবছো?—

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া যশোদা কহিল হয়তো চলবে না তারক! কিন্তু তা বলে আর কি ক'রবো মাস গেলে যে কয়টা টাকা পাই তাহাতেই একলা মানুষের যে কি কষ্টে দিন কাটাতে হয় সেতো আর কাকেও জানাতে পারিনে মেয়ে মানুষ আর অন্য কোন উপায়ও তো নেই।

সমবেদনা পূর্ণস্বরে তারক কহিল সে আর বলতে যশোদা দিদি তোমার যেমন কপাল তা কি করবে বল কিন্তু তুমি ইচ্ছে করলে তোমার অবস্থা এখনি ফিরে যেতেও পারে। বেশী কি বলবো দিদি আমাদের ছোট বাবুর কিন্তু তোমার উপরে বড় দয়া।'

আলোছায়ার অন্তরালে পীড়িতা যশোদার মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য বিকৃত হইয়া উঠিল তাহা তারক দেখিতে পাইল না। কিছু পরে বলিল যশোদা দিদি কথা কওনা কেন?

যশোদা ইহার উত্তর হঠাৎ দিতে পারিল না সমস্তদিন জ্বর ভোগের পরে তখনও তাহার মাথার ভিতরে যেন ঝিম ঝিম করিতেছিল যেমন ভাবেই এবং যত কষ্টের ভিতর দিয়াই হোক তাহার দিন কাটিয়া যাইত কোনও দিনই সে তাহার বাষ্পও অপরকে জানিতে দিতনা কিন্তু আজ মস্তিষ্কের বিকৃত অবস্থায় সে কথা সে তারককে সহসা বলিয়া বসিল।

তারকের কথাটা আসিয়া তীরের ন্যায় তাহার অন্তরে বিদ্ধ হইল। এবং কথাটা যে ভাবে বলিয়া তারক মৃদু হাসিল তাহাতে যশোদা শিহরিয়া দুই হাতের ভিতরে মাথাটা চাপিয়া ধরিল। যশোদাকে নীরব দেখিয়া তারক কহিল কি হল আবার?" আমার শরীর ভাল নয় তোমার এসব কথা বুঝবার ক্ষমতা আমার এখন নেই। এখন তুমি এসো আর আমি বসতে পারছিনে।

বলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল।

২

মেয়েটা জন্মাইয়াই নাম লইয়া ছিল রাক্ষসী! ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন পরেই জননীর মৃত্যু হয় পিতা অতিকষ্টে তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন কিন্তু বিধাতার বোধ হয় তাহাও সহ্য হইলনা তিনি তাঁহাকেও টানিয়া লইলেন সংসারে একটী বৃদ্ধাঠাকুরমা ব্যতীত আর কেহ রহিল না শীর্ণহস্তে অশ্রু মুছিয়া তিনি পৌত্রীকে অপর হস্তে বক্ষে টানিয়া লইলেন।

প্রসাধন — শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

পিতৃদত্ত নাম তুলিয়া দিয়া আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন—"যশোদা রাণী।" যশোদা দেখিতে কুৎসিতা ছিল না, বরং সুন্দরই ছিল।

জাতিতে তাহারা ছিল ছুতোর, মেয়ে হইলেও, গ্রামের গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যশোদা একটু আধটু লেখা পড়াও শিখিয়াছিল। এবং ভদ্র কন্যার ন্যায় চাল চলনও শিখিয়াছিল।

কিন্তু তাহার যত বৎসর বয়স বাড়িতে লাগিল পাড়ার এবং গ্রামের লোকেরও তাহার বিষয় ততই মাথা ঘামাইবার প্রয়োজনও বাড়িতে লাগিল। এবং একদিন তাহারা একথা স্পষ্টই বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে জানাইয়া দিল যে যদি তিনি পৌত্রীর বিবাহ খুব শীঘ্রই না দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে।

লোকের কথায় ঠাকুর মা এমনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন যে একদিন রাত্রে গ্রামেরই একটি চরিত্রহীন ছেলের হস্তে যশোদাকে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

যশোদা শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। তাহাকে আর তাহারা পিত্রালয়ে পাঠাইল না। ঠাকুর মা এক এক দিন তাহার লাঠিতে ভর দিয়া বড় কষ্টেই গ্রামের রাস্তা পার হইয়া পৌত্রীর শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইতেন, বড় আশা ও আনন্দ বক্ষে লইয়া। কিন্তু তাহা সফল হইত না। দ্বার হইতেই তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইত, যশোদার দেখা তিনি পাইতেন না। তাহারা তাঁহার সহিত যশোদার দেখা করিতে দিত না। বিফল মনোরথ হইয়া বৃদ্ধা যখন বাড়ী ফিরিত, তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে চতুর্দ্দিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত।

হঠাৎ একদিন প্রভাতে আয়ুষ্মতীর সকল চিহ্ন মুছিয়া একটি লোক সঙ্গে লইয়া বালিকা যশোদা সহাস্য মুখে আসিয়া ডাকিল—ঠাকুমা গো, আমি এসেছি।

ঠাকুর-মা কক্ষমধ্যে কি একটা কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। পৌত্রীর ডাক শুনিয়া সমস্ত ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়া থমকিয়া গেলেন। বজ্রাহতের ন্যায় ধূলার উপরে লুটাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ও রাক্ষসী পোড়াকপালী! তুইও কেন তার সঙ্গে গেলিনে রে' কেন ও পোড়ার মুখ আবার আমায় দেখাতে এসেছিস—মুহূর্ত্তে যশোদার মুখের উজ্জ্বলতা মলিন হইয়া গেল। দুয়ারের কবাট ধরিয়া সে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আর একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। ঠাকুর মায়ের উচ্চ ক্রন্দনের সঙ্গে আকৃষ্ট হইয়া পাড়ার কয়েকজন গৃহিনী ছুটিয়া আসিলেন। স্বামুর যশোদার একখানি হাত হাতের ভিতরে লইয়া একজন ঠাকুমাকে উপদেশ করিয়া কহিলেন—"যা হবার তা তো হয়েই গেছে বাছা। আর এখন কেঁদে কি হবে'। মেয়েটাকেও তো দেখতে হবে।

৩

দুইটি লোকের খরচ চালান এমনি সম্ভব নয় দেখিয়া ঠাকুরমা অনেক বলিয়া কহিয়া জমীদার বাড়ীতে যশোদার একটি কাজ ঠিক করিয়া দিলেন। কারণ তিনি জানিতেন অন্যান্য বাড়ীতে কাজ লওয়া অপেক্ষা জমীদার বাড়ী লওয়াই ভাল কারণ তাঁহারা গ্রামের রাজা বিশেষ, এক কথায় হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা।

"মেয়েটির বয়সও অল্প, এবং খাটিতেও পারে খুব" দেখিয়া গৃহিণী বিনা আপত্তিতে যশোদাকে কার্য্যে বাহাল করিবেন। দিন একরূপ ভাবে কাটিতে লাগিল। কিন্তু যশোদার উপরে যে গ্রামের অনেকেরই লুব্ধ দৃষ্টি রহিল, এ কথা তাহার ঠাকুরমা জানিলেও যশোদা জানিত না।

বৃদ্ধা তাহাকে সে কথা জানাইলেন না। শুধু মনে মনে সকাল সন্ধ্যায় হরির তলায় প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতেন—"ঠাকুর, আমাদের দু'জনকেই একসঙ্গে টেনে নাও। টেনে নাও। আর কিছু চাইনে।

কিন্তু এ কথা বোধ হয় দেবতা কর্ণে পৌঁছাইল না। তিনি যশোদাকে রাখিয়া একদিন সন্ধ্যার সময়ে তাহার এক মাত্র আশ্রয় স্থলটিকেও ধীরে ধীরে সরাইয়া লইলেন। যশোদা চীৎকার করিয়া কাঁদিল না, শুধু আড়ষ্ট ভাবে ঠাকুর মায়ের প্রাণহীন দেহখানার প্রতি চাহিয়া রহিল।

সৎকার হইয়া গেল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া যশোদা কাজে চলিয়া গেল।

দিন কাটিয়া যায়,—কাহারও সুখ দুঃখের জন্য সে অপেক্ষা করে না। সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া যশোদার দিনও কাটিয়া চলিল। প্রতিদিন সকালে সে কাজে চলিয়া যাইত, সন্ধ্যার সময়ে ফিরিয়া কুটীরের ছোট দাওয়াটিতে শ্রান্ত দেহখানি এলাইয়া দিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিত।

সেদিনও সে সারা দিনের পরে আসিয়া তাহার ছোট দাওয়াটিতে শ্রান্ত দেহখানি এলাইয়া দিয়া উদাস দৃষ্টিতে নীলাকাশের প্রতি চাহিয়াছিল। শুভ্র চন্দ্রালোকে ধরণী ভরিয়া গিয়াছিল। সান্ধ্য বাতাস ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছিল। অন্য দিনের মত সেদিনও দূরের দেব মন্দির হইতে শঙ্খ ঘণ্টার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল।

ডাক আসিল—"যশোদা দিদি—"

যশোদা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল—ছোট বাবুর প্রিয় চাকর তারক কখন নিঃশব্দে আসিয়া আঙ্গিণায় দাঁড়াইয়াছে।

বিরক্তি দমন করিয়, যশোদা উঠিয়া বসিল। কহিল—"এস"

ভাঁরক কহিল—"তোমায় একবার এখনিই বাবুদের বাড়ী যেতে হবে। ছোট বাবু তলব ক'রেছেন।"

যশোদা কহিল—"কেন ?"

"তা আমি জানিনে যশোদা দিদি। তবে তোমায় এখনিই যেতে হবে ব'লে দিলেন, তাই বল্‌তে এলাম।"

যশোদা আর না বলিতে পারিল না। উঠিয়া দাঁড়াইল।

মনিব বাড়ী হইতে যশোদা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বেশ রাত্রি হইয়াছে। একখানি মেঘে চাঁদ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

ম্লান আলোকে পথ দেখিয়া যশোদা যখন বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার মাথার ভিতরে ঘুরিতেছিল। শ্রান্ত ভাবে দাওয়ার উপরে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিয়া কাতরস্বরে বলিল—"আঃ মাগো।"

যে পর্দ্দাটা তাহার দৃষ্টির সম্মুখে অনেক দিন হইতে ঝুলিতেছিল, আজ তাহা খসিয়া যাইতেই ও পারের নগ্নরূপটা যশোদার দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল ! সে জানিত, মনিব ছোট বাবু তাহাকে দরিদ্র দেখিয়াই দয়া করেন, কিন্তু দয়ার আবরণে যে কতখানি নীচতা তিনি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা যশোদা জানিত না। আজ সেটা তাহার দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্ট রূপে ফুটিয়া উঠিতেই সে দুই হস্তে ছোট বাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া আকুল ভাবে কাঁদিয়া বলিল "আপনি আমার বাপের সমান ছোট বাবু—আমি যে আপনার মেয়ে—"

পা ছাড়াইয়া লইয়া ছোট বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন—"ছোট জাতের মেয়ের আবার—"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় যশোদা উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং সেই দিনই কার্য্য জবাব দিয়া সে আপনার কুটীরে ফিরিয়া আসিল।

মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল—"আমায় শক্তি দাও ঠাকুর। আমায় শক্তি দাও।

৪

কিন্তু নিয়তি যে অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে ঘুরাইয়া লইয়া ফিরিতেছে, তাহা যশোদা জানিত না।

সে দিন প্রায় বেলা একটার সময় সে একজনদের ধান ভানিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিল।

স্নান সারিয়া আসিয়া সে যখন রন্ধন চাপাইল তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন।

বাহির হইতে ডাক আসিল "যশোদা বাড়ী আছ !"

যশোদা বাহিরে আসিয়া দেখিল জমীদারের দুইজন পাইক অঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছে। যশোদাকে দেখিয়া তাহারা খবর দিল—"কাছারী বাড়ীতে তাহার তলব পড়িয়াছে।"

"যশোদা বিস্মিত হইল।

পাইকদের সহিত যশোদা যখন আসিয়া কাছারী বাড়ীতে হাজির হইল, তখন কাছারী ঘর লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। প্রকাণ্ড দরদালানের মধ্যস্থলে ফরাশের উপরে বিচারক ছোট বাবু ও নায়েব মহাশয় বসিয়াছিলেন।

কপালের উপরে আর একটু কাপড় টানিয়া দিয়া যশোদা এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। নায়েব মহাশয় মনিবের আদেশে যশোদাকে শুনাইয়া দিলেন—তাহার তিন বৎসরের খাজনা বাকি, এখনিই তাহা শোধ করিতে হইবে। এই তিন বৎসর যশোদা বাবুর বাড়ী কাজ করিয়াছিল। খাজনা দিতে সে পারিবে না জানিয়া ছোট বাবু নিজেই বলিয়াছিলেন,—তিনিই না হয় তাহার খাজনাটা কাটাইয়া লইবেন।

যশোদা তখন ভাবিয়াছিল, গরীব বলিয়া ছোটবাবুর দয়া হইছয়াছে। কিন্তু কয়েকদিন পূর্ব্বে তাহার সে ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাই আজ সে কথা ঘৃণায় সে মুখেও আনিল না। ধীর স্বরে উত্তর দিল—এখন তো দিতে পারব'না বাবু দুদিন পরে···বাধা দিয়া নায়েব একটা কুৎসিত ভাষায় গালি দিয়া উঠিলেন যশোদার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল।

নায়েব কহিলেন—এখনিই বাকি খাজনা চাই বুঝেছ চুপ ক'রে থাকলে নিস্তার পাবেনা।

যশোদা মুখ তুলিয়া অত্যন্ত অসহায় ভাবে কহিল—"কিন্তু এখন কোথায় টাকা পাব আমি' জানেন তো আমি কত গরীব।—"

মুখ খিঁচাইয়া নায়েব কহিলেন "তবু তো হুজুরের বাড়ীর চাকরী ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে, সে কি শুধু শুধু' না, ওসব বদমায়েসি আমি শুনবো না, ভাল চাও তো টাকা বার কর, নইলে এ গাঁয়ের বাস তোর উঠ্‌লো। আর দশঘা বেত—

যশোদা ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল—"আর তো কোথাও আমার জায়গা নেই বাবু—কোথায় যাব আমি'—

তাহার উত্তরে দরদালান।কম্পিত করিয়া মোসাহেবদের উচ্চহাসির শব্দ আসিয়া যশোদার হৃদয়ে তীরের মত বিদ্ধ হইল।

জলদ গম্ভীর স্বরে নায়েব হুকুম দিলেন—"এই বদমায়েস মাগীকে বেঁধে দশ ঘা বেত্ত লাগাও।"

যশোদার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। চীৎকার করিয়া ছিন্নলতার ন্যায় লুটাইয়া পড়িল।

প্রহার জর্জ্জরিত দেহে টলিতে টলিতে যশোদা যখন তাহার কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দিনের শেষ আলোটুকু ধরণীর উপরে পড়িয়া বিদায় ভিক্ষা করিতেছিল। যশোদা একবার তাহার বাল্যের, কৈশোরের, ও যৌবনের সাথী তাহার প্রিয় ছোট কুটীর খানিকে দেখিয়া লইল। তাহার পরে একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া সম্মুখের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

তখন দিনান্তের আলোকটুকুও ধরণীর গাত্র হইতে মুছিয়া গিয়াছে। পল্লীবালাগণ শঙ্খ-নিনাদে চতুর্দ্দিকে মুখরিত করিয়া গৃহে গৃহে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাইতেছিল।

বোধ-বৈষম্য

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী মজুমদার

পণ্ডিতবর চাণক্য বলিয়াছেন, স্ত্রীকুল ও রাজকুলকে বিশ্বাস করিবে না—ঠকিবে। আমরা বলিব, পুরুষজাতিকে এবং লেখক ও সম্পাদককুলকে কখনও বিশ্বাস করিও না—পস্তাইবে। ইহারা জীবন্ত মানুষকে যমালয়ের অধিবাসীরূপে চিত্রিত করিয়া থাকেন; জীবিত রোহিত মৎস্যে পোকা পড়াইতে পারেন; শুধুই কলমের জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন বলিয়া অযথা গর্ব্ব করিয়া থাকেন, ইহাদিগকে বিশ্বাস করিও না,—পস্তাইতে হইবে। ইহারা কলমের মুখে ইংরাজকে ভারত সমুদ্র পার করিয়া থাকেন; কচুরী পানা, বিনষ্ট করেন; ম্যালেরিয়া বিতাড়িত করেন, দেশ উদ্ধার করেন; ভারতমাতার দুঃখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নদীনালা ভরাইয়া থাকেন, কার্য্যকালে কিন্তু দেখা যায়, সে সবই তাঁহাদের 'মিটিংকা কাপড়া'—যতক্ষণ ঐ কলম হাতে আছে, ততক্ষণই! কলমটি ছাড়িয়াছেন কি, আর দেশও নাই, ভারত মাতাও নাই, কচুরি পানা, কলেরা, কালাজ্বর কিছুই নাই! রোজই কাগজে লেখেন, লোকাভাবে বাঙ্গালার শস্যশ্যামলা, বনকুন্তলা পল্লীগ্রাম গেল, গেল, রসাতলে গেল; কিন্তু যখনই তাঁহাদিগকে ছুটি-ছাটার সময় জন্মভূমি, মাতৃভূমি পল্লীগ্রামে যাইতে বলা হয়, তখনই তাঁহারা চোখ কপালে উঠাইয়া, ঠোঁট উল্টাইয়া বলিয়া থাকেন, বাপ রে যে ম্যালেরিয়া! অথচ কাগজে লিখিবার সময় লেখেন, যাও যাও, যাও, ওগো তোমরা সকলে পল্লীগ্রামে যাও, সেইখানে বাস কর, সেইখানে কাজ কর, পল্লীর উন্নতিসাধন কর, দেশ উন্নত হইবে, জাতি গঠিত হইবে। ভাবটা যেন, তোমরা সকলে মরিয়া পড়, সহরে থাকি শুধু আমি! ছেলেবেলায় একটা গল্প শুনিতাম, একজন লোক ছিল, সে বলিত, দেশে মহামারী মড়ক হইয়া সমস্ত উজাড় হইয়া যাক্, থাকি কেবল আমি ও ভীম নাগ অথবা তস্য ভ্রাতা শ্রীনাথ নাগ! তাহারা সন্দেশ তৈয়ার করিবে, আর আমি খাইব! লেখক, সম্পাদক, রাজনীতিক—'ক'কারান্তদেব মনোভাব, সেইরূপ। যাক্ এ সম্বন্ধে অধিক সত্য কথা বলিয়া আর কাজ নাই, নিরুপমা-বর্ষস্মৃতির সম্পাদকও ত' সম্পাদক, তিনি আবার দয়া করিয়া

আমার এত সাধের লেখাটি তাঁহার আদরের, সর্ব্ব দুঃখহর W. P. B.তে স্থান দান করিয়া ফেলিতে পারেন; 'ক'কারান্তদের বিশ্বাস নাই। যাঁহারা নিত্য নিয়মিত প্রাইম-মিনিষ্টারের কাজের ভুল নির্দ্দেশ করেন, বড় লাটের ভুল ধরিয়া তিরস্কার করেন, লাটসাহেবকে সার্মন প্রিচ করেন, শাসননীতি, রাজনীতি, সম্বন্ধে কলম চালনা করিয়া কাগজ এফোঁড় ওফোঁড় না করিয়া ছাড়েন না, এবং কেবল মাত্র আপনাদিগকেই নির্ভুল, অভ্রান্ত বলিয়া লেখনী বাজী করিয়া থাকেন, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহারা যে কত ভুলই করেন, তাহা তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারেন না, অন্য লোকে কিন্তু তাহা সদা সর্ব্বদাই বুঝিয়া থাকে। আরও মজা এই যে, চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলে, অথবা যুক্তিতর্ক সহযোগে বুঝাইয়া দিলেও তাঁহারা দেখেন না, বা বুঝিতে চাহেন না। বোধ হয় তাঁহারা জাগিয়া ঘুমান, তাই ঘুম ভাঙ্গে না।

আমাদের গৃহে একটি লেখক-সম্পাদক আছেন। 'ক'কারান্তের প্রভাব তাঁহাতেও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। আজ একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিব। তাহা পাঠে আমার পাঠিকা বন্ধুরা বুঝিবেন যে, ইঁহাদের বিশ্বাস করিতে নাই!

বঙ্গ-সাহিত্যে কোন এক সুপরিচিত লেখিকার নাম কম করিয়া ছয় বৎসর ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছিলাম; তাঁহার বই, তাঁহার লেখাও অনেক পড়িয়াছিলাম। তাঁহার একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস (ঝরাপাতা) আমার নামে, তাঁহার হস্তাক্ষর শোভিত হইয়া 'সাদরোপহার' আসিয়াছিল। আমাদের বাড়ীর লেখকমশাইটির সঙ্গে তাঁহার অল্প বিস্তর পরিচয় আছে শুনিতাম এবং লেখিকা ঠাকুরাণী কখনও কখনও আমাদের মত শিক্ষাদীক্ষাহীনা অ-সভ্যার সহিত আলাপের আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, লেখক মশাই দয়া করিয়া এ খবরটি মাঝে মাঝে দিতেন। কিন্তু লেখক-মশাই কখনই এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাইতেন না। কাজেই দুঃখিত হওয়া ছাড়া আমার কোন উপায়ও ছিল না। তারপর কথাটা এক রকম চাপাই পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ শুনিয়াছিলাম, লেখিকা 'ভারতবর্ষ' ত্যাগ করিয়াছেন—ব্রহ্মপ্রবাসিনী হইয়াছেন।

বৎসর দুই পরে সংবাদ শুনিলাম, বঙ্গ রমণী আবার বঙ্গ জননীর ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন। লেখক-মশাইর কাগজে তাঁহার একটা লেখাও পড়িলাম; আর শুনিলাম, এবারও তিনি আলাপের আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু লেখক-মশাইটি নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ পুরুষ! আমি কিন্তু তাঁহাকে স্পষ্টই বলিয়া দিলাম, 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য' ইহা মান্য করিতে আমি আর রাজী নহি, আলাপ করাইয়া দিতেই হইবে। লেখক-মশাই যত রাগই করুন, এ কথা আমি বলিবই যে, ইহাতেও তাঁর মুখে সাত চড়ে 'রা' নাই!

পুরুষের স্বার্থপরতার কথা, নারীজাতির প্রতি তাহাদিগের চির ঔদাসীন্যের কথা তুলিয়া গৃহবিরোধ বৃদ্ধি করিব না; করিয়া লাভ ত কিছুই নাই! তবে আমার মত বদ্ধ বায়ুর অবরোধে রুদ্ধ নারীর মনের কথা যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারাই আমার দুঃখ বুঝিতে পারিবেন। লেখক-মশাই

বুঝিলেন কি না বলিতে পারি না, হঠাৎ একদিন তাঁহার হিমগিরি সদৃশ ঔদাসীন্য টলিল। বলিলেন, আলাপ করাইয়া দিবেন। আমি উল্লসিত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই উৎসাহ অনলে সলিল বর্ষিত হইল। নিজের অক্ষমতার কথা বলিতে বাধা নাই!—বিদ্যা, সে ত সেই বোধোদয়ের বেড়াটি মাত্র টপকাইতে পারিয়াছিল; ফার্ষ্ট বুকে—close to my farm a I met a lame man করিয়াই শান্ত হইয়াছিল। আর অপর পক্ষ নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ-মার্কা বিদুষী! ফর-ফর করিয়া ইংরাজী বলেন; জুতা পায়ে মস্ মস্ করিয়া চলেন। এই সকল অসামঞ্জস্য অতিক্রম করিতেও হয় ত বাধিত না, পরে যাহা শুনিলাম, তাহাতে পা যেন আর উঠিতেই চাহে না। লেখক-মশাই কহিলেন, তিনি অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির, (আমি ভাবিলাম, দেমাকে বুঝি বা!) সামান্য কথা কহেন, সামান্য হাসেন (লেখক-লেখিকাদের ধর্ম্মই কি এইরূপ?) ইত্যাদি, ইত্যাদি! বলা বাহুল্য, আমি আর উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

বাঙ্গালা দেশে একবার যখন পণপ্রথা নিবারণের ধুম পড়িয়াছিল, তখন আমাদের বড় বড় নেতা বাবুরা সভায় সভায় বক্তৃতায় "পণ লইও না, পণ লইও না" বলিয়া চেঁচামেচি করিয়া আসিয়া, গৃহে পুত্র পৌত্রের বিবাহে কন্যাকর্ত্তার গলায় পা দিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না। অনেক লেখক এবং লেখিকাকে আমি দেখিয়াছি, লেখাও পড়িয়াছি, যাঁহারা অশিক্ষিতা, অল্প শিক্ষিতা বঙ্গ ললনাদিগের জন্য রোদন করিয়া খবরের কাগজ ভিজাইয়া ফেলেন, তাঁহাদেরই আবার এইরূপ অবজ্ঞার কথা শুনিলে মন কিরূপ হয় সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীশুদ্ধ লোকই কি অভিনেতা আর অভিনেত্রী? আমাদের ঐ লেখক-মশাইটির সঙ্গে আমিও অনেক দেশ বেড়াইয়াছি, 'বড়' 'ছোট' অনেক ঘরের ঘরণীর সহিত আলাপ পরিচয়, সখ্য-সৌহার্দ্দ্যও হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতা, ধনবতীও অনেক ছিলেন কিন্তু 'দেমাকে' 'সামান্য কথা কহেন,' 'সামান্য হাসেন' এরূপ কাহাকেও দেখি নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে আর এক প্রসিদ্ধা লেখিকার আগমন হইয়াছিল, আমাদের গৃহে; অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাঁহার অমায়িকতার, হৃদয়ালুতার প্রশংসাও আমি করিতে পারি নাই। তবে আমি মূর্খ, এই যা! আমার নিন্দা-স্তুতিতে কি-বা আসে যায়! কিন্তু আমি বিস্মিত হই এই ভাবিয়া যে সদ সর্ব্বদা কাগজে কলমে নারীদের প্রতি কতই সহানুভূতি, কতই মমত্ব, কতই প্রীতি দেখি, ইঁহাদের হাত হইতে (বুক হইতে?) বাহির হয়। বাল্যে, কৈশোরে লেখাপড়া শিখি নাই বলিয়া দুঃখ হইত কিন্তু লেখাপড়া শেখার ফলে যদি 'অমানুষ' হইতে হয় তবে সে লেখাপড়া না শিখিয়া হয়ত সুখীই আছি। সন্তান-পালন করি; স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামী পুত্রকে অন্ন ব্যঞ্জন বাড়িয়া দিই, উদয় অস্ত গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকি—বেশ আছি! সত্যিই বেশ আছি!

দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় করিবার ইচ্ছা একরূপ পরিহার করিয়াছিলাম, এমন সময়ে লেখক-মশাই একদিন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন—না, না দেখা করিতেই হইবে। বুঝিলাম,

'বারিধারার অন্তরালে' মিঃ এন সি দাস

ও পক্ষ জোর তাগাদা দিয়াছেন ; ইহাও বুঝিলাম, এ পক্ষের উৎসাহ কিন্তু জল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু লেখক মশাইটি ভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন, তাঁহারা (প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, গৌরবে বহুবচন, পরে বুঝিয়াছি অন্যরূপ) অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ীসুদ্ধ লোকই লেখক-মশাইকে বিপন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন !

কিন্তু সমস্যা হইল, পর্ব্বত মহম্মদের কাছে যাইবে, না, মহম্মদ পর্ব্বতের কাছে আসিবে ! আমাদের লেখক-মশাই যখন সম্পাদক এবং তাঁহার কাগজ আছে, তখন লেখক-লেখিকারা চিরকাল যাচিয়া, ঘরের কড়ি খরচ করিয়া, তাঁহার কাছে লেখা পাঠাইয়া থাকেন, এ ক্ষেত্রেও, গৌরীশঙ্করের সেই গণিতের হিসাবেই লেখিকারই উচিৎ সম্পাদকের গৃহে প্রথম আসা ! সম্পাদক-নীতিতে ইহা সমীচীন হইতে পারে, মনুষ্যনীতিতে ইহার কোনই মূল্য নাই—যে হোক্ যাইলে বা আসিলেই হইল। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এই ব্যাপারটায় মৌন থাকিয়া আমি সম্পাদক মশাইর মতই সমর্থন করিলাম। 'দেমাকে', 'সামান্য কথা কহেন,' 'সামান্য হাসেন' এ মন্তব্যগুলা মনে ছিল এবং ঐ গুলা হইতে মনে স্বতঃই যে ভাবের উদয় হয়, তাহাও যে হইতেছিল না তাহাও নয়। কিন্তু সম্পাদক যিনি যত বড়ই হৌন, লেখক-লেখিকাদের দয়ার উপর তাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। তাঁহাদের লেখা সাজাইয়া গুছাইয়াই ত সম্পাদক ! সম্পাদক মশাইকে বোধহয় পরাস্ত হইতে হইয়াছিল, কেননা, তিনি একদিন 'বদলে ফেল্লাম মতটা' করিয়া কহিলেন, একটা মাঝামাঝি জায়গায় মিলনের ব্যবস্থা হইয়াছে। জায়গাটা কোথায়, জিজ্ঞাসিতে কহিলেন, "আলিপুরের চিড়িয়াখানায় !" স্থান নির্ব্বাচনে বাহাদুরী আছে বটে !

বলিলাম—মহাশয়, আপনি কি আমাদিগকে সেই স্থানের সামিল বলিয়াই বিবেচনা করিতেছেন ?

উত্তর হইল—তা বলিতে পারি না ; তবে স্বভাবের প্রীতিতে যে এ স্থান নির্ব্বাচন করি নাই তাহা সুনিশ্চিত।

লেখক বলিয়া, সমালোচক বলিয়া, গাল্পিক বলিয়া, ঔপন্যাসিক বলিয়া, সুরসিক বলিয়া আমাদের লেখক মশাইটির কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে, সুহৃদ-মিলনের এই মনোরম স্থান নির্ব্বাচনের কৃতিত্ব শুনিয়াও কি তাহা থাকিবে ? না, থাকাই উচিত, আপনারা বিচার করুন।

এক মুহূর্ত্ত পরে গড়গড়া টানিতে টানিতে কৈফিয়ৎ দিলেন—বেড়াতে বেড়াতে কথা বার্ত্তাও চলবে, নানা রকম জীব-জন্তুও দেখা চলবে, সেই ভাল নয় কি ? বদ্ধ ঘরে, বদ্ধ আলোয়, বদ্ধ বায়ুতে কি আলাপ জমে ?

ব্যবস্থা হইয়াছিল, আমি গাড়ীতেই বসিয়া থাকিব, লেখিকা আসিয়া গাড়ীতে উঠিবেন, অর্থাৎ উভয় পক্ষের জিদই অক্ষুন্ন থাকিবে। ধার্য্য দিবসে, বেলা ১টার সময় কলিকাতার এক

প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে উপনীত হইয়া, আমরা একটি সরু গলির মুখে মোটরেই বসিয়া রহিলাম; লেখক মশাই খবর দিতে গেলেন। একটা—স' একটা—দেড়টা,—পৌনে দু'টো, কাহারও দেখা নাই। লেখিকা ঠাকুরাণীর দু'টী ভাই আসিয়া আমার সঙ্গেই গল্প করিতেছিলেন, 'বিলম্বের এই বিপর্যায় বহর' দেখিয়া তাঁহারাও লজ্জিত হইয়া খবর আনিতে ছুটিলেন। দেরী যতই বাড়িতেছিল, আমার ভয়ও তত বাড়িতেছিল। আর মনে পড়িতেছিল, 'গম্ভীর প্রকৃতির,' 'সামান্য কথা কহেন,' 'সামান্য হাসেন,' ইত্যাদি! ভাবিলাম, না আসিলেই ভাল করিতাম। লেখক ও লেখিকা সম্প্রদায়ের লেখা পড়িয়া তৃপ্ত থাকাই ভাল; আলাপ পরিচয়ের বিড়ম্বনা না করাই উচিত।

ভাই দু'টি—ইহাদের সঙ্গে আমার আগেকার আলাপ, একটি সম্প্রতি এম্-এ পাশ করিয়া, ঘরে বসিয়া কি-করি কি-করি করিতেছেন, অপরটি শতমারী সহস্রমারী হইবার আগ্রহে অধীর; বেলগেছিয়ায় মড়া ঘাঁটিয়া মানুষ মারার কাজের মকসো করিতেছেন—ফিরিয়া আসিয়া ক্ষমা-চাওয়া-স্বরে বলিলেন—আর পাঁচ মিনিট বৌ'দি! দিদি আস্‌ছেন।

পাঁচ পাঁচ করিয়া আরও পঁচিশ মিনিট কাটিয়া গেল, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! বলা আবশ্যক আমাদের লেখক মশাই সম্ভবতঃ বিরক্ত হইয়াই, অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিয়া আমাদের কাছেই দাঁড়াইয়াছিলেন; তাঁহার শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখমণ্ডলে (কমলে?) অধীরতা ও বিরক্তির রেখা পাঠ করিয়া কি ভয়ই যে আমার হইতেছিল! আমার ভাবী বন্ধুর ভাই দু'টী সেখানে উপস্থিত না থাকিলে আমি বোধ হয় 'যঃ পলায়তি' পরামর্শই দিতাম।

শুনিয়াছি, আগেকার কালে নবাব বাদশাহ্‌দের সভা সমিতিতে আসিবার সময় হইলে, নকীব ফুকারিত। মাননীয়া লেখিকা মহাশয়ও যে আসিতেছেন তাহাও আমরা বুঝিলাম, নকীব ফুকারিয়া উঠিতে। তিনটি সুকেশা, সুবেশা কিশোরী আসিয়া বীণানিন্দিতকণ্ঠে কহিল—সেজদি আসিতেছেন। মেয়ে তিনটির পরণে একরকম কাপড়, একরকম জামা, পৃষ্ঠে একই রকম সর্পাকৃতি বেণী বিলম্বিত। হাসির ঝলকের মত, ক্ষুদ্র নদীর তিনটি ছোট্ট তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত, বায়ুবিকম্পিত আধ ফোঁটা তিনটি কুঁড়ির মত মেয়ে তিনটি হাসিয়া, দুলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া নমস্কার করিয়া বসিয়া পড়িল। আমাদের লেখক মহাশয় পরিচয় করাইয়া দিলেন, শ্রদ্ধেয়া লেখিকার দুইটি কন্যা, অপরটি কনিষ্ঠা ভগ্নী।

আরও দশ মিনিট কাটিলে শুনা গেল, তিনি আসিতেছেন। যে বুক এতক্ষণ দুরুদুরু কম্পিত হইতেছিল, তাহাতেই এক্ষণে কুলীশের কড় কড়, বৃষ্টির তড় তড়, ঝড়ে বৃক্ষের মড় মড় ধ্বনি শ্রুত হইল। যে বাল্যকালটা পুতুল খেলায়, আরও নানাবিধ খেলায় পরমানন্দে অতিবাহিত হইয়াছে, সেই অভিশপ্ত বাল্য ও কৈশোরের কথাটা মনে করিয়া আমার নিজের মন নিজের উপরই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

কম বেশী ছয় বৎসর কাল কত ভাবে, কত রকমে যাঁহার কত কথা শুনিয়াছি, যাঁহাকে দেখিবার জন্য, আলাপ করিবার জন্য আকুল আগ্রহে কত না কামনা করিয়াছি—তিনি আসিলেন; আসিয়া গম্ভীর ভাবে একটি নমস্কার করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। আমাদের লেখক মহাশয় নিজের হাতে গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চালকের পার্শ্বে উঠিলেন, গাড়ী 'ঝ্যু-'র পথে ছুটিল। গাড়ীতে ছোট্ট খাট্ট দুই চারিটির বেশী কথা হইল না। আমিই প্রশ্ন করি, তিনি এক অক্ষর বা বড় জোর দুই অক্ষর যুক্ত শব্দে উত্তর দেন, কাজেই আমার ভয় ভাঙ্গিল না; অত্যন্ত সংকোচের সহিত আমি ভয়ে ভয়েই রহিলাম। 'ঝ্যু'তে পৌঁছিয়া অন্য সকলে আগে আগে চলিলেন, আমরা দু'টিতে ইচ্ছা করিয়াই মন্দ গতিতে চলিয়া পিছাইয়া রহিলাম। কৃত্রিম হ্রদটির তীরে তালি-কুঞ্জতলে চলিতে চলিতে নিকটে, দৃষ্টির ভিতরে জন-মানব নাই দেখিয়া তিনি আমাকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, আমার ছ' বছরের বন্ধু, ছ' বছরের ভালবাসা আমার অজ ধন্য ও সার্থক হইল! আজ আর তোমাকে ছাড়িব না; তুমি ছাড়িতে চাহিলেও ছাড়িব না।

এই সরল-মধুর অমায়িক ব্যবহারে ভয় কমিয়া গিয়াছিল; বলিলাম—আমরা আসবো খবর ত পেয়েছিলেন, তবু এত দেরী করলেন কেন?

বন্ধু বলিলেন—ভাই, রান্নাবান্না ক'রে সব্বাইকে খাইয়ে দাইয়ে তবে ত ছুটী পাব! তার ওপর আজ বাড়ীতে ক'জন লোক বেশী এসেছিলেন।

জিজ্ঞাসিলাম—আপনি নিজে রাঁধেন?

রাঁধি না!…দু'বেলাই! কেন তুমি রাঁধ না?

আমাদের কথা ছেড়ে দিন্। আমরা হলুম মূর্খ। আর আপনারা…

বাধা দিয়া বন্ধু কহিলেন—আমি কিন্তু তোমাকে 'তুমি' বলেছি, তুমি 'আপনি' করে 'পর' ক'রেই রাখছ ভাই!

তারপর সে কত কথা! কথা কি ফুরায়! এই দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরিয়া তিনি আলাপের আকুলতা জানাইয়াছেন, আমাদের লেখক মহাশয় কোন দিনই কর্ণপাত করেন নাই, এবার অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করাতেই এই মিলন সংঘটিত হইয়াছে, সব শুনিলাম! নিজেও কত কি বলিলাম, কি জানি!

শেষে বলিলাম, দেখুন আমার বড্ড ভয় ছিল আপনাদের সঙ্গে মিশতে। আগ্রহ কম ছিল না সত্যি কিন্তু আশঙ্কাও খুব ছিল।

বন্ধু জিজ্ঞাসিলেন—ভয় কেন? আশঙ্কাই বা কিসের?

কথাটা বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছি না দেখিয়া তিনি বলিলেন—হ্যাঁ ভাই, এই বুঝি বন্ধুত্বের এ সূত্রপাত?

তখন আর না বলিয়া পারিলাম না; বলিলাম—দেখুন, আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা একটু অন্যরকম ছিল।

বন্ধু সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—কি রকম ধারণা ছিল জান্তে পারি কি?

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিলাম, শিক্ষিতা, ইংরিজি পড়া মেয়েরা প্রায়ই একটু দেমাকে হয়; আমিও শুনেছিলুম…

কার কাছে শুনেছিলে?

এইবার সত্যই মুস্কিলে পড়িলাম। সত্য কথা বলিলে লেখক-বেচারীকে বিপদে ফেলিতে হয়; আর মিথ্যাই বা বলি কিরূপে?

তিনি বলিলেন—বুঝেছি, কার কাছে শুনেছো? কিন্তু কি শুনেছ, তা বল্‌তেই হ'বে।

আপনি কম কথা ক'ন্; কন্‌-না বল্লেই চলে,…এমনই কত কি! কখনও হাসেন না…

এইবার তিনি হাসিলেন, বলিলেন—কিন্তু সেটা কি দোষের?

আমি ত অবাক্! মানুষ, বিশেষতঃ রমণী, তা পারে কি করিয়া, আমি ত বুঝিতে পারি না।

তিনি কহিলেন—দেখ ভাই, দু'পাতা ইংরিজিই না হয় পড়েছি; ছাইপাঁশ কিছু লিখিও কিন্তু নারী ত! নারী পুরুষের সামনে হো হো ক'রে হাস্‌বে, চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করবে, এই কি তুমি আশা কর?—না, সেই তোমার ভাল লাগে, তাই বল ভাই!

মেঘে যেন সৌদামিনী খেলিয়া গেল। সেই অশনি-আলোকেই বন্ধুর স্বচ্ছ হৃদয়খানি দেখিতে পাইলাম। সত্যই ত! নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ যে লজ্জা, তাহাই কি কখনও দোষের হইতে পারে!

ভুল বুঝিয়া তাঁহার দুইটি হাত ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিলাম, বন্ধু আমায় ক্ষমা কর; মনে মনে কখন কখন কত নিন্দাই যে করেছি, তা আর কি বলব! কিন্তু ক্ষমা কর বন্ধু, দোষ আমার নয়। যাঁরা সর্ব্বজ্ঞ বলে বড়াই করেন, বিদ্যাবুদ্ধির গর্ব্ব করেন; দোষ তাঁহাদেরই একজনের।

মধুর হাসি হাসিয়া বন্ধু কহিলেন, দোষ তাঁহারও নয় বন্ধু! angle of vision… ঐ যাঃ! আবার ইংরাজি বলিয়া ফেলিলাম! ক্ষমা, বন্ধু, ক্ষমা!

কিন্তু, বাড়ী ফিরিয়া লেখক মশাইর সঙ্গে একটা বোঝাপাড়া করিতে গেলাম। সমস্ত শুনিয়া এক গাল ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়া কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশির দিকে চাহিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে নীরবে ইহাই যেন বুঝাইয়া দিলেন যে, পৃথিবীতে এই সকল তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া মানুষের মাথা ঘামানো, অন্যায়, অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়!

পরদিন তাঁহার কাগজে পড়া গেল, বোলশেভিক সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

গোলাপ সিংহ

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

১

সন্ধ্যা হয়—হয়।

সমস্ত দিনের দারুণ পরিশ্রমকর ব্যাধবৃত্তির পর আমরা উত্তেজনা-ক্লান্ত দেহে যখন তাঁবুতে ফিরিলাম, গোর্খা জমাদার গোলাপ সিংহের দুঃসাহসিক ব্যাঘ্র-শিকার কাহিনী লইয়া চারিদিকে রীতিমত কোলাহলোৎসব চলিতেছে।

আমাদের অভিযানের লক্ষ্যস্থল গারো পাহাড়ের একটা প্রান্তসীমা। এখনকার বিখ্যাত রাজষ্টেটের মহারাজা বাহাদুর, তাঁর বন্ধুস্থানীয় জন চার ইংরেজ রাজপুরুষ এবং মহারাজের অনুচরবর্গের সহিত প্রতি বৎসরের মত এবারেও শিকারের উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে আসা হইয়াছে। স্থানটা শহর হইতে দূরে, রীতিমত জঙ্গলী দেশ।

প্রায় আট বৎসর রাজষ্টেটে চাকরী করিয়াছি। প্রতি বৎসরই এই শিকারীদলের সহিত আমাকে আসিতে হয়। প্রতিবারই বিস্তর বাঘ, ভালুক, বুনো-মহিষ, বন্য-বরাহ, হরিণ প্রভৃতি শিকার করিয়া লইয়া যাই। কিন্তু এবারের মত এমন বিষম বিপদে কখনও পড়ি নাই, এবং গোর্খা গোলাপ সিংহের মত এমন অসম সাহসিক শিকারীর শিকার-কৌশল ও কখনও দেখি নাই। পাকা শিকারী গর্ডন সাহেবের অব্যর্থ লক্ষ্য, মহারাজা বাহাদুরের মন্ত্রসিদ্ধ বন্দুকের কৃতিত্ব—এবং এই অধম বাঙালীর বড় সাধের সতের-শো টাকা দামের দোনলা রাইফেলের সব গৌরব ব্যর্থ করিয়া ক্রোধোন্মত্ত ব্যাঘ্ররাজ যখন প্রচণ্ড বিক্রমে মহারাজার হাতীর উপর চড়াও হইয়াছিল, তখন জমাদার গোলাপ সিংহ একখানি মাত্র কুকরীর উপর নির্ভর করিয়া কিরূপে যে সেই হিংস্র বন্য রাক্ষসের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, কি কৌশলে কি ক্ষিপ্রতার সহিত তিন তিনবার তা'র আক্রমণ এড়াইয়া পেটের তলা দিয়া গুঁড়ি মারিয়া পার হইয়া আসিল,—সেই দারুণ সঙ্কট-মুহূর্ত্তে কি ভাবে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া, ধীর বুদ্ধি বিবেচনার সহিত তার মুখে ও পাঁজরে ছুরিকাঘাত করিয়া কোন শক্তিতে তাকে জন্মের মত ঠাণ্ডা করিয়া দিল, সে দৃশ্য যেমন অদ্ভুত,

তেমনি অস্বাভাবিক! ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখিয়াও যেন এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না! মনে হইতেছে, সেটা যেন বায়স্কোপের একটা আশ্চর্য্য দৃশ্য! নচেৎ যে বাঘ তিন তিন বন্দুকের গুলিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া স্বচ্ছন্দে লাফ মারিয়া হাতীর মাথায় থাবা বসাইতে ও হাওদায় কামড় দিতে পারে, সে যে কোন আক্কেলে, ওই জমাদারের খুদে কুক্‌রির মুখে শির-সমর্পণ করিল,—ভাবিয়া পাইতেছি না।

গোলাপ সিংহ লোকটা পদমর্য্যাদাতেও নিতান্ত ছোট। অল্পদিন মাত্র সে এ দেশে আসিয়াছে, এবং রাজসরকারের অধীনে হাতীশালার জমাদারী পাইয়াছে। সে নেপালী গোর্খা—উপাধি ঠাকুর রাজপুত, অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন লোক। তার শুভ্র প্রশস্ত ললাট, যোড়া ভ্রূ, তীক্ষ্ণ উন্নত নাসিকা সুগঠিত বলিষ্ঠ আকৃতি, অভিজাত বংশের সাক্ষ্য দিত এবং নিরক্ষর মূর্খ হইলেও তার চলিবার, বসিবার, দাঁড়াইবার, সেলাম লইবার ও দিবার ভঙ্গিগুলার মধ্যে এমন একটা গুরুগম্ভীর রাজকীয় ছন্দের আদব কায়দা প্রকাশ পাইত, যাতে তাকে নিতান্তই একজন হাতীশালার জমাদার বলিয়া চিনিয়া না রাখিলে হঠাৎ একজন বড়দরের সেনাপতি বলিয়া ভুল করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। লোকটা বয়স প্রৌঢ়।

শিকারী হাতীগুলার তদারকের জন্য সে আমাদের দলের সঙ্গে আসিয়াছিল, শিকারের জন্য আসে নাই। কিন্তু আজ সকালেও সকলের কাছে যার নাম অখ্যাত ছিল, হঠাৎ সন্ধ্যায় তা সুবিখ্যাত হইয়া গেল! অদৃষ্ট আর কাকে বলে! ভয়াবহ সঙ্কটের মুখে লোকটা অকস্মাৎ 'মোরিয়া' হইয়া যে ধরণের ক্ষমতাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের খেলা দেখাইয়াছে,—হাওদায় আরূঢ় মহারাজা ও সাহেববৃন্দের জীবন রক্ষার জন্য, লম্ফশীল বাঘের লেজ ধরিয়া যে ভাবে তার পিঠে চড়িয়া পাঁজরে কুক্‌রি হানিয়াছে তাতে সকলেই স্তম্ভিত! বিদেশী রাজপুরুষগণের পর্য্যন্ত প্রশংসা মুগ্ধ দৃষ্টির লক্ষ্য স্থল আজ—সে!

বাঘ মরিলে, বিপদ কাটিয়া গেলে সাহেবেরা যখন উল্লাস ভরে আনন্দধ্বনি করিয়া করমর্দ্দনের জন্য তার দিকে হাত বাড়াইলেন, তখন বাঘের থাবায় তার পায়জামা ছিঁড়িয়া উরুদেশ হইতে প্রবল বেগে রক্ত ছুটিতেছিল, কিন্তু সে দিকে সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। তৎক্ষণাৎ শিক্ষিত সৈনিকের মত রীতিমত মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন করিয়া, এমন প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত হাত বাড়াইয়া দিল, যেন—এরূপ সম্মানলাভে সে চির অভ্যস্ত এবং দৈহিক যন্ত্রণা বলিতে কোন বালাই তার নাই! স্নায়ুর উপর এই অসামান্য আধিপত্য দেখিয়া আমরা ত চমকিলাম, সাহেবেরাও বিস্মিত হইলেন! লোকটা সত্যই অদ্ভুত!

২

রাত্রে আহারের টেবিলে আমরা বাঙালী হোমরা চোমরার দল সমবেত হইয়া আজিকার কাণ্ড—তথা গোলাপ সিংহের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বলিলেন "সেই অবস্থায় এক মাত্র কুক্‌রি নিয়ে আমি যদি বাঘের মুখে পড়তুম, তাহলে 'চাণাচুর বাদাম ভাজা' ছাড়া আর কিছু হতে পারতুম কি না সন্দেহ!"

নিজের ক্ষীণ দেহের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলাম "আর আমি হলে ত নিঃসন্দেহে!"

আমাদের দলের মধ্যে সৌরেশ বাবু ছিলেন সেই শ্রেণীর ভদ্রলোক, কবির ভাষায় যাকে বলে "পরকীর্ত্তি অসহিষ্ণু!" তিনি নিজে একজন ভাল শিকারী বলিয়া গর্ব্ব করিতেন, কিন্তু চিড়িয়া শিকার ছাড়া আর কোন শিকারেই তাঁর হাত খেলিতে দেখি নাই! নিতান্ত অপ্রসন্ন ভাবেই তিনি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, এবার আর পারিলেন না। অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন "নাও বাপু, লোকটাকে নিয়ে তোমরা বেজায় বাড়াবাড়ি করে তুলেছ! বখশীসের লোভে ব্যাটা একটা বাঘ মেরেছে, তার হয়েছে কি?"

ডাক্তার বাবু স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী; তিনি এতক্ষণ কথা কহেন নাই, এবার একটু হাসিয়া বলিলেন;"বখশীসের লোভে যদি ওম্নি ভাবে প্রাণের মায়া ছেড়ে বাঘ মারা সহজ হয় সৌরেশ বাবু —তাহলে আপনি মারেন নি কেন? মহারাজা আপনারও অন্নদাতা, গোলাপ সিংহেরও অন্নদাতা,—অন্নদাতার জীবন রক্ষার জন্য জীবনের মায়া ত্যাগ করা সকলেরই উচিত ছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সে ধর্ম্মবুদ্ধিটুকুর মর্য্যাদা কে কতটা রেখেছিল হিসাব করুন ত!"

ডাক্তারের এই শ্লেষটুকু আমাদের সকলেরই চিত্তকে নাড়া দিল, কিন্তু সৌরেশ বাবু অটল! তিনি সদম্ভে বলিলেন "হ্যাঃ! জীবনের মায়া ত্যাগ করেছিল, না হাতী করেছিল!—কই মরে নি ত!"

ডাক্তার ধীরে বলিলেন "কিন্তু মরতে পারে! উরুর প্রান্তে যে ভাবে বাঘের নখ বসেছে, তাতে ভিতরে ভিতরে সেপ্টিক ধরে শীঘ্রই মারা যাবার ভয় রয়েছে। লোকটা অত্যন্ত তেজস্বী—শুধু দেহে নয়, মনেও! বাইরের দিকে সে বেশ সতেজ রয়েছে বটে, কিন্তু তার ভিতরের অবস্থা আমি বুঝেছি। যদিও তার কাছে মিথ্যে কথা বলে সাহস দিলাম, কিন্তু সে নিজেও টের পেয়েছে। হেসে বললে "ডাক্তার যতই বল, আমি বুঝতে পারছি, এ যাত্রা আমার আর রক্ষা নাই। যতক্ষণ আছি, চেষ্টা কর, কিন্তু এতেই আমাকে যেতে হাব!"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বলিলেন "পাহাড়ী প্রাণ বাবা! ওতে মরণ বাঁচন সবই সমান সয়!"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন হাঁ সমানই সয়!...সে বল্লে, "আমি দেখলাম, এ সঙ্কটে একটা প্রাণ উৎসর্গ না করলে মহারাজকে নিরাপদ করা যায় না! মহারাজের জীবন বহু মূল্যবান,—কিন্তু আমার জীবন অতি অল্পদামের। মরব জেনেই আমি বাঘের ওপর পড়েছিলাম। নিমক খেয়েছি, তার মান রাখ্‌ব না?

মন বলিয়া উঠিল—বাঃ! কিন্তু সৌরেশবাবুর ভয়ে চুপ করিয়া থাকিতে হইল!

জুনিয়ার ম্যানেজার বলিলেন "কর্ত্তা এত ঘায়েল হয়েছে, তবু গোঁয়ার্ত্তমি ঠিক আছে! ডাক্তার

ওষুধে কৌটো কতক ব্রাণ্ডি মেশাবে শুনেই একেবারে রুখে উঠেছে! বলে "খবরদার ডাক্তার, তাহলে তোমার ওষুধ ছোঁব না। মরতে ত বসেইছি এ অবস্থায় মদ খাইয়ে আমার দেহ আর অপবিত্র কোরনা, আমি বাবা পশুপতিনাথের সেবক, আমাকে শেষ সময়ে সদাচারে যেতে দাও!"—ব্যাটা গোঁড়ার হদ্দ!"

আমাদের টেবিলে তখন ইংরেজী কেতায় পাকস্থলীর কল্যাণের জন্য বোতল গ্লাস উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং সেই বিরুদ্ধবাদী অশিক্ষিত অজ্ঞান লোকটার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে উচ্চহাস্যে বিদ্রূপ করিয়া এমন বেপরোয়া সমালোচনা আমরা জুড়িলাম, যা জনসমাজে প্রকাশ করিবার মত নয়! কিন্তু ভিতরে ভিতরে সবাই বোধ হয়,—বিবেকের কশাঘাত অল্প বিস্তর পরিমানে পরিপাক করিলাম। কারণ সে রসিকতার দম বেশীক্ষণ রহিল না এবং সঙ্গে সঙ্গেই সকলে কিছু অন্যমনা হইয়া পড়িলাম।

হায় রে!..... গায়ের জোরে তাল ঠুকিয়া বিশ্বের সব-কিছু ভালকে ভ্যাংচাইলে যদি বিশ্ব জয় করা যাইত, তবে বিশ্বেশ্বরকে বোধ হয় আমরা এতদিন আন্দামানে নির্ব্বাসন দিতাম!

ডাক্তার অন্য প্রসঙ্গ পাড়িলেন। বলিলেন "লোকটার গায়ের কাপড় খোলবার পর দেখলুম সর্ব্বাঙ্গে অনেকগুলা বন্দুকের গুলির দাগ রয়েছে। লোকটা আগে কি করত জানেন?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বলিলেন "ও নিজে বলে 'পল্টনের বড় সাহেব-সুবোদের কাছে আর্দ্দালী ছিলাম।' কিন্তু গুজব শুনেছি, একসময়ে সরকারী পল্টনের বেশ একটা নামজাদা সিপাই ছিল। কোনও গুরুতর অন্যায় করায় চাকরী যায়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম "অন্যায়টা কি?"

তিনি বলিলেন "তা জানি না। লোকটা এদিকে নিরক্ষর মূর্খ হলেও আদব কায়দা বেশ সুন্দর জানে; ইংরেজিও বোঝে একটু, বল্‌তেও পারে। উচ্চারণ ঠিক সাহেবী ধরণের, আমাদের মত কেতাবী' গৎ নয়!"

৩

পরদিন সকালে উপর হইতে পরোয়ানা আসিল,—আমায় আহত হস্তী, মাহুত, এবং গোলাপ সিংহকে রাজধানী অর্থাৎ সহরে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। সেখানে সরকারী চিকিৎসাগারে তাদের জন্য যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। আজই বাহির হইতে হইবে।

পাহাড় জঙ্গল ভাঙ্গিয়া দুই তিন দিনের পথ অতিক্রম করিতে হইবে, সুতরাং তদনুযায়ী যাত্রার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম। রসদ সংগৃহীত হইল, আহতদের শুশ্রূষার জন্য ড্রেসার কম্পাউণ্ডার ঔষধ পত্র, ডুলি খাটুলি যোগাড় হইল, জিনিষপত্র বহিবার কুলি আসিল,—সব স্থির করিয়া

ডেরাডাণ্ডা তুলিতেছি, এমন সময় আবার পরোয়ানা উপস্থিত! অবসর সময়ে ব্যাধ বাহাদুর-গণের চিত্তবিনোদনের জন্য যে বাইজী ঠাকুরাণীগণ নাচগান করিতে আসয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন পীড়িতা,—সুতরাং তাঁকেও সহরে পৌছাইয়া দিতে হইবে। বলা বাহুল্য তাঁর সারেঙ্গী প্রভৃতি সঙ্গীরাও সঙ্গে যাইবে।

আদেশ পাইয়া চক্ষুঃস্থির! রাগ করিয়া ডাক্তারকে বলিলাম "আপনি মেডিকেল সার্টি-ফিকেট ঝাড়্বার আর সময় পেলেন না? ঠিক আমাদের বেরুবার মুখেই তোপ দাগে! কেন, আমরা বিদেয় হবার পর অসুখটা মঞ্জুর করলে হোত না?

ডাক্তার স্মিতমুখে বলিলেন "সামান্য রক্তামশায় ও-তো পথে যেতে যেতেই ভাল হয়ে যাবে। তারপর ঠুংরি খাম্বাজ শুন্তে পাবে, মন্দ কি?

ঠুং'রি খাম্বাজের নিকুচি করিয়াছে! এ দুর্গম পথে এ ঝামেলা অত্যন্তই দুঃসহ! তাছাড়া আমি বিংশ শতাব্দীর অঙ্কে আবির্ভূত হইলেও এবং চাকরীর খাতিরে, এই অমার্জ্জিত প্রকৃতি, উচ্ছৃঙ্খলতাপ্রিয় প্রভু গোষ্ঠির সঙ্গে কারবার করিতে বাধ্য হইলেও, এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের সংশ্রব পছন্দের চোখে দেখিতাম না। আমার এই শুচিবায়ুগ্রস্ততার জন্য, ঠাট্টা বিদ্রূপের অত্যাচার যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করিতে হইত কিন্তু উপায় নাই! আমার রুচি স্বতন্ত্র!

কিন্তু রুচি অরুচির কাম যেখানে চলে চলুক, চাকরীর কাছে চলে না। চাকর, চাকরই! —অগত্যা উপরের হুকুম তামিল করিতে হইল।

দুর্গা বলিয়া বাহির হইলাম। সর্দ্দারীর দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া সমস্ত পথ আহত হাতী, মাহুত, গোলাপসিংহ এবং পীড়িতা বাইজীর সংবাদ লইতে সমানভাবে চোখ কাণ খাড়া রাখিতে হইল। আমার সৌভাগ্যবশে পথের মধ্যে পীড়িতদের কাহারও কোন নূতন উপসর্গ দেখা গেল না। দিনটা নিরাপদে কাটিল।

শীতের বেলা দেখিতে দেখিতে ফুরাইল। সন্ধ্যার পর একটা গ্রামের প্রান্তে তাঁবু ফেলিয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা করা গেল। রাত্রের জন্য সকলের যথোপযুক্ত আহারও বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া, পীড়িতদের আর এক দফা দেখিয়া শুনিয়া নিজের তাঁবুতে ঢুকিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবেই নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি, কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছি—সর্দ্দারের সর্দ্দারীর উপর আর একজনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ উদ্যত হইয়া সর্ব্বক্ষণ পাহারা দিয়াছে—সে গোলাপসিংহ! নিজের ডুলির মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া সে নীরবে সর্ব্বক্ষণ তার রুদ্রাক্ষের মালা জপিতেছে, ক্ষত যন্ত্রণার জন্য কোন সাড়া শব্দ তার নাই, যখনই কুশল জিজ্ঞাসা করা যাক, মাথা নাড়িয়া নীরবে জানাইতেছে,—ভাল' এই পর্য্যন্ত! কিন্তু সে চোখ বুজিয়াই থাক্, আর খুলিয়াই থাক্, তার লক্ষ্য যে আমার,—শুধু আমারই বা বলি কেন, দলের ছোকরা ড্রেসার কম্পাউণ্ডারদের

বাচালতার উপর পর্য্যন্ত ঠিক স্থির আছে, তা স্পষ্ট বুঝিয়াছি। বাইজীর কুশল জিজ্ঞাসার জন্য পথে আসিতে আসিতে যখনই কেহ তার ডুলির পাশে ঘোড়া থামাইয়াছে, তখনই সে নিজের ডুলি হইতে ঘাড় উচাঁইয়া অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে প্রশ্ন-কারককে লক্ষ্য করিয়াছে। আমি নিজেও সে দৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাই নাই, তাতে যুগপৎ লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়াছি, মনে মনে বলিয়াছি—'ওহে বাপু, আমাকে এতটা অপদার্থ ঠাওরাইও না। যদি তেমটা 'বখা' হইতাম, তবে এতদিন মরিয়া ভূত হইয়া হাওয়ায় মিশিয়া যাইতাম। তোমাদের তত্ত্বাবধানের জন্য সশরীরে এখানে বর্ত্তমান থাকিতাম না।'

কিন্তু যে লোকটা নিতান্তই অধীনের অধীনস্থ, তাকে মুখ ফুটিয়া এতগুলা কথা বলা চলে না। কাজেই বিরক্ত চিত্ত মৌন গম্ভীর থাকিতে হইয়াছে।

তাঁবুতে হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছি, একজন ছোকরা কম্পাউণ্ডার আসিয়া বলিল "বাইজী সেলাম দিয়েছে, একবার আপনার দর্শন চায়।"

বলিলাম "কি দরকার তুমি জেনে এস বাপু।"

ছোকরা চলিয়া গেল, এবং গেল যে, তা সেই পথ!...আধঘণ্টা পার হইল, অথচ তার দেখা নাই। তিনটা সিগারেট ভস্ম করিলাম, তবু বাইজীর দরকারের সন্ধান পাইলাম না। এখন কি করা যায়?

মন বলিল কর্ত্তব্য,—কর্ত্তব্যই!

অগত্যা নিজেই সন্ধান লইতে উঠিলাম। আমার তাঁবুর পাশেই গোলাপ সিংহের তাঁবু। তাঁবুর দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইলাম, সামনেই খড়ের বিছানায় শুইয়া সে চোখ বুজিয়া মালা জপিতেছিল। আমায় দেখিয়া অভিবাদন করিল। বলিলাম "এখন কেমন আছ জমাদার?"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কি একটা রাত্রিচর ছোট পাখী সাঁ করিয়া আমার মাথার পাশ দিয়া উড়িয়া তাঁবুতে ঢুকিল, পরমুহূর্ত্তে ঝট্‌পট্ করিয়া উড়িয়া আবার বাহির হইয়া গেল, যাইবার সময় আমার হ্যাটের উপর একটা ঝাপ্টা হানিয়া পলাইল! আমি 'আঃ' বলিয়া মাথা নোয়াইলাম।

আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলিয়া গোলাপ সিংহ বলিল "ওট কি? চামচিকা?"

বলিলাম "কি জানি, তা হতে পারে।"

অন্যমনস্ক ভাবে সে বলিল "চামচিকার স্পর্শ ভাল নয়।"

বিদ্রূপভরে বলিলাম "কি হয়? মরে যায়?"

সে একটু হাসিল, উত্তর দিল না। বিদ্রূপের রোখ চড়িয়া গেল, বলিলাম "হাঁচি, টিকটিকি, চামচিকে, গিরগিটি তুমিও তাহলে মান?"

সে ধীরভাবে বলিল "পরিণামদর্শী মাত্রেই মানে। যাক, এখন কোথায় যাচ্ছেন?

উত্তরে জানাইলাম তাহাদেরই খোঁজ তল্লাসে বাহির হইয়াছি। তার যন্ত্রণা কিরূপ, রাত্রের আহার হইয়াছে কি না, ক্ষুধা কিরূপ নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে উত্তর দিল।

কথা চলিতেছে, দূরে চট্‌পট চটিজুতার আওয়াজের সঙ্গে গুণ গুণ গানের সুর শোনা গেল!

"আমার মাথা ন্যাড়া করে দাও হে তোমার
ধারালো রূপের ক্ষুরে
কাল কোঁকড়ানো চুল হে আমার
চেঁচে ফেলে দাও দূরে।"

চাপা আওয়াজ হইলেও তাতে উৎসাহ-মত্ততার অভাব ছিল না। স্বরে চিনিলাম,—সেই ছোকরা কম্পাউণ্ডার! মনে মনে বলিলাম "আমিই তোমার মাথা ন্যাড়া করিব, আগাইয়া এস বাপু!"

গোলাপ সিংহ অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল "হুজুর, স্পর্শদোষ বিচারটা অনেকে অলীক কুসংস্কার বলে মনে করেন, নয়? স্থূল স্পর্শ দূরে থাক, একটা নটীর বাতাসের প্রভাব স্পর্শে এই ছোকরার দল কি রকম উদ্‌ভ্রান্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করেছেন কি? এদের এই মত্ততার পরিণাম,—এদের দেহ মন আত্মার সমস্ত কল্যাণ, কোন নিরুদ্দেশের ঠিকানায় যে পাঠাবে, তা এরা জানে না। আপনি এদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী, আপনি এদের সংযত করুন, আমার অনুরোধ!"

তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা মর্ম্মান্তিক কাতরতা ধ্বনিত হইল যে, অবাক হইয়া তার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

ছোকরা ততক্ষণে তাঁবুর কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, দুয়ারের সামনেই আমাকে দেখিয়া থতমত খাইয়া "এই যে! আপনি এখানে?"—বলিয়া দাঁড়াইল!

গম্ভীর ভাবে বলিলাম "হুঁ, তুমি ত আচ্ছা ডুব মেরেছিল! তাঁর খবর কি?"

ছোকরা সঙ্কুচিত ভাবে একবার গোলাপসিংহের দিকে চাহিল। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল অনুগ্রহ করে একবার এদিকে আসুন, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

বাহিরে গিয়া তাঁবুর আড়ালে দাঁড়াইলাম, সে চুপি চুপি বলিল "বাইজী বললেন আপনি গিয়ে যদি বসেন, তাহলে একটু সঙ্গত বসায়। দু চারটে বৈঠকী গানটান—"

আমি সঙ্গীত ভক্ত এবং বয়সে প্রবীণ নহি, ইহা সত্য। কিন্তু তা হইলেও স্থান কাল পাত্রের বিচার ভুলিয়া আমোদে মত্ত হওয়া পছন্দ করি না। উপরওলাদের খাতিরে হা জরা সহি করিবার জন্য—না হয় বাইজীর গানের আসরে আবির্ভূত হই, তা বলিয়া এই অসুস্থ গুলির দায়িত্ব স্কন্ধে থাকিতে এখানে এমন অসময়ে নিজের খুসীর খাতিরে 'ভেড়ার গোয়ালে' আগুন লাগাইব? তার উপর গোলাপ সিংহের অনুরোধ মনে পড়িল। গম্ভীর হইয়া বলিলাম "মা লক্ষ্মী আছেন কেমন?"

আমার বিশেষণের বহর দেখিয়া সে থতমত খাইল। বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টি তুলিয়া বলিল "আজ্ঞে?"

কথাটার পুনরুক্তি করিয়া বলিলাম "বাইজী ভাল আছেন ত? তাঁকে বিশ্রাম করতে বলো, এ সময় গান বাজনা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নয়। আর তুমি ওষুধ পত্র নিয়ে ড্রেসারদের সঙ্গে করে একবার এস, হাতীটার ঘা রাত্রেই ড্রেস করে রাখা যাক। নইলে সকালে বেরুতে দেরী হবে।"

ছোকরার মুখের উৎসাহ প্রদীপ্ত আনন্দের আলো এক মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল! কোথায় বাইজীর বৈঠকী গান, আর কোথায় আহত হাতীর ক্ষত পরিচর্য্যা!—আশা করি ছোকরা মনে মনে আমার সদ্য স্বর্গলাভ কামনা করিল! মুখ আঁধার করিয়া সে চলিয়া গেল। আমিও হাতীর উদ্দেশে চলিলাম।

৪

হাতীর ক্ষত পরিচর্য্যা সমাধা হইল। দলবল লইয়া ফিরিতেছিলাম, তাঁবুর কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, হঠাৎ অসাবধানে বিষম হোঁচট খাইয়া, আছড়াইয়া পড়িলাম! হাতে একটা ঔষধের বোতল ছিল, সেটা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া হাঁটুর চারিপাশে বিঁধিয়া গেল, প্রবল বেগে রক্তস্রোত ছুটিল!

সকলে ধরাধরি করিয়া আমাকে তাঁবুর মধ্যে আনিল, ক্ষতস্থান ধুইয়া মুছিয়া ঔষধ পত্র দিয়া যথারীতি ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিল। সারারাত বিনিদ্র নয়নে যন্ত্রণার আরাম উপভোগ করিলেন, রাত্রিচর পাখীর স্পর্শ ও গোলাপসিংহের বাণী মনে পড়িল। লোকটার উপর শ্রদ্ধা বাড়িল।

সকালে উঠিয়া আবার যাত্রা সুরু হইল। এবার ঘোড়া ছাড়িয়া খোঁড়া পায়ে ডুলিতে আশ্রয় লইলাম। পথের মধ্যে গোলাপ সিংহের জ্বর বাড়িয়া উঠিল, তার দিকে সতর্ক মনোযোগ রাখিতে হইল। আমার সেবা যত্নে সে কুণ্ঠিত হইল, কৃতজ্ঞ হইল, বাবা পশুপতিনাথের নিকট বার বার আমার জন্য কল্যাণ কামনা করিল।

সন্ধ্যায় আবার তাঁবু পড়িল। আহত হাতী ও মাহুত ভাল আছে, আমার পায়ের যন্ত্রণাও তখন কমিয়াছে। কিন্তু গোলাপ সিংহ বে-এক্তার হইয়াছে! বুঝিলাম তাকে 'কালে' ধরিয়াছে, মনটা খারাপ হইয়া গেল। আসন্ন-মৃতের জন্য প্রাণটা সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল।

যথাসাধ্য সব কর্ত্তব্য পালন করিয়া শয্যা লইলাম। দিনে ডুলিতে আসিতে আসিতে বেশ খানিক ঘুমাইয়াছিলাম, তাতেই গত রাত্রের অনিদ্রার গ্লানি কাটিয়া গিয়াছিল। সহজে ঘুম আসিল না। শয্যায় পড়িয়া নানা কথা ভাবিতেছি, পাশের তাঁবু হইতে গোলাপ সিংহের মৃদু কাতরানি কাণে গেল। ঘুম যখন হইতেছে না, তখন লোকটাকে একবার দেখিয়া আসা যাক।

উঠিলাম। রক্ষী সৈন্যরা জাগিয়াছিল, তাহাদের এক জনের সাহায্যে খোঁড়া পা লইয়া তার তাঁবুতে ঢুকিলাম।

সে চাহিয়া দেখিল, অভিবাদন করিয়া বলিল "আপনি এসেছেন। আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।"

বসিলাম। বলিলাম "বল।"

সে বলিল "কাল আমরা শহরে পৌছাব। পৌছেই আমার ছেলেকে আসবার জন্য একখানা টেলিগ্রাম করে দেবেন।"

পকেট হইতে পেন্সিল ও নোটবুক বাহির করিয়া তার ছেলে শম্ভু সিংহের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইলাম এবং প্রতিশ্রুতি দিলাম, শহরে পৌছিয়া সর্ব্বাগ্রে টেলিগ্রাম পাঠাইব।

সে যখন অনেকটা সুস্থ হইল তখন আপনা হইতে পরিচয় দিল যে তার ছেলে 'আংরেজি' শিক্ষিত। নেপাল সরকারের অধীনে 'কাঠমুণ্ডু'তে কি একটা চাকরী করে। তার বিবাহ হইয়াছে, সম্প্রতি একটি সন্তান হইয়াছে। সেই গোলাপ সিংহের একমাত্র পুত্র। ছেলেটি বড় ভাল।

জিজ্ঞাসা করিলাম "বাড়ীতে আর কে আছে? তোমার মাতা, স্ত্রী,—"

সে মাথা নাড়িয়া নিঃশব্দে জানাইল—'সবাই আছে।' কিন্তু আর কাহারও সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। তার যন্ত্রণা আবাব অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল' সে অধীর হইয়া পড়িল।

যদি ঘা ধোয়াইয়া দিলে যন্ত্রণার কিছু লাঘব হয়, সেই ভরসায় ড্রেসার কম্পাউণ্ডারদের ডাকিয়া পাঠাইলাম।

বসিয়া বসিয়া তার যন্ত্রণাভোগ দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ সে চোখ মেলিয়, চাহিল, সনিশ্বাসে বলিল "বাবু সাহেব ঢের কষ্ট করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবে না। অকালে আয়ুক্ষয় করবার মত, দারুণ পাপানুষ্ঠান করে রেখেছি, তার ফল আমায় ভোগ করে যেতেই হবে। দেখুন কি শাস্তি!"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল "পুঁটুলি বেঁধে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে জন্মজন্মান্তর ধরে ভোগ করার চাইতে—এইখানেই সজ্ঞানে একেবারে শাস্তিভোগ শেষ করে যাওয়াই ভাল। যা হচ্ছে বেশ ভালই হচ্ছে। হাঁ, আর একটা কথা শম্ভু এসে পৌছান পর্য্যন্ত যদি জীবিত না থাকি, তবে তাকে বলবার জন্য গোটাকতক কথা আপনার জিম্মায় গচ্ছিত রেখে যাই, তাকে বলতে পারবেন?"

বুক কাঁপিয়া উঠিল, কে জানে কি কথা!—আত্মদমন করিয়া বলিলাম "পারব, বল।"

সে বলিল "প্রথম কথা, আমার মৃত্যু সংবাদ আমার মাকে জানিয়ে যেন বলে, সতীবাক্য আমার জীবনে সফল হয়েছে, বাঘের থাবাই আমার মৃত্যুর কারণ হোল, তাঁকে প্রণাম জানিয়ে

আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি। দ্বিতীয় কথা,—শম্ভু তার বিমাতাকে যেমন সম্মান করে মাথায় তুলে নিয়েছে, চিরদিন যেন তেম্নি সম্মান করে মাথায় রাখে। তিনি নির্দোষ!—"

বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া বলিলাম "তোমার দুই বিবাহ ?"

মাথা নাড়িয়া সে চোখ বুজিল। দু' ফোঁটা অশ্রু তার চক্ষুপ্রান্ত বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। ভাবগতিক দেখিয়া আর প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না, নির্ব্বাক রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে কষ্টে আত্মদমন করিয়া সে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ-পীড়িত কণ্ঠে বলিল "বাবু সাহেব, শয়তানের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে কখনো পরস্ত্রীর দিকে কুৎসিত কামনার দৃষ্টিতে চাইবেন না। তাতে যে শুধু মানসিক অধোগতি মাত্র লাভ হবে, তা নয়। জীবন অভিশপ্ত হয়ে যাবে! পরস্ত্রীকে পাপ ভাবে স্পর্শ মাত্রেই আয়ুঃক্ষয়—সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অধোগতিও অনিবার্য্য, এ শুধু শাস্ত্রের কথা নয়! সচেতন অনুভবশক্তিশীল, বিবেকনিষ্ঠ মানুষের জীবনে এটা পরীক্ষিত সত্য!"

আর কথা হইল না। ড্রেসাররা আসিয়া ক্ষত পরিষ্কার করিতে বসিল। সে কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাবহ দৃশ্য!

কায শেষ হইল, ড্রেসাররা তাকে ঘুমের ঔষধ খাওয়াইয়া চলিয়া গেল। যন্ত্রণার প্রথম বেগটা সামলাইয়া, সে একটু সুস্থ হইল, আমিও বিদায় লইয়া উঠিলাম।

গোলাপ সিংহ শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিয়া করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া দিল। এদিকে নিরক্ষর হইলেও সৌজন্য শিষ্টাচার তার যথেষ্ট ছিল।

করমর্দ্দন করিয়া সহানুভূতি-সিক্ত করুণ কণ্ঠে বলিলাম এখনো কি যন্ত্রণা হচ্ছে ?"

"খুব।" নমস্কার করিয়া সে রুদ্রাক্ষের মালাটি জপ করিবার জন্য তুলিয়া লইল। শুষ্ক বিবর্ণ মুখে ম্লান হাসি টানিয়া বলিল "পরিণামদর্শী হতে শিখুন বাবু সাহেব! এ জগতে প্রত্যেক কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী!...... হবে না যন্ত্রণাভোগ! শয়তানের প্রলোভনে, ইন্দ্রিয় সুখের জন্য দেহে উৎকট পাপানুষ্ঠান করেছি। দেখুন, সেই দেহের উৎকট শাস্তি যন্ত্রণাভোগ!"

উঠিয়াছিলাম, তার কথা শুনিয়া আবার বসিয়া পড়িলাম। আরও কথা শুনিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তে সে মালাশুদ্ধ হাত যুক্ত করিয়া সবিনয়ে বলিল "ক্ষমা করুন, এবার আমায় একা থাকতে দিন। বলবার কথা হয়ত অনেক ছিল—কিন্তু বলার সময় আর নাই। জীবনীশক্তি শেষ হয়ে আসছে; যতক্ষণ জ্ঞান আছে, পৃথিবীর সব চিন্তা ভুলে ভগবানের নামে আমাকে একান্তভাবে মনোনিবেশ করতে দিন।"

হৃদয়ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। ভগবানের চরণোদ্দেশে তার মঙ্গল কামনা জানাইয়া নীরবে উঠিয়া আসিলাম।

৫

শহরে পৌঁছিলাম। রাজকীয় হাঁসপাতালে তাদের যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, শম্ভুসিংহের নামে জরুরী টেলিগ্রাম পাঠাইয়া বাসায় ফিরিলাম। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর আসিল, খোঁড়া পা বিষাইয়া উঠিল। তিন চার দিন শয্যাত্যাগ করিতে পারিলাম না।

গোলাপ সিংহের খবর পাইতেছিলাম,—অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইতেছে। সেদিন রাত্রে হাসপাতালের ডাক্তার আমাকে দেখিতে আসিয়া সংবাদ দিয়া গেলেন শম্ভুসিংহের টেলিগ্রামের উত্তর আসিয়াছে, সে আজ রাত্রে আসিয়া পৌঁছিবে। কিন্তু গোলাপ সিংহের অবস্থা আজ অত্যন্ত খারাপ, রাত্রি কাটে কি না সন্দেহ!

মাথা ঘুরিয়া গেল। হায়, অদৃষ্ট! এমন পাকচক্রে জড়াইয়া কাবু হইয়া পড়িলাম যে শেষ সময়ে নির্ব্বান্ধব অভাগাকে একটু দেখাশুনা করিতেও পারিলাম না। অশান্তিভরে কোন রকমে রাত্রিটা কাটাইয়া সকালেই হাঁসপাতালে ছুটিলাম, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে! রুদ্রাক্ষের মালাধৃত ডান হাতটী বুকের উপর রাখিয়া গোলাপসিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত, তার পায়ের কাছে বসিয়া এক সুন্দর প্রিয়দর্শন নেপালী যুবক চোখের জল মুছিতেছে।

শুনিলাম সেই শম্ভুসিংহ। পিতার মৃত্যুর অল্পক্ষণ পূর্ব্বে সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন পিতার বাক্‌রোধ অবস্থা; ভিতরে জ্ঞান ছিল, পুত্রকে চিনিতে পারিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভগবানের নাম শুনাইতে ইঙ্গিত করেন। তার পর পুত্রের মুখে নাম শুনিতে শুনিতে জপমালাধৃত হাতটি বুকের উপর তুলিয়া শান্তভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

বুঝিলাম, আমার কর্ত্তব্য গোলাপ সিংহ আমার জন্যই রাখিয়া গিয়াছে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথারীতি শেষ করা হইল। শোকার্ত্ত শম্ভুসিংহকে লইয়া নিজের বাসায় আসিলাম।

সে একটু শান্ত হইলে নিভৃতে তাহাকে ডাকিয়া তাহার পিতার মন্তব্য জানাইলাম। শম্ভু নীরবে শুনিল, নীরব রহিল। শুধু তার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সসঙ্কোচে বলিলাম "আমার অনধিকার চর্চ্চার অপরাধ ক্ষমা কর ত, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, —তোমার বিমাতা কি—?" প্রশ্নটা শেষ করিতে মুখে আটকাইয়া গেল।

শম্ভু আমার মুখের দিকে চাহিল। মাথা নাড়িয়া বলিল "না, তিনি আমার পিতার বিবাহিতা স্ত্রী নন। তবু তিনি আমার মা, তাঁর জীবনের ইতিহাস বড় বিষাদবহ। তিনি আমাদেরই স্বজাতীয়া, সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীর কন্যা। বিবাহও তাঁর সদ্বংশে শিক্ষিত রূপবান যুবকের সঙ্গে হয়েছিল। কিন্তু বিবাহিত জীবন সুখের হওয়া দূরে থাক,—বড় অত্যাচার যন্ত্রনাপীড়িত হয়েছিল। রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি সব সত্বেও তাঁর স্বামীর মন ছিল বড় কদর্য্য, প্রকৃতি ছিল হিংস্র নিষ্ঠুর নির্ম্মম।

সৌন্দর্য্যেও তিনি—সন্তান আমি, মাতৃরূপের কি আর পরিচয় দেব? রূপে মা আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। সেই সৌন্দর্য্যই তাঁর জীবনের অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কদর্য্য সন্দিগ্ধ-চেতা স্বামী, সেই সৌন্দর্য্যের জন্যেই সর্ব্বদা তাঁর নিষ্পাপ তেজস্বী চরিত্রকে সন্দেহ করতেন এবং অলীক সন্দেহে উত্তেজিত ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে সর্ব্বদাই তাঁকে নিষ্ঠুর ভাবে নির্য্যাতন করতেন।

তাঁর স্বামী ও শ্বশুর মীরাটে সরকারী গোর্খা পল্টনে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, তারা তখন সপরিবারে সেখানে বাস করতেন। পিতাও সরকারী পল্টনের পনের ষোল বৎসরের পুরাতন বিশ্বাসী কর্ম্মঠ সিপাহী। বুয়র যুদ্ধে, চীনা যুদ্ধে কাজ দেখিয়ে তিনি সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছিলেন। ভাগ্য দোষে তিনিও সেই সময়ে মীরাটে বদলি হন। প্রতিবেশী কন্যার প্রতি অত্যাচারের কথা কাণে উঠ্‌তেই তাঁর তেজস্বী বীর চিত্ত অশান্তি উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তিনি তাঁর স্বামীকে কাপুরুষোচিত অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন, ফলে হিতে বিপরীত ঘটে। তাঁর এই অযাচিত পরহিতৈষিণা বৃত্তি সন্দিগ্ধচেতা কাপুরুষকে অধিকতর হিংস্র বর্ব্বরতায় মাতিয়ে তোলে, মেয়েটির ওপর নির্য্যাতন অত্যন্তই বেড়ে ওঠে!

অত্যাচারে অতিষ্ঠ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্যা বালিকা পালিয়ে এসে পিতার কাছে আশ্রয়প্রার্থিনী হন নেপালে তাঁর পিত্রালয়ে তাঁকে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেন। পিতা সেই সময়ে আইনের সাহায্যে যদি তাঁকে রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন তবে বোধ হয় সব দিকেই ভাল হোত, কিন্তু সে বুদ্ধি তাঁর হয় নি। নিজের দায়িত্বেই তাঁকে রক্ষা করতে উদ্যত হলেন, পল্টনের চাকরীর নিয়ম লঙ্ঘন করে বিনা ছুটিতে তদ্দণ্ডেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিত্রালয়ে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন।

এ রকম অবস্থায় সাধারণতঃ লোকে যা করে থাকে তিনিও তাই করেন। পথে সর্ব্বত্রই তাঁকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দেন। নেপালের নির্জ্জন দুর্গম পথে চলবার সময় বালিকার রক্ষার জন্য অনেকসময় পরস্ত্রী সম্বন্ধীয় সাধারণ দূরত্বের ব্যবধানও তাঁকে লঙ্ঘন কর্‌তে হয়। বাক্য ব্যবহারের এই সব অনাচার, সম্ভবতঃ তাঁর নৈতিক বুদ্ধি ও সংযম পূত উন্নত মনকে মোহাবিষ্ট কলুষিত করে। তারপর—সন্তান আমি, কি আর বল্‌ব? সংযমী চরিত্রবান পিতার ভ্রান্তি ঘটে, সয়তান তাঁর স্কন্ধে ভর দিয়া এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে—"

মাথা হেঁট করিয়া সে নীরব হইল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ব্যথিত কণ্ঠে সে বলিল "জানি না বাবু কার কতখানি দোষ! তবে লক্ষ্য করেছি বিমাতা চিরজীবন পিতাকে বিজাতীয় ঘৃণা করে এসেছেন। কখনো তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন না। থাক সে কথা—তারপর তাঁরা দেশে পৌঁছালেন। সমাজের ঘৃণা এবং আইনের দণ্ড তাঁর মাথার উপর উদ্যত হোল। পলাতক সিপাহী হিসাবে গবর্ণমেণ্টের আদেশে তিনি অবিলম্বে ধৃত হলেন, দণ্ডিত হলেন, চাকরী গেল। বিমাতাকে তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা গৃহে স্থান দিতে অস্বীকৃত হলেন। সমাজের নিন্দা ঘৃণার তীব্র উপদ্রব, তীব্রতর হয়ে উঠল, অশান্তি-পীড়িতা পিতামহী অভিশাপ দিলেন,—'যে দেহের দ্বারা

হের ঐ ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়ে কাঙালিনী মেয়ে—রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী ৺যোগেশচন্দ্র শীল

পিতা পরস্ত্রীর পবিত্রতা নাশকারী পশুকীর্ত্তির অনুষ্ঠান করেছেন, সে দেহ যেন অকালে পশু দ্বারাই ধ্বংস হয়ে তাঁর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে।'

পিতামহীর অভিশাপ পিতার জীবনে সফল হয়েছে তবুও বীরধর্ম্মী তিনি, আর্ত্তরক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জ্জন করেছেন, এটুকুও আমাদের পক্ষে মহৎ সান্ত্বনা। বীর তিনি, বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যুলাভ করেছেন ; অভিশাপ তাঁর আশীর্ব্বাদ হয়েছে সত্যই !—"

সে অন্যমনস্কভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার বিমাতা এখন কোথা ?"

শম্ভু সিংহ উত্তর দিল "তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত,—কাযেই আমাকে তাঁর সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। মাতা এবং পিতামহীকে শান্ত করে তাঁকে, আমার দ্বিতীয়া জননী—আমাদেরই পরিবারভুক্ত স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু পিতা গবর্ণমেণ্টের দণ্ড থেকে পরিত্রাণ পেয়ে সেই যে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, আট বৎসরে আর গৃহে ফেরেন নি। অনেক চেষ্টার পর সন্ধান পেয়ে গত বৎসর দিল্লীতে গিয়ে তাঁকে ধরেছিলাম, বাড়ী ফেরাবার জন্য ঢের চেষ্টা করেছিলাম, বললেন "এ মুখ আর কাউকে দেখাব না। তুমি ফিরে যাও, আমার মায়ের আর তোমার মায়েদের ভার তোমার ওপর রেখেছি, তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন করগে। তার পর পুনশ্চ সাক্ষাতের অনিচ্ছাতেই বোধহয়,—সেই রাত্রেই দিল্লী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। তারপর, আর তাঁর কোন খবর পাই নি।—পেলাম একেবারে এই টেলিগ্রামের সংবাদ, হোল একেবারে এই শেষ সাক্ষাৎ !"

দুঃখিত হইয়া বলিলাম আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় অল্প, তবু বোধহল, নিজের ভুলের জন্য তিনি জীবনে দারুণ অনুশোচনা ভোগ করেছেন।"

শম্ভু সিংহ বলিল "নিরক্ষর হলেও সাধারণ নৈতিকবুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান তাঁর যথেষ্ট ছিল। জ্ঞানীর হৃদয়ে বিবেকের তাড়না বড় তীব্র বাবুসাহেব, বড় তীব্র !"—

নিয়তি

শ্রীবিজনবালা কর

আশ্বিন মাস। বেলা অপরাহ্নের শেষ; নিবিড় বাঁশবনের উন্নত শীর্ষে অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিম রশ্মি পড়িয়া ঝিক্ ঝিক্ করিতেছিল।

প্রাঙ্গণ হইতে বর্ষার জল নামিয়া গিয়াছে। পথ ঘাট মাঠ তখনও সব জল-মগ্ন। খাল, বিল, নদী সরোবর সব একাকার হইয়া মিশিয়া আছে। আসন্ন সন্ধ্যার নীল ছায়া বুকে ধরিয়া সেই বিস্তৃত জলরাশি মৃদু তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল।

ক্ষুদ্র একখানি বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গনে বসিয়া একজন বৃদ্ধা সন্ধ্যার দীপ গুছাইতেছিল।

ছোট ছোট নৌকা ও ডিঙ্গি লইয়া লোকজন সর্ব্বদা জলপথে যাতায়াত করিতেছে; কাজ করিতে করতে বৃদ্ধা উদ্বিগ্নভাবে পুনঃ পুনঃ তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

বছর পাঁচেকের একটী ফুট্‌ফুটে ছোট্ট বালিকা ভিতরের দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধার গলা জড়াইয়া ধরিল;—"দাদী, দাদী—ভারি চালাকি নয়? তুই যে বল্‌ছিলি বাবা সন্ধ্যার সময় আস্‌বে, কৈ আস্‌চে? সন্ধ্যা হয়ে এলো যে?

মাটীতে হাতের ভর রাখিয়া বৃদ্ধা নাত্‌নীর ধাক্কা সামলাইল তার পর তাহাকে সামনের দিকে টানিয়া আনিয়া কোলের কাছে বসাইয়া ছোট্ট সুবঙ্কিম কপোলের উপর ঝুলিয়া পড়া বিশৃঙ্খল চুলগুলি গুছাইয়া দিতে দিতে আদর করিয়া বলিল—"আস্‌বে আস্‌বে, এক্ষুনি আসবে। আমার ডালিম বিবির জন্যে রাঙা কাপড় আন্‌তে গেছে কিনা! তাই দেরী হচ্চে।"

পিতামহীর কথা শুনিয়া আনন্দে বালিকার চক্ষু দুইটি সন্ধ্যা তারার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া হাত তালি দিয়া বলিল—"বা, বা! রাঙ্গা কাপড় আনবে! আমি রাঙ্গা কাপড় পরবো! বেশ হবে, না? মাকে বলিগে যাই।"—

বৃদ্ধা নাতিনীকে ধরিয়া আবার বসাইল। বলিল "পাগলী কোথাকার! মাথার এমন ছিরি নিয়ে রাঙা কাপড় পরলে পেত্নীর মত দেখাবে যে। ভাল করে চুল বেঁধে দিই, তবে তো বাবা খুসী হয়ে রাঙা কাপড় পরিয়ে দেবে?"

অগত্যা দুরন্ত বালিকা স্থির হইয়া বসিল। চিরুণীর প্রয়োজন কিছু বেশীরকম থাকিলেও খেয়ালী নাতনীটির মত পরিবর্ত্তনের আশঙ্কায় পিতামহী উঠিয়া যাইতে পারিল না। আঙ্গুলের সাহায্যেই চুলের জটগুলি ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

একখানি নৌকা আসিয়া সম্মুখের ঘাটে লাগিল। আরোহী লাফ দিয়া নামিয়া পড়িয়া নৌকা বাঁধিতে লাগিল। সস্নেহ ব্যগ্রকণ্ঠে মাতা প্রশ্ন করিল—"এলি বাপ জান, এত দেরী হলো কেন ?

ডালিম ছুটিয়া গিয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিল। ফুটন্ত ফুলের মত হাসি মুখখানি তুলিয়া বলিল—"আমার রাঙ্গা কাপড় কই বা-জান ? দাও আমি পরবো।"

"এনেছি—দিচ্ছি।" বলিয়া কন্যার হাত ধরিয়া স্কন্ধ লুণ্ঠিত সুবিন্যস্ত বাবরী কাটা চুল, সুদীর্ঘ সুদৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ সমীরউদ্দীন বা ছমিরুদ্দীন মাতার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল—"ইলিমদের বাড়ী গিয়েছিলাম ; তাই এত দেরী হয়ে গেল। তোমাদের খবর সব ভাল ত ? বা-জান কই ?"

"এই এখুনি ওবাড়ীর চাচাকে দেখতে গেল তার আবার অসুখ করেছে আজ।"

"নানার আবার অসুখ করেছে ? একবার গিয়ে দেখতে হয় ! কালই যাব। সকালে তো বাড়ী থাকবো না বিকালে গিয়ে দেখে আসবো। অসুখ কি খুব বেশী ?"

"এমন কিছু নয়। শুনলাম, একটু জ্বর না কি হয়েছে। তা, তুই কাল সকালে আবার কোথায় যাবি শুনি ?"

একখানি লালটুকটুকে শাড়ী কন্যাকে পরাইয়া দিতে দিতে সমীরউদ্দীন কহিল—"বাবুদের বাড়ী লাঠি খেলতে যাব যে ! আজ বিজয়া গেল। কালই তো লাঠি খেলবার দিন। ইলিম লালু সলি আর আমি, এবার এই চার জন খেলবো ঠিক করে এসেচি। এবার অনেক কাল পরে ছোটবাবু বাড়ী এসেচেন। বকশিশ খুব বেশীই পাব দেখো।"

না বাপ, অমন বকশিশে আমার কাজ নেই। গরীবের দিন এক রকম চলে যাবেই। আল্লা করুণ -তুই বেঁচে থাক। আমি আর কিছুই চাইনে। ওসব নড়াই ঝগড়ার নাম শুনলে আমার ভয়ে গা কাঁপে।"

মাতার অজ্ঞতা ও স্নেহ ব্যাকুলতা দেখিয়া সমীর হাসিল। বলিল "তুমি কি মনে কর যে সত্যই লড়াই করি ? লড়ায়ের জন্যে হাত দুটো ত নিস্‌পিস্ করে মা ; তা পাই কই ? বছর বছরই তো আমরা লাঠি খেলি, সে তো তুমি জানই। এতে কিছুই হয় না।

"না হলেই ভাল বাছা। এখন তুই খাবি চল। তোর জন্য দুপুর বেলার খাবার সব আছে। এবেলাও বৌ সকাল করেই রাঁধতে গেল। এ হাঁড়িটার ভেতর কিরে ?"

"সন্দেশ আছে দেড় সের। বেশ ভাল পেলাম তাই নিয়ে এসেচি। গরু যে এত সকালেই ঘরে তোলা হয়েচে ?"

"খানিক আগে খুব মেঘ করে বাতাস উঠ্‌লো। দু ফোঁটা জলও পড়লো। তাই তোর বা-জান গরু ঘরে তুলে রেখেই ও বাড়ী গেছে। তার পরই আবার রোদ ফুটলো তা যাক্‌ এখন খেতে চল।"

"আমি এখন কিছুই খাবনা না। ইলিম খুব খাইয়েছে আজ। সেই জন্যেই ত ওবেলা আসতে পারিনি। সবাই মিলে আটক করেছিল।"

"খাবিনে বৈকি" মাতা রাগিয়া উঠিল। "কদিন মোটেও খেতে পারিসনি। তাই তো তোর বাপ জান হাট থেকে একটা কাতলা মাছ আন্‌লে। বলে,—ছেলে মোটে ভাত হাতে করে না।"

"দেখ, দেখ মা! ডালিমকে কি সুন্দর দেখাচ্চে!" সহাস্য প্রসন্নমুখে নাতিনীর দিকে চাহিয়া বৃদ্ধা কহিল "বাঃ সুন্দর কাপড় খান, তো? ডালিম বিবিকে যে পরীর মত দেখতে হয়েচে রে?"

স্নেহ মুগ্ধ সমীর হাসিয়া বলিল—হ্যাঁমা, সেই যে কাল দেখে এলাম দুর্গা ঠাকরুণের কাছে ছোট্ট মেয়েটি কি নাম তার? লক্ষ্মী—লক্ষ্মী ঠাকরুণ নয়? ঠিক তার মত দেখাচ্চে। ডালিমকে সন্দেশ দাওমা।"

বৃদ্ধা হাঁড়ি খুলিয়া দুইটি সন্দেশ নাতিনীর হাতে দিয়া হাঁড়িটি ঘরে তুলিয়া রাখিয়া আসিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধা ঘরে ঘরে সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া দিতে লাগিল। ডালিম কহিল—"নানাকে কাপড় দেখিয়ে আসি?" বলিয়াই উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সবেগে ছুটিয়া ঘাটে নামিল।—বলিল "পার করে দাও বা-জান।"

কন্যার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। সমীর নৌকায় করিয়া কন্যাকে পার করিয়া দিল। ওপারে একটি বড় বাড়ী। ডালিম সেই বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া চলিয়া গেল। সমীর নিজেদের ঘাটে ফিরিয়া হাত মুখ ধুইয়া উপরে উঠিল। ঘরের দাওয়ার বেড়ায় বাতায় ঝুলানো হুঁকা ও কল্কেটি খুলিয়া লইয়া তামাক সাজিতে সাজিতে আগুনের উদ্দেশে রন্ধন গৃহের দিকে চলিল।

ক্ষুদ্র ঘর খানি কেরোসিন ডিপার আলোকে আলোকিত। উনানে ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া ডালিমের মা আজিরণ বিবি চুপ করিয়া বসিয়াছিল। অনেক দেশ দেখিয়া শুনিয়া সমীরের পিতা এই নিরুপমা সুন্দরীটিকে বধূ করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র মলিন গৃহখানিকে উজ্জ্বল করিয়া আজিরণ বসিয়াছিল। কিন্তু তাহার মুখখানি সান্ধ্য কমলের ন্যায় ম্লান ও ঈষৎ বিশুষ্ক। তাহার স্বর্ণ দর্পণের মত সুন্দর কপাল খানিতে চিন্তা ও উদ্বিগ্নতার গাঢ় ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সমীরের পদশব্দে আজিরণ চমকিত হইয়া চাহিল। দুর্ভাবনা মুক্ত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে একটি নিশ্চিন্ততার সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"এলে তুমি? বাপ্‌ কি ভয় না হয়েছিল আমাদের।"

সকৌতুকে সমীরণ হাসিয়া বলিল—"কিসের ভয় ?" আশ্চর্য্য ভাবে চাহিয়া আজিরণ উত্তর করিল—"ভয় নয় ? বল কি তুমি ? সেই ভোর রাতে বেরিয়েচো, আর এখনো এলেনা।"

সমীর হাসিয়া বলিল—"এখনো আসিনি ?"

"একে বুঝি আসা বলে ? না এলেই হতো। আমরাই ভেবে মরি শুধু; তোমার আর কি ? ডালিম তো ও বেলা ভাতই খেলে না। বল্লে বাজানের সঙ্গে নইলে খাব না। যে মেয়ে, কথা তো শোনে না ; কিছু বল্লামও না। মনই খারাপ, বল্বোই বা কি ?"

"ডালিম যেন খায়নি। তুমি খেয়েছ তো ?"

"আমি আর খাবোনা কেন বল ?" বলিয়া আজিরণ বিবি চক্ষু দুইটী নত করিল।

"উহুঁ কথ্খনো খাওনি। আমার মন বল্ছে না। মিছে কথা বলে আমায় ভোলাচ্ছ।" ঐ যে ওবেলার অত ভাত তরকারী রয়েছে, ওকি আমার একলার ? কখনো না, ওতে তোমার ও ভাগ আছে। কি বলো, সত্যি নয় ?"

আজিরণ মুখ তুলিল না। স্বামী যার নিরুদ্দিষ্ট, কোন সুখে সে মুখে ভাত তুলিবে ? কিন্তু সে অত্যন্ত চাপা মেয়ে ; তাই কিছু বলিল না। কেবল টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু মাটিতে ঝরিয়া পড়িল।

"ও কি, ওকি ! আঃ বড্ড ছেলে মানুষ তুমি আজিরণ কিছু বুদ্ধি হয়নি তোমার ! সমীর ব্যস্ত সমস্তভাবে নিজে পত্নীর অশ্রু মুছাইয়া দিল। "ছিঃ এতে কি কাঁদতে আছে ? আজ বিজয়া—হিন্দুরা বলে আজকার দিনে চোখে জল ফেল্লে সে জল আর শুকায় না। আমি তো কোথাও বড় যাইনে দু একদিনের জন্যে গেলে কি ছেলে মানুষের মত রাগ করতে হয় ? ধর, যদি বিদেশে চাকরীই করতে যেতে হতো ?"

আজিরণের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হিন্দু পল্লীতে বাস ও হিন্দু কন্যাগণের সহিত অবাধ মেলা মেশার ফলে ইহারা আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তা ও চাল চলনে প্রায় হিন্দুই হইয়া গিয়াছিল। কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ক্রিয়া কর্ম্মাদি স্বজাতীয় প্রথানুসারে সম্পন্ন হইত। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন জেলা মুসলমান প্রধান। তথাকার পল্লীগ্রামে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবেশী পরস্পর পরস্পরের সহিত সহৃদয়তার সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক পরিবারের ন্যায় বহুকাল হইতে সংসার করিয়া আসিতেছে। বিদ্বেষ হিংসা ঈর্ষ্যা কিছু নাই। একের বিপদে অন্যের প্রাণ দিয়া সাহায্য করে। একের সম্পদে অন্যে আন্তরিক সুখী। দিনান্তে একবার দেখা না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না। উভয় পরিবারের ছেলে মেয়েরা মিলিয়া মিশিয়া সারাদিন খেলা করে।

আজীবন ছেলেবেলা হইতে হিন্দুদের সহিত অবাধভাবে মিশিয়া আসিতেছে। তাহাদের সকল প্রকার আচার ব্যবহার এবং প্রবাদ বচনাদিতেও সে ভালরূপ অভ্যস্ত। সেইজন্যই সহসা সমীরের কথা তাহার মর্ম্মস্থলে গিয়া বিঁধিল। সত্যই তো, বিজয়ার দিন যে সকলেই মিলিয়া

মিশিয়া আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটায়। সেদিন যা করিবে সারা বছর তাই করিতে হইবে। সেও তো তা জানে। তবে সহসা একি হইল? গভীর অমঙ্গল শঙ্কায় আজিরণের বক্ষ কাঁপিতে লাগিল। তাহার মনে হইল যেন কোন অনির্দ্দিষ্ট বিপদ তাহার গাঢ় কৃষ্ণ পক্ষদ্বয় মেলিয়া আজিরণকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। সভয়ে সমীরের হাত চাপিয়া ধরিয়া আজিরণ ভয়ার্ত্ত পাংশু মুখ তুলিয়া তাহার প্রতি চাহিল। বিবর্ণ অধর দুই তিন বার কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু স্বর নির্গত হইল না।

সমীর এত সব ভাবেও নাই, লক্ষ্যও করে নাই। সে আজিরণের মাথায় হাত বুলাইয়া বেশ প্রসন্ন চিত্তে হাসিয়া বলিল—"না গো না! তোমায় ফেলে কি আর আমার কোথায়ও যাবার যো আছে? অত ভয় পেওনা তুমি; বিদেশে যদি চাকরী করতে যেতাম, তো অনেক আগেই যেতাম। এখন আর বুড়ো বয়সে ছেলের বাপ হয়ে যাচ্চিনে। তুমি নিশ্চিন্ত হও। অমন মুখ ভারি করে থেকোনা।"

আজিরণ ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইল। সে বড়ই ভয়াতুরা অল্পেই অধীর হইয়া পড়িত। এইরূপ কোমল প্রকৃতি বলিয়া শ্বশুর শাশুড়ী তাহাকে যেন বুকে করিয়া রাখিতেন। সমীরও মধ্যে মধ্যে স্বভাবোচিত পরিহাস করিয়া ফেলিয়া আজিরণকে কাঁদাইয়া শেষে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িত।

সমীর আবার হাসিয়া বলিল—"এখন একটু শক্ত হও। বুদ্ধি কর অমন করতে কি আছে? ডালিমও যে তোমার চেয়ে সাহসী। এই তো ছোট বাবুর পরিবার ছ'মাস দার্জ্জিলিংএ কাটিয়ে এলেন। ছোটবাবু তো পাবনায় ছিলেন ছুটী পাননি বলে যেতে পারেননি। ছেলে মেয়ে বৌকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তুমি হলে পারতে?" বলিয়া সমীর হাসিতে লাগিল।—"তা আর নয়? সে তোমার কাজ নয়! আট বছর হলো বিয়ে হয়েছে—একদিন আমায় ছেড়ে কোথাও যাওনি। ভায়ের বিয়েতে গেলেনা পর্য্যন্ত। কোথায়ও য'বে তো আমার সঙ্গে, নইলে নয়। তুমি যে হিন্দু মেয়েদেরও বেশী হয়ে উঠলে? আমাদের মধ্যে ত নিকে আছে; আচ্ছা ধর, আমি যদি হঠাৎ মরেই যাই; তা হলে—

আজিরণ ভয়ার্ত্তভাবে "আল্লা" বলিয়াই সমীরের মুখ চাপিয়া ধরিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চুপ কর—চুপ কর। ও সব কি আজিকার দিনে বলতে আছে? কেন আমায় কষ্ট দাও?" বলিতে বলিতে আজিরণ এবার বহুকষ্টে চক্ষের জল রোধ করিতে লাগিল।

পত্নীর ভীত বেদনার্ত্ত মুখের দিকে চাহিয়া সমীর ব্যথা পাইল। বলিল—"না আর বলবো না। ঠাট্টা করে বলি, তুমি বোঝনা।"

"থাকৃগে, আমার ঠাট্টায় কাজ নেই।" বলিয়া আজিরণ মুখ তুলিয়া বলিল—"আচ্ছা, কি মানুষ তুমি বলত? বাড়ির কথা একটুও মনে হয়নি না?"

সমীর হাসিয়া বলিল—"মনে খুবই হয়েছিল। কি করবো; ওরা আসতো দিলেনা কিছুতেই। আচ্ছা, বলছি সব। আগে একটু আগুন দাওতো। অনেকক্ষণ তামাক খাইনি।"

আজিরণ বিবি হাস্তা করিয়া আগুন তুলিয়া দিয়া ভাতের ফেন ঝারাইতে বসিল।

পিঁড়িতে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সমীর ইলিম উদ্দীনের বাড়ীর নিমন্ত্রণের কথা বিশদ-রূপে বিবৃত করিল। শেষে বলিল—"ইলিমের যোগাড় তো কিছুই ছিল না। হঠাৎ আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় ধরে বাড়ীতে নিয়ে গেল। বল্লে, এত বেলায় না খেয়ে কিছুতেই বাড়ী যেতে পারবে না। কাজেই বাধ্য হয়ে থাকতে হল। কিন্তু এমন অল্প সময়ের মধ্যে এমন যোগাড় করেছিল আর এমন সুন্দর রান্না হয়েছিল যে কি বলব'। আমিও তাকে নিমন্ত্রণ করে এসেচি পরশু দিন। দেখো রান্না খুব ভাল হওয়া চাই; ইলিমের বিবি যেন তোমায় ছাড়িয়ে না যেতে পারে।"

সব শুনিয়া আজিরণ বিবি খুসী হইয়া উঠিল। গর্ব্বিত ভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ইস্ তা আর যেতে হয় না। আমার ওবেলা রান্না খেয়ে বা-জান কত ভাল বল্লেন। তোমার জন্ম সবই রেখে ছ; খেয়ে দেখো! আচ্ছা, মিঞাকে কালই কেন আসতে বল্লে না?"

"কাল আমরা বাবুদের বাড়ী লাঠি খেলতে যাব যে।"

"আবার কালই লাঠি খেলতে যাবে?" দুই চোখের বেদনাপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া আজিরণ স্বামীর দিকে চাহিল।

সমীর হাসিয়া বলিল—"যাবই ত। তা'তে রাগ করছ কেন? সারাদিন তো সেখানে থাকবো না। ভোরে যাব, আবার দুপুরেই ফিরে আসবো। এবার খুব মোটা রকম বকশিশ পাব তা জান? ছোটবাবু বাড়ী এসেচেন। তোমার জন্যে একখানা শীতের কাপড় কিনবো, তাই যোগাড়ে আছি। বুঝলে না? সুন্দর সুন্দর সব আলোয়ান এসেচে দেখে এলাম।"

"চাইনে আমার গায়ের কাপড়"—বলিয়া উনানে জাল ঠেলিয়া দিয়া আজিরণ বিবি খুন্তি দিয়া সবেগে তরকারী নাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল।

সমীর কি বলিতে যাইতেছিল। হঠাৎ পিতার আহ্বান শুনিতে পাইয়া ত্রস্তপদে চলিয়া গেল। আজিরণ ব্যঞ্জনে বাটনা ঢালিয়া দিয়া স্বনিশ্বাসে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল—"বাপরে বাপ—এমন মানুষও দেখিনি। একদিনও বাড়ীতে থাকতে চাহিবে না। কেবল হুজুগ নিয়েই আছে।"

২

ভোর না হইতেই ইলিম উদ্দীন, লালুসেখ, সলেউদ্দীন ও বহরআলি চারিজন মিলিয়া সমীরের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই খেলিতে যাইবার বেশে সজ্জিত। মাথায় হলুদ রংএর

বৃহৎ পাগড়ী বাঁধা ;—একপায়ে একখানি করিয়া কাঁসার নূপুরপরা এবং হস্তে তৈল পক্ক বৃহৎ বাঁশের লাঠি। সকলের মুখই উৎসাহের উদ্দীপনায় সমুজ্জল ও আনন্দপূর্ণ।

তাহাদের হাঁক ডাকে গৃহবাসীগণ জাগরিত হইয়া উঠিল। সমীরের মা ব্যস্তভাবে বারান্দায় মাদুর পাতিয়া সকলকে সমাদর করিয়া বসাইল। বৃদ্ধ নাজিরুদ্দীন মোড়ায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সকলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিল। ঘরের ভিতরে আজিরণ ক্ষিপ্র হস্তে খাবার গুছাইতে লাগিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সমীর প্রস্তুত হইয়া উঠানে নামিয়া দাঁড়াইল। পুত্রের হর্ষে দীপ্ত মুখের উজ্জ্বল শ্রী দেখিয়া বৃদ্ধ পিতা মুগ্ধ ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিল। আল্লা তাহাকে আর দ্বিতীয় সন্তান দেন নাই বটে, কিন্তু ছেলের মত ছেলেই দিয়াছেন। এমন জোয়ান যে, তাহার জয় যে অবশ্যম্ভাবী ?

বন্ধুগণসহ সমীর ভোজনে বসিল। হাস্য পরিহাস্য বড় চলিল না। কেন না পিতা সম্মুখে আছেন। আহার শেষে পান লইয়া সকলে উঠানে দাঁড়াইল। সমীরের মা অনেকগুলি সাজা পান আনিয়া সমীরকে দিল। বলিল "ছোটবাবুকে আমার সেলাম জানিয়ে বলবি, আমি দু' একদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে যাব।"

পিতাকে অভিবাদন করিয়া বন্ধুগণকে লইয়া সমীর ঘাটের দিকে চলিল।

"ঐ যা, আমার লাঠি গাছটাই ফেলে এসেচি।" সকলে হাসিয়া উঠিল—এমন ভুল ! সমীর ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল।

নিদ্রিত কন্যার নিকটে আজিরণ বিবি বসিয়াছিল। প্রভাতের স্নিগ্ধ মৃদু আলোক তখনো গৃহমধ্যে সম্যক প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। সেই মৃদু আলোকে সমীরের মনে হইল, আজিরণের মুখখানি বড়ই ম্লান দেখাইতেছে।

ঘরের কোণ হইতে লাঠি গাছটি তুলিয়া লইয়া স্নেহের সহিত সমীর বলিল—"তুমি বড় ছেলে মানুষ, অত ভাবছ কেন শুধু শুধু ? এই তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই তো ফিরে আসচি।"

আজিরণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইয়া রহিল। সমীর বলিল—"ডালিম উঠলো না যে ?"

"না উঠুক্ কেঁদে হাট বসাবে এখন।"

"আচ্ছা, থাক্ তবে।" বলিয়া নত হইয়া সমীর কন্যার মুখে চুম্বন করিল। আজিরণের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—"আচ্ছা তোমরা যদি অতই ভাব, কাল থেকে আর কোথাও যাবনা। কথা দিয়েছি যখন আজ যাই। কাল থেকে ঘরেই থাকবো, ঠিক দেখো।"

"তুমি সেই মানুষ কিনা ?" আজিরণ স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত আসিল। অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বলিল—খুব সাবধানে লাঠি খেলো ; কোথাও চোট লাগেনা যেন। আল্লা করুন ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো।"
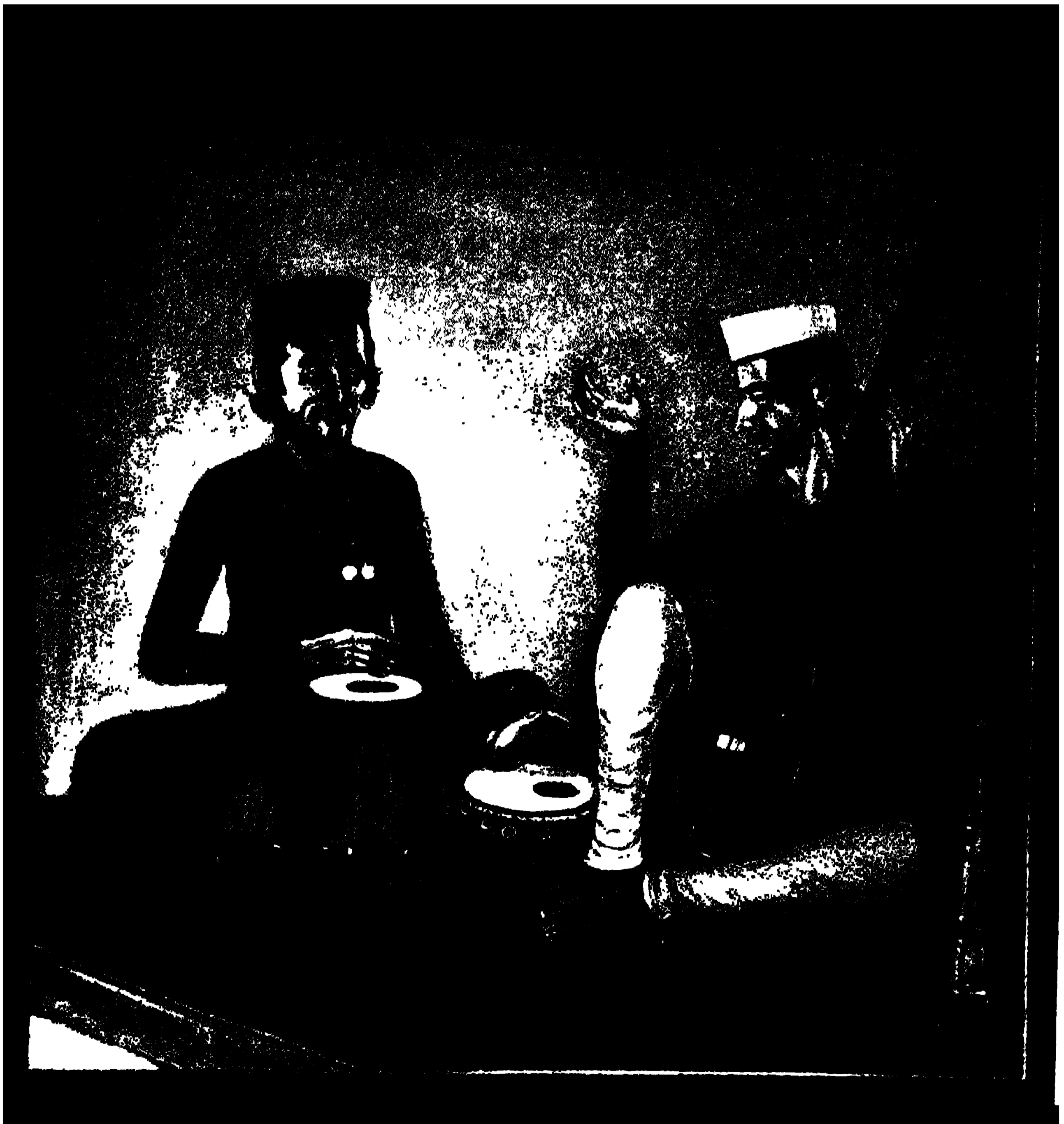
"এলাম বলে" বলিয়া ছুটিয়া সমীর বাহির হইয়া গেল। তাহার সঙ্গীরা তখন নৌকায় উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল। সমীর তিন লাফে সকলের আগে নৌকায় চড়িয়া বসিল।

নৌকা খুলিয়া দেওয়া হইল। এসব নৌকায় ছই থাকে না। চওড়া তক্তা দিয়া আলগা ভাবে পাটাতন করিয়া বর্ষা কালে সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্যই এরূপভাবে প্রস্তুত করা হয়। পল্লীগ্রামে বর্ষার দিনে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখেই ছোট বড় ২।৩খানা নৌকা সর্ব্বদা বাঁধা থাকে।

হঠাৎ কান্নার শব্দে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। তাহার মাতা ঘাটের উপরে বসিয়া আছে। এবং তাহার পিঠের উপর পড়িয়া ডালিম অধৈর্য্য হইয়া কাঁদিতেছে। মাথার চুল এলোমেলো; গত রাত্রির সেই রাঙ্গা শাড়ীখানি পরা। নবীন অরুণালোক মাখা মেয়েটিকে তাহার কি সুন্দর দেখাইতেছে।

সমীর একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল—"ডালিম, ঘরে যাও। কেঁদনা। আমি তোমার জন্যে নতুন বাক্স আর পুতুল আনতে যাচ্চি। অনেকগুলো পুতুল আনব কিনা? বাক্স না হলে, সে সব কিসে রাখবে?"

কোথাও যাইবার বেলা সমীর ডালিমের জিনিষপত্র আনিতে যাইতেছে বলিয়া যায়। এবং ফিরিয়া আসিয়া প্রতিশ্রুত জিনিষ সর্ব্বাগ্রে ডালিমের হাতে দেয়। ইহা ডালিম বরাবরই দেখিয়া আসিতেছে। সুতরাং কান্না ভুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পিতার কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিতে শুনিতে তাহার অশ্রু রেখাঙ্কিত মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। আগ্রহ সহকারে বলিল—"তুমি দেরী করোনা বা-জান, শীগগীর এসো। নইলে আমি আবার কাঁদব।"

দেখিতে দেখিতে নৌকা দূরে আসিয়া পড়িল। অবিলম্বে একটা বাঁক ঘুরিতেই আর তাহাদের দেখা গেল না।

সমীরকে সকলে পরিহাস করিতে লাগিল। সমীর বড্ড বেশী "ঘরবোলা!" সারা পৃথিবীটা ওলোট পালট করিয়া দিবার বয়স এই।—এখন কি মায়ের আঁচল মাথায় দিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকিবার সময় আছে? স্ত্রী পুত্র সকলেরই আছে; তা বলিয়া কেহ সমীরের মত নয়। লালু ত তো স্ত্রীকে কিছুই বলিয়াই আসে নাই। ইলিমের স্ত্রী তখন ঘুমাইয়াছিল; জাগেও নাই। আর সমীর কিনা লাঠি আনিবার ছুতা করিয়া আবার বৌয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিল! দু'পা না যাইতেই যদি তিনবার দেখা করিবার দরকার হয়,—তা হইলে একবেলার পথে যাইতে হইলে বিবি তো কিছুতেই সমীরকে ছাড়িয়া দিবে না। নিশ্চয় সঙ্গে যাইতে চাহিবে।"

সকলে উচ্চ কণ্ঠে হো-হো করিয়া হাসিয়া পরিহাসটাকে জমাইয়া তুলিল। সমীর ইলিমের পিঠে সজোরে একটা কিল বসাইয়া দিয়া বলিল—"এই,—মিথ্যা বল্লে জিভ ছিঁড়ে দেব কিন্তু; কাল সারা দিনটা তোর ওখানে কাটিয়ে এলাম না?"

ব্যথা পাইয়া ইলিম "উহু-হু" করিয়া উঠিল। তার পর চোখ বাঁকাইয়া বলিল—"আহা! ওর জন্যে তোমায় কেউ কিছুই বলেনি না?"

পাঁচটী বন্ধুতে মিলিয়া স্নিগ্ধ মধুর প্রভাতটিকে বেশ সরগরম করিয়া তুলিল। তাহাদের উচ্চ হাস্যধ্বনি ও আনন্দ কলরবে আকৃষ্ট হইয়া অনেক বাড়ীর লোকেরা কেহ ঘাটে দাঁড়াইয়া কেহ বা বারান্দা হইতে চাহিয়া দেখিতেছিল।

খেলা দেখিবার জন্যও বহু লোকের নিমন্ত্রণ ছিল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আশ পাশ হইতে তিন চারিখানি নৌকা তাহাদের সঙ্গে লইল। পাঁচ বছরের বালক হইতে অশীতি পর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত মহানন্দে খেলা দেখিতে চলিয়াছে। বেলা নয়টার সময় কুসুমপুরের বাবুদের ঘাটে নৌকাগুলি একে একে আসিয়া লাগিল।

বাবুরা চারি ভাই-ই তখন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকখানার বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুইয়া দুই ভাই রূপার গুড় গুড়িতে তামাক খাইতে খাইতে কথা বার্ত্তা বলিতেছিলেন। সেজবাবু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে সমাগত ঔষধপ্রার্থীদিগকে ঔষধ দিবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠটি নিবিষ্ট মনে সংবাদ পত্র দেখিতে ছিলেন। ইনিই ছোট বাবু। বিদেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। পাঁচ ছয় বৎসর পর এবার বাড়ী আসিয়াছেন।

দশ বার বৎসর পূর্ব্বে নাজিরউদ্দীন এই গ্রামেরই অধিবাসী ছিল। প্রতিবেশী এই দুই পরিবার দিনে দিনে অকপট ভালবাসা ও মায়াবন্ধনে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। নিজ পুত্র সমীরণের নামানুসারে তৎসমবয়সী নাজির-উদ্দীনের পুত্রের নাম বড় বাবুই সমীরুদ্দীন রাখিয়া ছিলেন। শ্বশুরের সম্পত্তি পাইয়া নাজির উদ্দীন এখন দৌলতপুরবাসী হইয়াছে। তথাপি এই ধনী পরিবারের সহিত সেই দরিদ্র সরল প্রাণ পরিবারটীর পূর্ব্ব প্রীতির বন্ধন এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

সমীরের সুবৃহৎ দলটি বৈঠকখানার সম্মুখে প্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হইল। সর্ব্বাগ্রে সমীর সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

অনেক দিন পরে সমীরকে দেখিয়া ছোটবাবু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। প্রত্যভিবাদন করিয়া তাহাকে বসিতে বলিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভৃত্যেরা বারান্দার অপর পার্শ্বে লোকজনের জন্য সুদীর্ঘ মাদুর বিছাইয়া দিল।

বড়বাবু চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া প্রশ্ন করিলেন—নাজির ভাই ভাল আছে ত? এখন একবারও আসেনা। তুই বেটা তবু এসেছিস।"

সহাস্যমুখে সমীর বলিল—"বা-জানের শরীর ভাল নয়। সেই জন্য কোথাও যাওয়া হয় না। কাল তিনি ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।"

পরিহাসপ্রিয় মেজবাবু বলিলেন—"ছোটবাবুই তার বিচারে মানুষ হলো? আমরা কেউ নই। আমাদের সঙ্গে দেখা করবার দরকার নেই?"

সমীর হাস্যমুখে বলিল—"আপনাদের সকলের সঙ্গেই দেখা করবেন।" বড়বাবু খেলা আরম্ভ করিবার হুকুম দিলেন।

চারিজন পায়ের নুপুর খুলিয়া রাখিয়া লাঠি হাতে প্রাঙ্গণের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। গণ্ডী দিয়া খেলিবার জন্য চতুষ্কোণ স্থান ঠিক করিয়া লইল। আপন আপন সঙ্গী নির্ব্বাচন করিয়া দুইজন ফিরিয়া গেল। সমীরও ইলিমের এবার খেলিবার পালা।

খেলা সুরু হইল। বিজয়ার পরদিন গ্রামের প্রধান ব্যক্তির বাটীতেই লাঠি খেলা হইয়া থাকে। গ্রাম্য ক্রীড়া কৌতুকের ইহা একটি প্রধান অঙ্গ। পূর্ব্বকালে খেলার শেষ ফল প্রায়শঃই সাংঘাতিক হইয়া যাইত। কাহারও হাত ভাঙ্গিত, কেহ খোঁড়া হইত; কেহ বা চির জন্মের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিত। এখন নিয়মের মাত্রা ঠিক রাখিতে গিয়া পূর্ব্বকার যুদ্ধ যদিও খেলায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, তথাপি খেলিতে খেলিতে দেহ মন দুই উত্তেজিত হইয়া উঠিলে অনেক সময়েই কেহ আইনের মাপকাঠি ঠিক রাখিতে পারে না।

সুকৌশল লাঠি চালনায় সমীর অত্যন্ত দক্ষ। প্রায় প্রত্যেক বারই সে ইলিমের সন্ধান ব্যর্থ করিয়া তাহার ঘাড়ে লাঠি বসায়। পরাস্ত ইলিম দ্বিগুণ বিক্রমে আবার অগ্রসর হইয়া আসিয়া সুযোগ সন্ধানে আক্রমণ করিয়া সমীরকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রায় প্রতিবারই সে বিফল মনোরথ হয়।

আধঘণ্টা হইয়া গেল। এবার ইলিম সদম্ভে লাফ দিয়া লাঠি উঁচু করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। তৎক্ষণাৎ সমীর সুকৌশল লম্ফে দুই হাত সরিয়া গিয়া নিজের লাঠি দ্বারা ইলিমের উদ্যত লাঠিটাকে সবলে আঘাত করিল। লাঠি ইলিমের হস্তচ্যুত হইয়া কুড়ি হাত দূরে গিয়া পড়িল। নিজের লাঠি সোজা করিয়া ধরিয়া দর্পিত সমীর বিজয়ী বীরের ন্যায় বুক উঁচু করিয়া দাঁড়াইল।

প্রথম বারের খেলা শেষ হইল। সকলেই উৎসুক হইয়া খেলা দেখিতেছিলেন। "সাবাস্ সমীর, বেশ খেলেছিস্!" বলিয়া বয়োজ্যেষ্ঠরা তাহাকে উৎসাহিত করিলেন। "সমীর ভাই জিতেছে! সমীর ভাই জিতেছে!" বলিয়া ছেলেরা আনন্দ প্রকাশ করিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া খুলিয়া রাখা নুপুর পায়ে পরিয়া ইলিম ও সমীর পুনরায় খেলা আরম্ভ করিল।

এবার আর যুদ্ধাভিনয়। যথার্থই লাঠি খেলা। সুকৌশল লম্ফে তালে তালে লাঠিতে লাঠিতে আঘাত করা; ঠক্‌াঠক্ শব্দ হইতে লাগিল। খেলার তালে তালে পায়ের নূপুর ঝুণ ঝুণ করিয়া বাজিতে লাগিল।

এই খেলাটির বেশ সুন্দর একটি নিয়ম আছে। খেলিতে খেলিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে ইহারা পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া যায়। খেলাভূমির গণ্ডী রেখা পর্য্যন্ত গিয়াই উভয়ে আবার ফিরিয়া দাঁড়ায়; এবং ধীর পদে অগ্রসর হইতে হইতে পুনরায় খেলা সুরু করে। প্রতি পদক্ষেপে, প্রত্যেকটী লম্ফ, লাঠি চালনা ইত্যাদি খেলার সব কয়টী অঙ্গই বেশ সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও সুকৌশল নৈপুণ্যে সম্পন্ন হয়, ইহাই ইহার বিশেষত্ব। সুশৃঙ্খলতায় সম্পাদিত যে কোন কার্য্যই মানব চিত্তকে যে পরিমাণে আকৃষ্ট করে, সেই পরিমাণে আনন্দ দানও করিয়া থাকে। সুতরাং খেলা দেখিয়া দর্শকগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। সমীরের বীরোচিত কান্তি, সুশ্রী শ্যামলশ্রী, নম্র বিনীত ভদ্র ব্যবহার অথচ যুদ্ধে তেজস্বী বীরের ন্যায় আচরণ প্রভৃতি দেখিয়া সকলেই তাহার পক্ষ লইয়াছিল। তা ছাড়া সমীর এই গ্রামেই শৈশব ও কৈশোর কাটাইয়াছে; অনেকের সঙ্গে একত্রে স্কুলে পড়িয়াছে। একত্রে খেলা করিয়াছে। আজও সে অনেকের স্নেহের ও সমাদরের পাত্র।

উদ্যত লাঠি দুটী পরস্পরকে আঘাত করিয়াই ভূশয়নে বিশ্রাম লাভ করিল। প্রথম পক্ষের খেলা শেষ হইয়া গেল। লালুসেখ ও সলেউদ্দীন উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রখর রৌদ্রে ঘণ্টা দুই ধরিয়া খেলিয়া উভয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইলিম মাদুর পাতিয়া বিছানায় গিয়া বসিয়া এক জনের হাত হইতে হুঁকাটা টানিয়া লইল। সমীর ছোট-বাবুর চেয়ারের পাশে আসিয়া বসিল। গামছা দিয়া গায়ের ঘাম মুছিয়া গামছা ঘুরাইয়াই হাওয়া খাইতে লাগিল।

ছোটবাবু দু'খানি নোট ভাঁজ খুলিয়া বলিলেন "এই তোমাদের বক্‌শিশ" অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠে বলিলেন—"সমীর তুমি কাল এসো তোমার বিশেষ পাওনাটা তোলা রইলো।"

সহাস্যমুখে সমীর বলিল—"আমারও একটা আরজি আছে আপনার কাছে—কালই আসব।"

পুরস্কারের মাত্রা দেখিয়া দর্শকগণ ও খেলোয়ারেরা খুসী হইয়া উঠিল। একবার চাহিয়া দেখিয়াই লালু ও সলে উদ্দীন নব বিক্রমে খেলা সুরু করিল। ভাবটা এই যে—এবারকার খেলাটা সকলে দেখুক একবার!"

বেলা অনেক হইয়াছিল। দর্শকেরা একে একে ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেল। দুই একজন নূতন বারের খেলা দেখিবার প্রত্যাশায় রহিল।

হঠাৎ সমীর অত্যন্ত অসুস্থতা বোধ করিতে লাগিল। বুকের ভিতরে হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন সঘনে আলোড়িত হইতে আরম্ভ করিল, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল। সমীরের মুখে ঘর্ম্ম বিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ সে মস্তিষ্কের অপ্রকৃতিস্থতা বেশ বুঝিতে পারিল। সর্ব্বাঙ্গ যেন শিথিল, অবসন্ন হইয়া

আসিতেছে। হাত পায়ের ভিতর ঝিম ঝিম করিতেছে। দৃষ্টির সম্মুখে যেন একখানা সূক্ষ্ম জাল পড়িয়া গেল। লোকজনের কোলাহল কর্ণে ক্রমশঃ অস্পষ্ট গুঞ্জনের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল।

সহসা নিজের শারীরিক অবস্থার এমন পরিবর্ত্তনে সমীর আশ্চর্য্য হইয়া গেল। একজন চাকরের নিকট খাবার জল চাহিল। ছোটবাবু বলিলেন—"মার কাছ থেকে কিছু মিষ্টি সন্দেশ নিয়ে আসিস্।"

"না বাবু, আমার শরীরটা ভারি খারাপ লাগছে; কি হলো কিছু বুঝতে পারছি না।"

ছোটবাবু সমীরের মুখের দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে চেয়ারের পাশে ঝুঁকিয়া পড়িলেন—"কি রকম বোধ করছ?"

অন্দরে যাইবার পথে দুইটী পেয়ারা এবং একটি জামগাছ মিলিয়া একটি ছায়া স্নিগ্ধ স্থান রচনা করিয়াছিল। সহসা সমীর টলিতে টলিতে সেই দিকে ছুটিয়া গেল; এবং ছায়াতলে না না পৌঁছিতেই অবসন্ন দেহে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে শশব্যস্ত ও চমকিত হইয়া সকলে ছুটিয়া আসিল, ছোটবাবু দুই হাতে সমীরের দেহটি তুলিয়া ধরিলেন। বাঁ হাতের উপরে সমীরের মাথা রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহাকে ঝাঁকানি দিতে দিতে উদ্বিগ্ন ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিলেন—"সমীর—সমীর! কি হল রে তোর!"

দুইজন সজোরে পাখা হাঁকাইতেছিল। একজন সমীরের মাথায় ধীরে ধীরে জলের ছিটা দিতেছিল। অন্যান্য লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়াছিল। বড়বাবু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"ভিড় ঢালিতেছিল। ছাড়! গোল করোনা কেউ—সরে যাও।

ছোটবাবুর আহ্বানে সমীর নিমীলিত নেত্র ঈষৎ উন্মুক্ত করিল। সেই মুহূর্ত্তে বুঝি তাহার চোখের সম্মুখে বায়স্কোপের ছবির মত শত শত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইতে লাগিল:—উদ্বিগ্ন হৃদয় তাহার বৃদ্ধ বাপজান—নদী তীরে উপবিষ্টা স্নেহাকুলা মাতা—ক্রন্দন-নিরতা মায়ার পুতুল ডালিম আর—আর গৃহকোণে ম্লানমুখী অশ্রু সজলনেত্রা আম্বিরণ!—

কিছু বলিবার জন্য কিনা, কে জানে—সমীরের ওষ্ঠ দুটী ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, দুই একবার কি বলিতে চাহিল কিন্তু পারিল না। ছোটবাবু একটু শীতল জল তাহাকে পান করাইয়া দিলেন।

সেজবাবু দ্রুতপদে এক ডোজ ঔষধ আনিয়া ছোটবাবুর হাতে দিলেন। ঔষধ মুখের দুই প্রান্ত বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সমীর অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

সেজবাবু সমীরের নিষ্পন্দ দেহে হাত দিয়া দেখিলেন। তার পর, তাহার শিথিল ভূমিলুণ্ঠিত হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। ক্ষণকালের জন্য সকলেই ব্যগ্রভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। সমীরের উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত নেত্র তারকা তখন নিশ্চল হইয়া গিয়াছে

মেজবাবু বলিলেন—"কি খেলা খেলতে এসেছিলিরে তোরা! ওর যে শেষ হয়ে গেলো"—সঙ্গে সঙ্গে সেজবাবু সমীরের হাত ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—শেষ হয়ে গেছে!"

এই আকস্মিক অভাবনীয় দুর্ঘটনায় সকলে স্তম্ভিত নির্ব্বাক হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দলপতি একজন গুণী ব্যক্তি বৃদ্ধ মুসলমান। সে নিকটেই বসিয়াছিল। বলিল—খেলার পর কি তামাক খেয়েছিল?" ছোটবাবু বলিলেন—"না ও আমার কাছে বসেছিল। "তবে বোধ হয় ডাক ভাঙ্গা হয় নাই, আমি একটু দেখি—"বৃদ্ধ সমীরের মুখের উপর ঝুঁকিয়া দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সজোরে তাহাকে ঝাঁকানী দিতে লাগিল। মেজবাবু অন্য একটি মুসলমানকে প্রশ্ন করিলেন—"এর অর্থ কি?" ওর নাম ডাকভাঙ্গা; খুব হাঁক ডাক করে খেলবার নিয়ম; আজ কাল তো তা হয় না। বদ্ধ ডাক ভিতরে আটক থাকে; তাতে অনেক সময় এই রকম অজ্ঞান হয়ে পড়ে—ডাকাতরা ডাক ভাঙতে ভাঙতে আসে বলেই অত জোর পায়। চুপি চুপি এলে অত সাহস পেতনা। যার ডাক ভেতরে আটক আছে এই রকম করলে গোঁ গোঁ আওয়াজ করে সব বেরিয়ে এসে রুগী ভাল হয়ে যায়।"

"ও আচ্ছা; দেখুক চেষ্টা করে।"

নূতন আশায় আবার বুক বাঁধিয়া সকলে গুণীর চিকিৎসা দেখিতে লাগিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া নানারূপ চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিশ্বাস ফেলিয়া গুণী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—নাঃ আর কিছু নেই।"

দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের প্রখর তাপ ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ছোটবাবু বলিলেন—"একে তোমরা এখন নিয়ে যাও।"

সকলে তাহার মুখের দিকে চাহিল। তিনি বলিলেন—প্রথমে থানায় নিয়ে যাও। থানার সামনে দিয়েই ত যাবে? কোন কাজ কাঁচা রাখবার দরকার নেই। শেষটায় তা হ'লে গোলমাল হ'তে পারে।"

বৃদ্ধ গুণী কহিল—"বাবু, থানা পুলিশ করতে বলছেন—ওসব যে বড় হাঙ্গাম। গরীব মানুষ আমরা; যে দিন কাল পড়েছে—ট্যাকে কিছুই নেই। শেষে আমরাই যদি আটক পড়ি?"

ছোটবাবু বলিলেন—তোমাদের কোন ভয় নেই। স্পষ্ট করে সব কথা বুঝিয়ে বলো, তা হলেই বুঝবে। আর এ দারোগাকে আমি জানি—বেশ ভাল লোক; কিছু ভয় নেই তোমাদের। যদিই কোন গোলমাল হয়, আমায় জানিও; যা করবার তখন করব। আর দেখো, তোমাদের কথার যেন কোন গরমিল না হয়। আগাগোড়া সত্য ঘটনা ঠিক করে বলবে; সবই ত দেখলে? একটুও বানিয়ে বল্‌তে যেওনা। সত্যের জয় সর্ব্বত্র; মাথার উপর ভগবান আছেন।"

"বাবু, একালে বুঝি তা ও নেই" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইল।

জালুসেখ ও ইলিম উদ্দীন নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সময় টুকুর মধ্যেই ইলিমকে অত্যন্ত ম্লান ও বিবর্ণ দেখাইতেছিল। সকলের চেয়ে সেই কাতর হইয়াছিল বেশী। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সভীতকণ্ঠে ইলিম বলিল—"আমার কি হবে বাবু?"

ছোটবাবু বলিলেন—"তোর আবার কি হবে?"

ইলিম ভয়ার্ত্তকণ্ঠে উত্তর করিল—"আমার সঙ্গে খেলতে গিয়েই ত এই দশা! যদি বলে আমারই লাঠির চোটে"—

"পাগল এতগুলো সাক্ষী থাকতে তোর ভাবনা কিসের? ওর সঙ্গে ত তোর শত্রুতা ছিল না যে তুই ইচ্ছে করে ওকে মেরেছিস?"

"না বাবু, একটুও না। ছেলেবেলা থেকেই কত যে ভালবাসা—ঠিক আপনার ভায়ের মত জানতাম—" হাহাকার করিয়া ইলিম বুকভাঙ্গা কান্না কাঁদিয়া উঠিল।

ছোটবাবু রুমালে চোখের জল মুছিয়া বলিলেন"—তবে আর কি। নির্ভয়ে যাও। আর দেরী করো না।"

বৃদ্ধগণ "আল্লা"—"আল্লা" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সমীরের সঙ্গী দুইজন নৌকা হইতে কয়েকখানা তক্তা তুলিয়া আনিয়া ছোট দুই খণ্ড বাঁশের সঙ্গে দড়িদিয়া বাঁধিয়া একটা মাচা প্রস্তুত করিল। ভৃত্যেরা ছোটবাবুর আদেশ মত অন্তঃপুর হইতে শয্যা এবং বস্ত্রাদি আনিয়া দিল। নব রচিত খাটে শয্যা বিছাইয়া ধরাধরি করিয়া সমীরকে তুলিয়া তাহার উপর শোওয়াইয়া দেওয়া হইল। ছোটবাবু ব্যস্তভাবে বলিলেন—"আহা! সমীরের হাত দুখানা ঝুলে পড়লো যে—খাটখানা আর একটু বড় করলিনে কেন?"

ইলিম সযত্নে সমীরের বুকের উপর হাত দু'খানা তুলিয়া দিল। নিজের গায়ের মটকার চাদর খানা খুলিয়া ছোটবাবু সমীরের আপাদ মস্তক ঢাকিয়া দিলেন।

খাট বা মাচাটি বহন করিয়া নিরুৎসাহ মন্থর গতিতে সকলে নৌকায় গিয়া উঠিল। ছোটবাবু সঙ্গে ঘাট নামিলেন। বলিলেন—"সমীর বিয়ে করেছিল অনেকদিন আগে—ছেলেমেয়ে কিছু হয়েছে?"

"আছে বাবু আছে" ইলিম উদ্দীন বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল।—একটী মাত্র মেয়ে,—আসবার সময় কত যে কাঁদছিল! এখন কি বলে ওর বাড়ীর উপর গিয়ে দাঁড়াব! বুড়ো বুড়ীর এই এক ছেলে বাবু! সমীর—সমীর; তোর মনে এই ছিল! তুই যে পথে আসতে আসতে তোর বিবির রান্না আমাদের খাওয়াবি বলে কালকের জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিস—তোর বিবি যে তোকে ছাড়া জানে না! সে কি আর বাঁচবে!"—

ইলিমের মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দনে কেহই চক্ষের জল সামলাইতে পারিল না। ছোটবাবু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে রুমালে চক্ষু ঢাকিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।—বলিবার আর কি আছে!

নৌকাগুলি একে একে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ধীরে ধীরে সেগুলি দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে ছোটবাবু ঘাট হইতে উঠিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল—"সমীর নাই—একি হইতে পারে! বুঝি এ সব স্বপ্ন!"—

ক্ষণকাল পূর্ব্বের লোক কোলাহল পূর্ণ বৃহৎ প্রাঙ্গণ এখন জনশূন্য নিস্তব্ধ। কেবল মেজবাবু বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া পূর্ব্ববৎ তামাক খাইতেছিলেন।

একজন ঝি এক হাঁড়ি গোলা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য নিধিয়া তাহাকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। ছোটবাবু তীব্র কণ্ঠে ধমক দিয়া উঠিলেন—"কি সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড! এই লোকটা ঘণ্টা দুই আগে বেঁচেছিল,—হাতে হাতে পান জল তামাক দিলে।—আর এখনই গোবর গোলা ছড়িয়ে শুদ্ধ কর্ত্তে এসেছে! নিজেরা কি সব যমের ঘর বেঁধে এসেছ? যাও, ওসব করেতে হবে না।" বলিতে বলিতে শূন্য উঠান পার হইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

৩

দৌলতপুর গ্রামের প্রান্তেই থানা। থানার সম্মুখ দিয়াই গ্রাম যাইতে হয়। বেলা প্রায় তিনটার সময় শ্লথ গতিতে তরণী থানার সামনের ঘাটে আসিয়া লাগিল।

দারোগা স্নানাহারার্থ বাসায় গিয়াছেন। থানা ঘরের প্রশস্ত বারান্দায় বসিয়া হেড্ কনেষ্টবল কি লিখিতেছিল। সমবেত লোকগুলির দিকে না চাহিয়াই বলিল—"ঘণ্টা দুই দেরী হবে তাঁর।"

"তা হলে একটু খবর তাঁকে—" ধমক খাইয়া বৃদ্ধ মোড়ল অর্দ্ধ পথে চুপ করিল। হেড কনেষ্টবল চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া (স্বভাবতঃ) গর্জ্জিয়া বলিল—"ওঃ—নবাবের বেটারা এসেছেন, একটু দেরী সইবে না! টেলিগ্রাম করে তোমাদের আগমন বার্ত্তা আগে জান'তে পারিনি? ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাহারা বসাতাম তা'হলে?"

সকলে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুদক্ষ কর্ম্মচারিটী পুনর্ব্বার শান্তভাবে অবলম্বন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল।

ঘণ্টা দেড়েক পরে দারোগা দেখা দিলেন। তাঁহার অল্প বয়স ও শান্ত প্রসন্ন মুখচ্ছবি দেখিয়া শঙ্কিত গ্রামবাসীগণ ঈষৎ আশ্বস্ত হইল। ছোটবাবুর নির্দ্দেশ মত তাহারা সকল কথাই ঠিক করিয়া বলিল।

দারোগা বাবুটি বয়সে নবীন। অল্পদিন হইল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কলেজ জীবনের সরল সত্যপ্রিয়তা ও অকপট উদারতা এখনো তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই; এবং মুদ্রার মোহনীয় রূপ এখনো তাঁহাকে সম্যক্ অভিভূত করিতে পারে নাই। সুতরাং এমন একটা ব্যাপারে

টাকা পয়সার কোন কথাই উঠিল না দেখিয়া হেড কনেষ্টবলটি অত্যন্ত বিরক্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। এমন কেস্ থানায় তো হরদমই আসিয়া থাকে এবং ইনি আসিবার পূর্ব্বে এরূপ ব্যাপারের কোনটাতেই দু'চারশো লাভ না হইয়া যায় নাই। বিশেষতঃ যখন একঘর ধনী পরিবারের নাম করিতেছে।—

অতিশয় চঞ্চলভাবে হেডকনেষ্টবল অর্দ্ধ স্বগত ভাষায়—"এঃ সব মাটী!" "ব্যাপারটায় গোল আছে নিশ্চয়ই" "একবার তদন্ত করে দেখলে হ'তো" "এদের কথায় আবার বিশ্বাস"—ইত্যাকার বাণীতে মনোভাব আংশিক প্রকাশ করিয়া দারোগাকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দারোগা তাহাতে মোটেও কান দিলেন না।

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত ও ছোটবাবুর নাম ধাম সব কথা শুনিয়া ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়া এবং মৃতদেহ দর্শন কার্য্য শেষ করিয়া দারোগা লোকগুলিকে যখন বিদায় দিলেন; তখন থানার ঘড়ীতে সাড়ে পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে।

আশ্বিনের সন্ধ্যান্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। দীপ জ্বালিবার কথা কাহারও মনে হইল না। অথবা সে শক্তি ও নাই। নীরবে সকলে নৌকায় উঠিয়া বসিল।

আবার সেই নদী পথ বাহিয়া তরণী এবার গৃহপানে ফিরিয়া চলিল। গমন কালে যে উৎসাহপূর্ণ বলিষ্ঠ বাহুর ক্ষিপ্র তাড়নে সে পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া চলিয়াছিল, এখন তাহা কোথায়? নিরাশ ভগ্ন চিত্তে স্তব্ধ হইয়া শায়িত সমীরের শিয়রে ও পদপ্রান্তে সঙ্গীগণ বসিয়া আছে। তরণী মন্থর গমনে আপন মনে ভাসিয়া চলিয়াছে।

৪

আকাশ ভরা মেঘ। গুড় গুড় করিয়া দেয়া ডাকিতেছিল। মধ্যে মধ্যে এক একবার ঝাপটা বাতাসে ঘরের বেড়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। ঘোর অন্ধকারে ধরণী আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতালোক জ্বলিয়া উঠিতেছে। নিঃশব্দগতিতে নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল।

সঙ্গী চারিজন খাট শুদ্ধ সমীরকে বহন করিয়া আনিয়া অন্ধকারে উঠানে নামাইল।

গৃহের ভিতরে বৃদ্ধ নাজির উদ্দীন ও তাহার স্ত্রী অনুপস্থিত পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া যে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল বাহির হইতে তাহার কিছু কিছু শোনা যাইতেছিল। ঘরের মধ্য হইতে এক ঝলক আলো আসিয়া উঠানের একপার্শ্বে পড়িয়াছে।

রন্ধন গৃহের ধূম সবেগে উর্দ্ধপানে ঠেলিয়া উঠিতেছে। অন্যান্য দিনের মতই আজিরণ বিবি রন্ধন কার্য্যে নিযুক্তা আছে। শাশুড়ীর নিষেধ না মানিয়াই সে আবার রন্ধন চড়াইয়া দিয়াছে।

ও বেলার ঠাণ্ডা জিনিস সে সমীরকে সারাদিন পরে খাইতে দিতে পারিবে না। থাক্ না ওসব—ফেলা ত যাইবে না। ফতিমা চাচির দিন খাইতে জুটে না; সমীর আসিলেই সে চুপি চুপি তাহাকে ধরিয়া দিয়া আসিবে।

দুরন্ত ডালিম মায়ের পিঠের উপর পড়িয়া শত আবদার অত্যাচার ও নাকি সুরের কান্নায় মাকে বিব্রত অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। কন্যার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উন্মনাভাবে কি যেন শুনিবার আশায় আজিরণ উৎকর্ণ হইয়াছিল।

গত রাত্রিতে এমনই সময়ে সেই সব কথাবার্তা, সেই অশ্রুপাত সমীরের অলক্ষণযুক্ত কথা—সকলই ফিরিয়া ফিরিয়া আজিরণের বক্ষতলে শেলের মত বিঁধিতেছিল। সারাদিনের অনাহার, দুশ্চিন্তার ভয় ভাবনা এবং দুর্নিবার অমঙ্গলাশঙ্কা পীড়িতা আজিরণকে অগ্নিতাপ দগ্ধা কুসুমের মত বিবর্ণ ম্লান ও বিশুষ্ক দেখাইতেছিল।

"এখনো এলো না—এখনো এলো না! হে আল্লা! কি হলো তাঁর?"—সহসা অস্থিরভাবে আজিরণ বিবি উঠিয়া দাঁড়াইল। ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল—"শব্দ পাচ্ছি, কারা যেন এলো! ডালিম, ডালিম—তোর বা-জান এসেচে বুঝি—"

কান্না ভুলিয়া ক্ষুদ্র শাড়ীর অঞ্চল লুটাইতে লুটাইতে ডালিম উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

আজিরণ দুয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

"চাচা! তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? দাদী—দাদী! বা-জান এয়েচে যে, বড্ড অন্ধকার! বাতি নিয়ে এস না!"

পৌত্রীর উচ্চ চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা শশব্যস্তে আলোক লইয়া গৃহের বাহির হইয়া আসিল।

মুহূর্ত্তের জন্য সব নিস্তব্ধ। কিছুই দেখা যায় না। সমীরের ঘর খানায় আড়াল হইয়াছে। আজিরণ আরও একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া সমীরের কণ্ঠস্বর শুনিবার আশায় কাণ পাতিয়া রহিল।

সহসা সেই গভীর নিস্তব্ধতাপূর্ণ নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া বৃদ্ধ নাজীর উদ্দিনের হৃদয়ভেদী কাতর আর্ত্তনাদ উঠিল—"আল্লা—আল্লা! কি করলে!"—

বিষাক্ত তীক্ষ্ণ শরের মত সে ধ্বনি আসিয়া আজিরণের মর্ম্মস্থলে বিঁধিল উন্মাদিনীর ন্যায় লজ্জা ভুলিয়া সে ছুটিয়া অগ্রসর হইল।

আবার সেই আর্ত্তনাদ,—"সমীর—সমীর! বাপরে আমার!"—বলিয়া পুত্রহারা জননী আজিরণের চক্ষের সম্মুখে বিগতপ্রাণ পুত্রের দেহের উপরে আছাড় খাইয়া পড়িল।

সমগ্র বিশ্বজগৎ আজিরণের দৃষ্টির সম্মুখে সবেগঘূর্ণনে ঘুরিয়া প্রচণ্ড ভূমিকম্প ও ভীষণ

মহাপ্রলয়েরই সৃষ্টি করিতেছিল। দুই চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া চেতনাহারা আজিরণ তাহার স্বামীর অনতিদূরে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

কাল এমনি সময়ে উদ্বিগ্নচিত্ত পিতা মাতা এবং গোপন-চিন্তাভার-পীড়িতা পত্নীর জন্য আনন্দ ও আশ্বাস লইয়া সমীর ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আজও সে ঠিক সেই সময়েই ফিরিয়া আসিয়াছে! আজ সে কি লইয়া আসিয়াছে?

"ভঙ্গুর মাটীর ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত বারি"

—রবীন্দ্রনাথ—

শ্রীরাধারাণী দত্ত

১

সত্যব্রত'র কাছে রজনী গান শেখে,—বেহালা বাজাতে শেখে।

তাই নিয়ে প্রতিবেশীরা নানান্তর ইঙ্গিতে রহস্য বিদ্রূপ করে,—ইসারায় অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

বলে—এবার থেকে কালো মেয়েদের বিয়ের জন্য অভিভাবকদের হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না,—গান শেখবার জন্য একটি মনের মত মাষ্টার বেছে নিযুক্ত ক'রলে আপনা আপনিই বিয়ে হয়ে যাবে।

কথাগুলো রজনীর দাদা চন্দ্রভূষণ বাবুর কাণেও যে একটু আধটু না ওঠে তা'নয়, তিনি আমল দেন্‌না, হেসে উড়িয়ে দেন্।

অনতিক্রান্ত যৌবন বিপত্নীক চন্দ্রভূষণ বাবুর সন্তান সন্ততি নেই, ছোটবোন রজনী ছোট ভাই নিশীথ এবং বৃদ্ধা পিসিমাকে নিয়ে তাঁর সংসার।

আঠারো বছরের অবিবাহিতা বোন—রূপের দৈন্যে বিয়ে হয়নি আজও।

রজনী কালো,—শুধু কালো বললে হয়না, ঘন কালো।

চন্দ্রভূষণ বাবুর বন্ধু সত্যব্রত বাংলাদেশ ছেড়ে কর্ম্মের চেষ্টায় ভাগলপুরে চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সত্যব্রতের সুবাদক ও সুগায়ক খ্যাতি আছে।

প্রবাসী চন্দ্রভূষণবাবু গুণী বন্ধুকে পেয়ে বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, সত্যব্রতর কাছে তিনি নিজে সঙ্গীতকলা শিক্ষা ক'রবেন স্থির হ'ল। কিন্তু দিন দশেক সেতারে গৎ সাধবার পরে চন্দ্রবাবু আঙুলের বেদনায় সুরলক্ষ্মীর আরাধনায় ভঙ্গ দিয়ে ছোটবোন রজনীকে সত্যব্রত'র ছাত্রীরূপে ভর্ত্তি করে দিলেন।

শৈশবকাল হ'তেই রজনীর সঙ্গীত ও সুরের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ। সে সানন্দে সত্যব্রত'র কাছে সুর সাধনায় ব্যাপৃত হ'ল।

এই সঙ্গীত শিক্ষা ব্যাপার নিয়ে পাড়ায় যখন নিন্দা ও কুৎসার কাঁসর বেজে উঠল—চন্দ্রভূষণবাবু তখন নিজের ঘরে বেতের চেয়ারে আড় হয়ে পড়ে নিজেই নিজের বুদ্ধি ও সুবিবেচনার তারিফ করতে লাগলেন।

চন্দ্রবাবু বলিলেন—গান সম্বন্ধে রোজি'র ছোটবেলা হ'তেই প্রতিভা আছে। কঠিন সুরও খুব চট্‌করে ও আয়ত্ত ক'রে নিতে পারে। সত্যর কাছে গান শিখলে খুব শীগ্‌গিরই ভাল করে শিখে নিতে পারবে!—বাড়ীতে এত লোক রয়েছে কিন্তু কারুরই মাথায় এ বুদ্ধিটা খেলেনি!

রোজির নিজেরও এ বুদ্ধি হয়নি!

ক্ষীণ খালিত্যের আভাস ভরা ব্রহ্মতালুতে ঘন ঘন হাত বুলিয়ে চন্দ্রভূষণবাবু নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনার গৌরবে প্রশান্ত ললাট ও চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল করে তুল্‌লেন।

চন্দ্রবাবু মানুষটি সংসারে বাস করেও সংসার সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান কিঞ্চিৎমাত্রও অর্জ্জন করে উঠতে পারেননি।

সংসারের কালোদিকটা তাঁর নজরে প'ড়তইনা,—চ'খে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও—সেটা তাঁর নিজের অন্তর স্বীকার করে নিতে চাইতনা বলে—তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন।

যে কথাটি বা যে ব্যাপারটি তাঁর ভালো লাগতনা, তিনি স্পষ্টভাবে তার বিরুদ্ধে বিরক্তি বা রোষ প্রকাশ না করে'—অন্য যে কেউ বা যা কিছুর উপরে সেই পুঞ্জীভূত বিরক্তি সঞ্জাত ক্রোধের তালটি নিতান্ত অর্থহীন এবং আকস্মিক ভাবেই ন্যস্ত ক'রতেন।

ক্রোধ চন্দ্রবাবুর প্রকৃতিতে কতটুকু ছিল বলা কঠিন—তবে অপ্রিয় প্রসঙ্গে দপ করে জ্বলে ওঠা এবং রাগ যত হোক্—চতুর্গুন পরিমাণে চেঁচামেচি—শাসন—তর্জ্জন গর্জ্জন—এইটুকুই ছিল তাঁর বিশেষত্ব।

রজনী একেই নিবিড় কালো, সুদর্শন গৌরবর্ণ সত্যব্রতর সামনে বসে যখন বেহালা শেখে—তখন যেন তাকে আরও কুশ্রী দেখায়।

নিশীথ রজনীর চেয়ে দেড় বছরের ছোট। ঠাট্টা করে বলে—রজুদি, সত্যব্রত বাবুর সামনে তোকে কেমন দেখায় জানিস্? যেন ফুটন্ত পদ্মের কাছে কালো ভোমরা!

রজনী উত্তর দেয়—ভোমরা নইলে দুনিয়ায় ফুলেদের মানই থাকতোনা যে!

অনাত্মীয় যুবকের কাছে অষ্টাদশী কুমারী মেয়ের সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে পিসিমার অত্যন্ত আপত্তি।

সে আপত্তি কিন্তু চন্দ্রবাবুর দরবারে টেঁকেনি। রজনীও মেনে নেয়নি।

আজ চন্দ্রবাবু অফিস্ হ'তে বাড়ী ফিরেই চেঁচামেচি করে ডাকাডাকি আরম্ভ করলেন।—রোজি—রঞ্জনি—রঞ্জনি—

রঞ্জনী চন্দ্রবাবুর মুখে নিজের পুরো নামটি শুনে উদ্বিগ্নমুখে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হ'তে বেরিয়ে এল আসন্ন তিরস্কার বর্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়ে। যেহেতু চন্দ্রভূষণবাবুর ক্রোধের চিহ্ন ও শাসন উদ্যোগের মুখপত্রই হচ্ছে—রঞ্জনীর পূরানাম ধরে প্রয়োজনাতিরিক্ত চীৎকারে বারম্বার আহ্বান!

সহজসময়ে চন্দ্রবাবুর মুখদিয়ে বোনের পূরোনাম কদাচ উচ্চারিত হয়না,—অপভ্রংশে উচ্চারিত হয়—রোজি—রুজ—রজু—রুমু—এমনিধারা কত কি!

ছোট ভাই নিশীথ ব্যঙ্গ করে বলে—রজুদি, তোর মতন 'রুজ' গালে মাখলে পাউডারের বদলে চুণ মাখা উচিত! দিব্যি চূণ কালী মানাবে।

রঞ্জনী দাদার সামনে এসে দাঁড়াতেই চন্দ্রবাবু বিনা ভূমিকায় কঠিনস্বরে বললেন—সত্যব্রতর কাছে গান গাস্—পাড়ায় যে ভয়ঙ্কর নিন্দে হচ্ছে, সেদিকে কি চৈতন্য নেই?...বড় হয়েছিস নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা কবে হবে বল্ দেখি? যতক্ষণ না আমি বলে দেবো ততক্ষণ তোদের কি কোনও সাধারণ জ্ঞানও হবেনা?—সত্যই তো, সত্যব্রতর কাছে গলা ছেড়ে গান গাওয়াটা তোর পক্ষে উচিত নয়ই তো!!

চন্দ্রবাবু কণ্ঠস্বরকে আপনাআপনিই উচ্চ হ'তে উচ্চতর গ্রামে তুলে দৃঢ়তর্কের ভঙ্গীতে হাত মুখ নেড়ে বলতে লাগলেন—ঠিক কথাই তো! পাড়ার লোকের কথা অগ্রাহ্য করা তো অনুচিতই!...সমাজে যখন বাস করছো তখন সমাজ মেনে চলতেই হবে!!—

চন্দ্রবাবুর কথাগুলি এবং প্রতিবাদের সুরে চেঁচামেচি যুক্তি তর্ক শুনলে,—বাইরে থেকে কারুর বোঝবার সাধ্য নেই—ওখানে একটি সম্পূর্ণ নিরুত্তর ও নির্ব্বাক্ প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ করে' এই তুমুল তর্ক ও প্রতিবাদ চলছে।

খানিকক্ষণ বকাবকির পর চন্দ্রভূষণ বাবু রঞ্জনীর নির্ব্বাক্ শুষ্ক মুখের দিকে মুহূর্ত্তেক দৃষ্টিপাত ক'রে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি কোমলস্বরে বললেন—দ্যাখ, এক কাজ করিস বরং, সত্যব্রত ভারী সুন্দর বাঁশী বাজায়, সেদিন পূর্ণিমা সম্মিলনীর জলসায় একটা গজল সুর বাঁশীতে বাজিয়েছিল চমৎকার!...তুই ওর কাছে গান না শিখে বরং বাঁশী শেখ্—সেই বেশ হবে খ'ন!—হ্যাঁ, গানটা আর তোর ওরকাছে গেয়ে কাজ নেই,—হাজার হোক্ বড় হয়ে উঠেছিস কিনা—সেটা আমার চোখে দুষ্ট না হলেও সমাজের চোখ তো এড়াবেনা—

বুদ্ধিমতী রঞ্জনী বেশই বুঝিতে পারছিল, কথাগুলি দাদার নিজের কথা নয়—কপচানো বুলি মাত্র! অফিসে কিম্বা অন্য কোথাও কারুর কাছে সম্ভবত এইমাত্র ওইসকল উক্তি ও যুক্তি গুলি শুনে এসেছেন এবং সেই সদ্যশ্রুতযুক্তি গুলিই রঞ্জনীর উপরে উপদেশাকারে বর্ষিত হচ্ছে।

বাঁশী শেখার উপদেশ শুনে রজনীর হাসি পেল। এই যুক্তিটিই যে তার দাদার একান্ত নিজস্ব বুদ্ধি প্রসূত সে বিষয়ে তার বিন্দু মাত্রও সন্দেহ ছিলনা।

যেখানে আত্মীয় যুবকের কাছে সঙ্গীত শিক্ষায় নীতিবিগর্হিত কর্ম্ম বা সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়—বাঁশী শেখা সেখানে হয়তো আরও কুদৃশ্য এবং কদাচার রূপে গন্য হবে এসম্বন্ধে সহজবুদ্ধি সকলেরই আছে—নেই শুধু তার দাদারই।

রজনী উদ্গত হাসি চাপতে চাপতে অত্যন্ত বাধ্য ও নম্র ভাবে বললে—বেহালা শেখা কি তা'হলে বন্ধ করে দেব দাদা?

চন্দ্রভূষণ বাবু শশব্যস্তে বলে' উঠলেন—না—না—বেহালা শিখতে কে বারণ করেছে···অমন মিষ্টি বাজনা কি আর আছে?··শুধু সত্যর কাছে গানটা না গাইলেই হ'ল—বুঝলি?···

রজনী মাথা হেলিয়ে ইঙ্গিতে বুঝেছে জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চন্দ্রভূষণ বাবু অফিসের পরিচ্ছদ ছেড়ে উৎফুল্ল মুখে গুণ গুণ স্বরে গান গাইতে গাইতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কেশ-বিরল মাথায় সজোরে কড়া-বুরুশ্ ঘষতে ঘষতে ভাবতে লাগলেন—যাক্ সমস্ত গোল চমৎকার উপায়ে মিটিয়ে দিয়েছি! 'সাপও মরল লাঠিও ভাঙ্লনা'!·· এ'সব বুদ্ধি কি ছেলেমানুষ ওদের মাথায় আসে কখনও!

২

সত্যব্রত'র কাছে রজনী গান গাইত কমই, বেহালায় সুরের গৎ শিখতো বেশী।

দাদার কাছে গানের নিষেধ এবং বেহালা ও বাঁশীর হুকুম পেয়ে অবধি দ্বিগুণ-উৎসাহে তার বেহালা-সাধা বেড়ে উঠল। আগে বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শিক্ষার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল,—এখন সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যা—যখন তখন বেহালার ঝঙ্কারে পাড়া ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠতে লাগল। কিন্তু বাঁশীর শব্দ শোনা গেল না।

রজনী সত্যব্রত'র কাছে সুর-শিক্ষা করে বটে কিন্তু কথা ক'য় কম। যা'ও বা কথা ক'য় সে কথা সর্ব্বদাই সকৌতুক-হাসির অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিত।

সেই ব্যঙ্গ-আভাস-ব্যঞ্জিত বিচিত্র হাসির বোরখায়মোড়া কথাবার্ত্তার সত্যরূপটির আন্দাজ করে নেওয়া ছাড়া স্পষ্ট চিনবার উপায় নেই। সে আন্দাজ করার মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে, সুতরাং রজনী যখন কথা বলে, তখন তার মুখের পানে তাকিয়ে নিরন্তর সন্দেহ-দোলায় দুলতে হয়,—কোন্ কথাটি সে সত্য বলতে চাইছে এবং কোন্ কথাটিই বা ব্যঙ্গ করে' বল্‌ছে!···

বিকেল বেলায় রজনী বেহালায় 'গৌড়সারং' সাধছিল।

সত্যব্রত এসে সেখানে দাঁড়িয়ে বললে—বিকেল বেলায় 'গৌড়সারং' বাজাচ্ছো কেন রজনী?—

—ও ও-ও—ভুল হয়েছে—বলে রজনী সুরের অর্দ্ধপথে ছড়িটানা বন্ধ করে' আবার একটি সুর সুরু করলে।

সত্যব্রত ভ্রূকুঞ্চিত করে' বললে—ও কি? এ'সময়ে 'মালকোষ' সুরু করলে?…আশ্চর্য্য!

রজনীর মুখে তার স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গহাসি ফুটে' উঠেছিল। বললে—ওহো—এটাও ভুল হয়ে গেছে সত্যব্রত বাবু!—বিকেলবেলা মুলতানী, বারোঁয়া; পিলু, পূরবী এই গুলোই প্রশস্ত, নয়?… আমার মনে থাকেনা মোটেই -

রজনীর কণ্ঠস্বরে অপ্রতিভতা বা লজ্জার লেশ মাত্রও ছিলনা, বরং কৌতুকেরই আভাস পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠায় সত্যব্রত ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠল। বললে—যার স্মৃতিশক্তি এত কম, তার কিছু শেখবার চেষ্টা না করাই ভাল।

রজনী নিরুত্তরে নতমাথায় মৃদুমন্দ-হাস্যে বেহালার তারে উদাস্ করুণ 'পিলু' রাগিণী সঞ্চারিত করে' তুললো।

বাজনার প্রতি পংক্তিতেই ভুল ও সুরস্খলন হ'তে লাগল।

সত্যব্রত ললাট ও ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করে' বিরক্তিপূর্ণ মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে বসে রইল।

রজনী নির্ব্বাক্ মুখে আপনমনেই বেহালার ছড়ির ঘায়ে 'পিলু রাগিণী'র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যদৃচ্ছা বিকৃতি ঘটাতে লাগল।

হঠাৎ সত্যব্রত অসহিষ্ণুস্বরে বলে উঠল—ও' কি রকম বাজাচ্ছো রজনী! ভুল হচ্ছে বুঝতে পারছোনা?

রজনী নিরুত্তরে আপনমনে বাজাতে লাগল।

সত্যব্রত আরও তীব্রস্বরে বললে—বেসুরো হ'চ্ছে যে—

রজনীর খোঁড়া সুলো কাণা 'পিলু' তবুও বন্ধ হ'লনা।

সত্যব্রত এবার রূঢ়স্বরে বলে উঠল—কথাটা কি গ্রাহ্য হচ্ছেনা রজনি?

রজনী বাজনা না থামিয়ে ইসারায় উত্তর দিলে—গ্রাহ্য হচ্ছে।

সত্যব্রত ক্রোধে অপমানে আত্মহারা হ'য়ে কটুকণ্ঠে বলে ফেললে—তোমার মত অদ্ভুত দাম্ভিক-মেয়ে আমি এর আগে দেখেছি বলে' মনে হয় না!…কিসের এত অহংকার তোমার বলতে পারো?—সত্যব্রত'র সুগৌর মুখখান তখন অপমানে ও উত্তেজনায় আরক্তিম হ'য়ে উঠেছে।

এইবার রজনী বেহালাটি বাম কাঁধ হ'তে কোলের উপরে কাৎ করে' শুইয়ে মুখ ফিরিয়ে সত্যব্রতর পানে তাকিয়ে বললে—বলতে পারি।

সত্যব্রত তখন রাগে জ্ঞান হারিয়েছে। জ্বালাকটু স্বরে বলে উঠল—তুমি ভাবো অমনি করে ঠোঁট টিপে বিদ্রূপের হাসি হাসলেই তোমাকে ভারী সুন্দরী দেখায়,—কিন্তু তা' মোটেই নয়। তুমি যে কত কুৎসিৎ,—কত বেশী কুৎসিৎ—তা' তোমার ধারণাই নেই।

রজনীর মুখে অপমান কিম্বা ক্রোধের আভাসমাত্রও দেখা গেলনা, বরং তার রহস্য নিবিড় কালো চোখ দু'টি কৌতুকে ঝল্‌মল্ করে' উঠল। বললে—সত্যি, সত্যব্রত বাবু, আপনার এ' কথাটি আমি একটুও অবিশ্বাস করিনা। আয়নাগুলি আমার সঙ্গে যে প্রবঞ্চনা করে, এটা আমারও খুব সন্দেহ হয়।—

রজনী মৃদু হাসতে হাসতে বেহালাটি কাঁধে টেনে নিয়ে 'হাসির গান' বাজাতে সুরু করে দিলে!—

"—বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল
নবরত্ন ন'ভাই—
তানসেন ছিলেন মহাওস্তাদ
এলেন তাঁহার সভায়—"

সত্যব্রত তীব্রদৃষ্টিতে রজনীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে' দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করে' চলে গেল।

* * * * *

রজনী বলে—আচ্ছা সত্যব্রত বাবু, আমি ভুল বাজালে আপনি এত চটেন কেন?

সত্যব্রত বলে—আমি তোমাকে শেখাই বলে: লোকে ভাববে আমিই তোমাকে ভুল শিখিয়েচি!—

রজনী হেসে বলে—আচ্ছা, আমি সকলকার কাছে ব'লবো, আমি যে-সব সুর বাজাই,—সে-সব আমার নিজের তৈরী-সুর!

সত্যব্রত অসহিষ্ণুস্বরে বলে—ও' যে মোটে সুরই নয়, বেসুর!

রজনীর ওষ্ঠাধরে আবার সেই বিচিত্রভঙ্গীর হাস্যরেখা সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বলে—সকলেই তো সুর শেখে,—আমি না'হয় বেসুরই শিখলুম!—

সত্যব্রত ক্ষিপ্তস্বরে বলে...'বেসুর' শিখবার জন্য সত্যব্রত রায়ের ছাত্রী হওয়ার তো কোনও প্রয়োজন নেই রজনি!...

সত্যব্রতর সঙ্গে এইরকম ধরণের বাগবিতণ্ডা প্রায়ই চলত, আর, এইরকম অপ্রিয় প্রসঙ্গালোচনা আরম্ভ হলেই রজনী নিরুত্তরে নতমুখে মৃদু মৃদু হেসে বেহালায় ছড়ি টেনে কমিক্‌গানের সুর ভাঁজতো। এখনও তার ব্যতিক্রম হ'লনা। রজনীর বেহালা চঞ্চল কণ্ঠে গেয়ে উঠ"....

"রাজা অশোকের ছিল ক'টা হাতী,
টোডরমল্লের ক'টা ছিল নাতি..."

সত্যব্রত ক্রোধান্ধচিত্তে বাইরের ঘরে গিয়ে চন্দ্রভূষণবাবুকে বললে...আমি তোমার বোন্‌কে গান-টান শেখাতে পারবোনা...

চন্দ্রভূষণ বাবু তখন নিরতিশয় মনোযোগ সহকারে "বাঙালীর মস্তিষ্ক এবং তাহার খাদ্য" শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করছিলেন।

টেবিলের উপরে বিস্তৃত ফুলস্ক্যাপ-কাগজ হ'তে দৃষ্টি না তুলে নতমস্তকে লিখতে লিখতেই উত্তর দিলেন·· গান না'ই বা শেখালে! আমি তো ওকে গান গাইতে বারণ করে' দিয়েছি। বরং বাঁশীটা একটু ভালো করে শিখিয়ো·· মন্দ হবেনা···

সত্যব্রত অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠল···না ভাই, আমি তোমার বাড়ী থেকে বিদায় নিতে চাই। রজনীকে আমি কিছুই শেখাতে পারবো না।

চন্দ্রভূষণবাবু হাতের কলমটি 'পেন্-ষ্ট্যাণ্ডে'র উপরে নামিয়ে রেখে নিকেল্-ফ্রেমের চশমা জোড়াটি নাক থেকে টেনে খুলে ·উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে সত্যব্রত'র মুখের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন ক'রলেন··· কি হয়েচে ?

সত্যব্রত মুখ অন্ধকার করে' বল্‌লে···রজনী আমায় তাচ্ছিল্য করে,···অগ্রাহ্য করে···

চন্দ্রভূষণবাবু বিস্ময়চকিত মুখে বলে উঠলেন·· সে কি? পাগল হয়েছ নাকি তুমি—না—না— রজনী তো তেমনতর মেয়ে নয়!

সত্যব্রত পূর্ব্ববৎ মেঘাচ্ছন্ন মুখেই বল্‌লে—না, আমি এখান থেকে যাবই স্থির করেছি·· পরান্নভোজী পরাশ্রয়বাসী মানুষ সকলেরই ঘৃণার পাত্র হয়,—ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পাত্র হয়। এতে বেশী কিছু বিস্ময়ের ব্যাপার নেই চন্দ্র!—

চন্দ্রভূষণবাবু উঠে দাঁড়িয়ে সত্যব্রত'র পিঠ চাপড়ে, হাঃ হাঃ শব্দে হেসে বললেন আরে এখনি যাবে কোথায়? আগে একটা কাজকর্ম্মের যোগাড় হোক্—তুমি ক্ষেপেচো নাকি সত্যব্রত?···বোসো, আমি এখুনি সমস্ত ঠিক করে দিচ্ছি—বলতে বলতে চন্দ্রবাবু সত্যব্রতকে কথা কইবার অবকাশমাত্র না দিয়ে তাড়াতাড়ি অন্দরের দিকে অগ্রসর হ'য়ে চীৎকার করে ডাকাডাকি আরম্ভ ক'রলেন—রজনি—রজনি—

রজনী ঘরের ভিতরে লুচির ময়দা মাখছিল। ভিজে ময়দা জড়ানো হাতে শঙ্কিত মুখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বল্‌লে—কেন দাদা?—

—তুই সত্যব্রতকে অপমান করেছিস্?···এত বড় তোর আস্পর্দ্ধা?

রজনীর চখে মুখে তীব্রবিস্ময় ফুটে উঠল। কিন্তু সে সহজকণ্ঠেই বল্‌লে—তোমায় এ'কথা কে বললে দাদা?—

চন্দ্রবাবু আগুণ হ'য়ে বল্‌লেন—সে খোঁজে তোর দরকার কি? ওঁকে অপমান করেছিস্ কিনা জানতে চাই এখনি!—

রজনী শান্ত পরিষ্কার কণ্ঠে উত্তর দিল—না।

—আবার মিথ্যে কথা!···আল্‌বৎ ওঁকে অপমান করেছিস। ওঁকে তুই বলেছিস্—এ' বাড়ী

থেকে চলে' যেতে!.. এটা কি তোর শ্বশুরবাড়ীর ভিটে? তুই যে মানুষকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুকুম দিস্!! আমি যদি তোকে বলি,—'বেরো আমার বাড়ী থেকে' তা' হ'লে কী হয়?.. অ্যাঁ? বল্না—চুপ করে রইলি কেন? উত্তর দে' দিকিন্ এবার?—

পিসিমা পূজার ঘরের ভিতর হ'তে মালা হাতে বেরিয়ে এসে বল্লেন—চুপ্ কর্ চন্দর্—ঢের হয়েছে! অত বড় মেয়েকে অমন করে 'তিরস্কের্' করতে নেই—

চন্দ্রবাবু দ্বিগুণ তর্জ্জন করে বলতে লাগলেন—তুমি চুপ করো পিসিমা! ওকে শিক্ষা দেওয়া দরকার! অতিরিক্ত আদরে বাঁদর হ'য়ে ওঠা আমি পছন্দ ক'রিনে।...অতটুকু মেয়ে ও'—কীসের জোরে নিজের শিক্ষককে বলে—'তুমি পরান্নভোজী, পরানুগ্রহজীবি,—অন্যের আশ্রয়ে আছ'—এ'সব কথা ও' শিখ্ল কোথা থেকে আমি জানতে চাই—

বাইরের ঘর থেকে চন্দ্রবাবুর চেঁচামেচি-তিরস্কার সুস্পষ্টই শোনা যাচ্ছিল।

রজনীর প্রতি চন্দ্রভূষণবাবুর প্রত্যেকটি অমূলক-অভিযোগে সত্যব্রত বিমূঢ় ও চঞ্চল হ'য়ে নিরুপায়-ক্ষোভে উত্তেজিত চিত্তে বারম্বার ঘরে ও বারান্দায় পাদচারণা করে ফিরছিল।

রজনীর প্রতি যে সকল অপরাধের অভিযোগ স্থাপন করে' চন্দ্রবাবু তাঁর উচ্চকণ্ঠের কঠোর-ভৎর্সনায় পল্লী প্রকম্পিত করে' তুলেছেন, তার সমস্তই প্রায় অমূলক। এবং ঐ সকল অভিযোগ সত্যব্রত চন্দ্রভূষণবাবুর কাছে আদৌ করেনি। সে তাই চন্দ্রবাবুকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে বার বার অন্দরের পথে অগ্রসর হয়েও—ভিতরে প্রবেশ ক'রতে পারছিল না। গভীর লজ্জা ও কুণ্ঠা তার পায়ে যেন শৃঙ্খল-বেড়ী পরিয়ে দিয়েছিল। রজনীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মুখ ছিল না।

ভিতর হ'তে তখন চন্দ্রবাবুর উচ্চ গ্রামের শাসন শোনা যাচ্ছে—বল্, কখনও আর এমন ক'র্বিনি! সত্যব্রতর কাছে তোকে মাপ চাইতে হবে!

পিসিমার গলার আওয়াজ শোনা গেল—তাই কর্ বাছা! পরের ছেলে, ভদ্দরলোক, কী-সব অপমান করিছিস্—মাপ চেয়ে নে,—গোল মিটে যাবে। আর অত বাজনা টাজনা শিখে কাজ নেই!—

চটীজুতার চটাস্-পটাস্ ধ্বনি তুলে চন্দ্রভূষণবাবু বাইরের ঘরে এলেন। পিছু পিছু এল নতমুখী রজনী!

চন্দ্রবাবু এইবার অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও কোমলকণ্ঠে বললেন—সত্যব্রতর সামনে হেঁট্ হ'য়ে বল্—'আর কখনও আপনাকে অপমান ক'রবো না। আমি অন্যায় করেছি, মাপ করুন।'

ত্রস্তকণ্ঠে সত্যব্রত হাঁ-হাঁ করে বাধা দিতে-না-দিতেই রজনী জানু পেতে সত্যব্রত'র সামনে ব'সে পড়ে নত হ'য়ে বললে—'আর কখনও আপনাকে অপমান ক'রবো না। আমি অন্যায় করেছি, মাপ করুন।'

রজনীর মুখভাবে কিন্তু অনুতাপ লজ্জা দুঃখ বা সঙ্কোচের ছায়ামাত্রও ছিল না। দিব্য নির্ব্বিকার সহজমুখে চন্দ্রভূষণবাবুর মুখের বাক্য ক'টি কলের পুতুলের মত আবৃত্তি করে' সত্যব্রত কিছু বলার পূর্ব্বেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল।

অপ্রতিভ-সত্যব্রত নিজের নির্দ্দোষতা সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ দেবারও অবকাশ পেল না। বিপুল লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে সত্যব্রত ভাবতে লাগল—রজনী তাকে মিথ্যাবাদী ও হীন ঠাহরিয়া গেল নিশ্চয়।

চন্দ্রভূষণবাবু তখন ঈজিচেয়ারে লম্বা হয়ে এলিয়ে পড়ে বিপুল আত্মপ্রসাদের হাসি হাসতে হাসতে বলছিলেন—কেমন? দেখলে তো সত্যব্রত? বোনকে আদরও যেমন দিতে জানি, শাসনও তেমনি করতে জানি।…আর কেউ রোজিকে মাপ চাওয়াক্ দিকি কারুর কাছে!! হুঁ-হুঁ—ওকে খুন করে' ফেললেও তা' হবেনা, বলতে পারি।

আসল কথা চন্দ্রভূষণবাবু নিজেই মোটে ভাবতে পারেননি যে রজনী তাঁর ধমকে এমন নীরব ও অবনম্র হ'য়ে সত্যব্রতর কাছে মাফ চেয়ে নেবে!

সেই বিস্ময়টাই আত্মগৌরবে রূপান্তরিত হ'য়ে তাঁকে আত্মপ্রসাদ দান ক'রছিল।

সত্যব্রত নিঃশব্দে আড়ষ্ট ভাবে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে শূন্যদৃষ্টি মেলে বসে রইল।

রজনীর ভাসা ভাসা স্নিগ্ধ কালো চোখ দু'টি ও কৌতুক-হাস্যরেখাঙ্কিত কালো মুখখানি যতই তার মানসনয়নে ফুটে উঠতে লাগল ততই নিবিড় লজ্জা গ্লানিতে সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে লাগল। মনে হতে লাগল—রজনীর সামনে হ'তে চিরদিনের মত সরে যেতে না পারলে বুঝি এ লজ্জার অবসান হবে না!—

চেয়ারে শায়িত চন্দ্রভূষণবাবুর আত্মগরিমা ও উচ্ছল হাসি তখনও পূর্ব্ববৎ সমান স্রোতে বহে চলেছে!

৩

আগের দিন সন্ধ্যায় সেই অবাঞ্ছিত-ঘটনাটা ঘটে' যাওয়ার পর সত্যব্রত আর রজনীর সামনে মুখ তুলতে পারেনি।

দুপুরে কোনও মতে স্নানাহারটা সেরে নিয়ে সেই যে বিছানায় গিয়ে শুয়েছে—বেলা পশ্চিম প্রান্তে গড়িয়ে এল, তখনও সে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে কত-কি এলোমেলো-ভাবনা ভাবছিল।

বাঙ্গালোরে একটা চাকুরীর দরখাস্ত করেছে, আজকালের মধ্যেই তার সংবাদ পাবার কথা—যদি সেখানে চাকরীটা হয়, ভালই,—নচেৎ সে অন্য যে কোনখানে হোক্ চলে যাবে—ভাগলপুরে আর থাকবেনা।

মা ও ছেলে

অতীতের হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনা-ভরা ঘটনাবহুল দিনগুলি স্মৃতিপটে চলচ্চিত্রের ন্যায় একটির পর একটি ফুটে উঠে,—দূর-প্রবাসে অনাত্মীয় আশ্রয়ে বর্ত্তমানের দিনখানি তার বেদনা-কাতর করে' তুলছিল।

রজনী এসে সত্যব্রত'র শিয়রের দিকে রুদ্ধ জানালাটা খুলে দিতে দিতে বললে—অবেলায় এখনও শুয়ে আছেন যে! অসুখ করেনি ত?

সত্যব্রত অপ্রতিভ মুখে নিজের বেদনাবিহ্বল আত্মবিস্মৃত ভাবটি সম্বরণ করে' চোখ মুখ মুছতে মুছতে উঠে বসল। বললে—অত বেলা গেছে টের পাইনি।

রজনী আর একটা জানালা খুলে দিতে দিতে বললে—চলুন, আপনার জলখাবার তৈরী হচ্ছে। নিশীথ আপনার জন্য বসে আছে।

—এই যে যাই—বলতে বলতে সত্যব্রত উঠে আন্‌লা হ'তে শার্টটা টেনে নিয়ে গায়ে চড়াতে সুরু করলে।

রজনী যেমন সহজভাবে এসেছিল তেমনি সহজভাবেই বেরিয়ে গেল।

প্রতিদিন বিকালবেলা সত্যব্রত রজনীকে নিয়মিত ভাবে গান শেখাত।

আজও শিখাতে বসল।

রজনী প্রথমেই বাজনায় একটি কমিকে'র সুর তুলে গম্ভীর মুখে প্যারডি গাইতে সুরু করলে।

আজ আর সত্যব্রত রেগে উঠল না। হেসে ফেলল। কিন্তু সে-আজ একটু লজ্জা-মিশ্রিত।

রজনী ক্রমাগত ভুল-গৎএর পরে ভুল-গৎ বাজিয়ে চলল।

যার অন্তরাটা অতিকষ্টে নির্ভুল হয়, আস্থায়ীটা একেবারেই অচল হয়ে পড়ে।—সত্যব্রত সংশোধন করতে করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

আবার রজনীকে মৃদু ভর্ৎসনা ও উপদেশ—

আবার রজনীর সেই নিরুত্তর সকৌতুক-হাসি—

সত্যব্রতর মনের পুঞ্জীভূত সঙ্কোচমেঘ কেটে গিয়ে সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যের নির্ম্মলাকাশ কখন যে বিভাসিত হয়ে উঠল—সে নিজেই তা' টের পেল না।

রজনী মৃদু মৃদু হাস্যে একান্ত মনঃসংযোগে সুরের ভুল সংশোধনে ব্যাপৃতা হ'য়ে পড়্‌ল।

*　　*　　*　　*　　*

কালো-রজনী দুনিয়া শুদ্ধ লোকের রূপের বিচার করে। অন্তরঙ্গ সখী প্রতিমার সঙ্গে এই নিয়ে প্রায়ই খুন্‌সুটি চলে।

প্রতিমা বলে—রজু, তুই নিজে কি সুন্দরী যে লোকের রূপের ব্যাখ্যা করিস্?—

রজনী বলে—নিজের ও'বালাই নেই বলেই তো নির্ভয়ে ও নিরপেক্ষভাবে ওর বিচার করতে পারি।

প্রতিমা বলে—ভাগ্যিস্ বিধাতা তোকে সুন্দরী করেন নি, তা'হলে হয়তো তুই দুনিয়াকে গ্রাহ্যই ক'রতিস্‌নে!

রজনী হেসে বলে—এখনই কি করি বলে মনে হয়? বরং রূপ থাকলে হয়তো গ্রাহ্য করতে হত! রূপ না থাকায় দুনিয়ার কাছে কিছু পেতে, চাইতে বা দিতেও হবে না!—

প্রতিমা বলে- তোর কথা গুলো যেন অন্ধকার, হাত্‌ড়ে খুঁজতে হয়!

রজনী তার স্বভাবসিদ্ধ হাসির সঙ্গে বলে—রজনীর অন্ধকারইত স্বাভাবিক।

প্রতিমা বলে—শুক্ল পক্ষও তো আছে—

রজনী হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে জানায়—না।

প্রতিমা রাগ করে বলে—তোর সবই যেন হেঁয়ালি, স্পষ্ট করে বলতে পারিস্ তো বল—

রজনী বলে—তোদের সঙ্গে আমার দেহের রংয়ে যেমন অমিল্, মনের রংয়েও ঠিক তত খানিই অমিল্।

প্রতিমা বলে—কেন? তোর অন্তরে স্নেহ প্রেম, সাধ ভালবাসা কিছুই কি নেই বলতে চাস্?

রজনী উত্তর দেয়—তা'কেন? আমার জীবন তোদের মত দেনা পাওনা'র করবার নয়, সেই কথাই বল্‌ছি।

প্রতিমার সুন্দর মুখে অবিশ্বাসের বাঁকা-হাসি ফুটে ওঠে। বলে—অনেকেই অমন কত কি বলে। আচ্ছা এর পরে দেখে নেব তখন—

কালোরজনীর লাবণ্যহীন মুখে সেই বিদ্রূপ ভঙ্গীর হাসি ফুটে ওঠে, সে যেন তার এই কুশ্রীতা রাশিকে বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে চায়। ঐ ব্যঙ্গহাসির প্রস্তরান্তরালে হয়তো তার অশ্রু'র ঝরণা লুকিয়ে আছে বা!

সত্যব্রত এই কালো মেয়েটির অকুণ্ঠিত সপ্রতিভতায় আশ্চর্য্য না হয়ে পারেনা।

নিজের রূপের দৈন্যে এতটুকু কুণ্ঠা নেই; ক্ষোভ নেই···অতৃপ্তি বা সঙ্কোচ নেই···এমনতর তরুণী নারী তার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।

সত্যব্রত'র মনেহয়, রজনী যদি ফর্সা হ'ত তা'হলে বোধহয় তাকে মানাতনা।

তার নিকষ পাথরের মত কালো রং, নিবিড় কালো চুলের গোছা, ঘন পক্ষ্মঘেরা স্নিগ্ধ চোখ দু'টি, তার 'রজনী' নামটি পর্য্যন্ত···সবই যেন তার প্রকৃতির সঙ্গে সুন্দর সামঞ্জস্যে মিলেছে। এতে যেন সে কুরূপেও এক নূতনতর অভিনব লাবণ্যময়ী হয়ে উঠেছে।

*   *   *   *   *

সত্যব্রতর ভয়ানক ডেঙ্গুজ্বর।

যাতনায় ছট্‌ফটানি ও কাতরানির বিরাম নেই। রজনী অসঙ্কুচিত ভাবে অহরহ শুশ্রূষা

করছে... মমতাময়ী মায়ের মত...স্নেহশীলা বোনটিরই মত। রোগীর যাতনা উপশমের জন্য সযত্ন প্রয়াসের অন্ত নেই।

সত্যব্রতর অসুখে রজনীর এই সেবাযত্ন পিসিমার চখে ভাল লাগেনা।

রজনীকে আড়ালে ডেকে বললেন...তুই সোমত্ত মেয়ে, পর-ব্যাটাছেলেকে ঘরের মানুষের মত অমনকরে যত্ন আত্যি করলে ভাল দেখায়না।...

রজনী বললে...কে দেখবে তা'হলে রোগা মানুষকে? তোমরা যদি দেখতে শুনতে, তা'হলে তো ভালই হত।

পিসিম রাগকরে বললেন...তুই না থাকলে কি ওর সেবা হ'তনা বল্‌তে চাস্?...

রজনী উত্তর দিলেনা।

প্রতিবেশিনীরা বেড়াতে এসে পিসিমাকে নাকি ইঙ্গিতে পাঁচকথা শুনিয়ে যায়।

চন্দ্রভূষণবাবুর আহারের কাছে পিসিমা পাখা হাতে নিয়ে ব'সে নানা ভঙ্গিতে সেই কথাই আরম্ভ ক'রলেন।

চন্দ্রবাবু কথাটা শুনে প্রথমে বিপুল বিস্ময় ভরে বলে উঠলেন...সত্যব্রত'র অসুখে রজু সেবাযত্ন ক'রছে, সে তো খুব ভাল কাজই করছে পিসিমা! · ...

সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে অবস্থার বিপাকে এই দূর বিদেশে পরের বাড়ীতে এসে অসুখে পড়েছে এ'সময়ে ওকে স্নেহযত্ন না করা অত্যন্ত অমানুষের কাজ যে!

পিসিমা বললেন ..হাজার হোক পরের ছেলে...আত্মীয় তো নয়!...

চন্দ্রভূষণবাবু পিসিমার কথা সমস্ত শেষ হ'তে না দিয়ে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন · সেই জন্যই তো আরও বিশেষ যত্ন করা উচিত! যাতে ওর মনে কোনও দুঃখ বা অভাব বোধ না হয়!...

পিসিমা মুখ ভার করে বললেন...কিন্তু আইবুড়ো মেয়ের এইরকম বদ্‌নাম রট্‌লে যে জন্মেও বিয়ে হবেনা!...একে তো রূপ নেই, তার উপরে যদি...

চন্দ্রবাবু এইবার ক্ষেপে উঠলেন।

...বদ্‌নাম রটায় কে বলো?...আতুর রোগীর শুশ্রূষা করলে বদ্‌নাম রটবে?...আর তাকে সেবাযত্ন না করে' অবহেলায় ফেলে রেখে দিলে খুব সুনাম হবে?...অদ্ভুত যুক্তি কিন্তু তোমাদের!

পিসিমা আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন...কিন্তু আমারই যে জ্বালা বাবা,...পাড়ার গিন্নিরা আমাকেই পাঁচকথা শুনিয়ে যায়। ও'মেয়ে তো সেসব কথা শুনেও গেরাহ্যি করেনা।

এই অপ্রিয় প্রসঙ্গে চন্দ্রবাবুর চিত্ত তিক্ত ও তপ্ত হয়ে উঠল।

রজনী সেই সময়ে সেখান দিয়ে সত্যব্রতের পথ্য—মাগুরমাছের ঝোল ও পাঁউরুটীর টোষ্ট নিয়ে যাচ্ছিল।

যে অশান্তি ও বিরক্তি চন্দ্রবাবুর মনের মধ্যে ধূমায়িত হচ্ছিল…রজনীকে চখের সামনে দেখবা মাত্র সেটি দপ্‌ করে জলে উঠে, তাকেই কেন্দ্র করে মুক্তির পথ পেয়ে গেল।

আকস্মিক সরোষ চীৎকারে চন্দ্রবাবু বলে উঠলেন… পোড়ারমুখি…পাড়ার লোকের পাঁচকথা তুই কাণে শুনেও গ্রাহ্য করিস্‌না কিসের জন্যে?…আমরা তাদের খাই না পরি—যে তারা আমাদের পাঁচকথা শুনিয়ে যায়? তোর জন্যে যে মুখ দেখাবার উপায় রইলনা! পাড়ার সবাই যখন বল্‌ছে—সত্যর সেবা করা তোর উচিত নয়,—তুই কেন আমায় সে কথা জানাস্‌নি? আমার বন্ধুর সেবা তোদের কাউকে করতে হবেনা—আমি মাইনে করা নার্স এনে ব্যবস্থা ক'রবো! যাদের সেবা করলে পাড়ায় সুনাম হবে তাদের সেবা করিস্—

চন্দ্রবাবু আহার অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই উঠে দ্রুতপদে আঁচাতে চলে গেলেন।

তাঁর অসংলগ্ন ও অর্থহীন ভৎর্সনা বাক্যগুলি রজনী চুপ করে শুনে গন্তব্যপথে চলে গেল। মুখে চোখে ক্ষীণ কৌতুকরেখা ফুটে উঠল মাত্র।

ঘরের ভিতরে সত্যব্রত তখন বিছানায় উঠে বসেছে। তার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে চোখে গভীর-অপমান ও অভিমান যুগপৎ ভাবে ফুটে উঠেছে।

রজনী ঘরে ঢুকে সত্যব্রতর মুখের পানে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হেসে বললে—এই যে, আজ পাঁউরুটীর লোভে আগে থেকেই উঠে বসে আছেন দেখছি—

মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে যে এত গণ্ডগোল বকাবকি হয়ে গেল, রজনী যেন তার বাষ্পবিন্দুও জানেনা!

সত্যব্রত বললে—রজনি, খাবার রেখে দাও। তুমি এদিকে এস। আমি তোমায় একটা কথা বলতে চাই।

সত্যব্রতর কণ্ঠস্বর কম্পিত। মুখে গভীর অভিমান ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছায়া। চক্ষু জলে টলমল।

রজনী সত্যব্রত'র মুখের দিকে তাকিয়েই হেসে ফেললে। ঠোঁটে তার ফুটে উঠল সেই বিদ্রূপের ধরণের বিচিত্র ভঙ্গী। তাকে 'বিদ্রূপভঙ্গী' বললে ঠিক যেন বলা হয়না,—অথচ সেটা সেই রকমেরই কিছু!

অসুখের মধ্যে ঐ ক'দিন সত্যব্রত রজনীর মুখে তার দুর্ভেদ্য স্বভাবের স্বভাবসিদ্ধ হাসির কঠিন আবরণ খানি দেখতে পায়নি। অক্লান্ত সেবারতা রূপহীনা মেয়েটির অতল অন্তরের নিবিড় মমতাস্পর্শে, শান্ত চ'খের স্নেহ-স্নিগ্ধ-চাহনিতে রোগযন্ত্রণা ক্ষণে ক্ষণে বিস্মৃত হয়েছে।

রজনীর মুখের এই কঠিন হাসি অতি-নিকটবর্ত্তিনী রজনীকে যেন অত্যন্ত সুদূরবর্ত্তিনী করে' রেখে দেয়। মনে হয়, হাসির কঠিন শামুকের মধ্যে অন্তর্হিত তার গোপন-অন্তরের ধরা-ছোঁয়া পাওয়ার কোনও উপায়ই নেই বুঝি!

সত্যব্রতর হৃদয়াবেগ রজনীর ওষ্ঠাধরের চাপা হাসির ভঙ্গীতে অনেকখানি আহত হলেও সে বলে ফেল্‌ল—রজনি,—আমার জন্ম এখানে তোমায় সর্ব্বদাই অপমানিত হ'তে হচ্ছে, তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

রজনী বললে—কোথায় ?

—ব্যাঙ্গালোরে। আমার নতুন চাকরীস্থানে।

রজনীর কণ্ঠস্বরে কৌতুকের আভাস ফুটে উঠল। বললে—দাদাব মত নিয়ে,—না লুকিয়ে ?

বিস্ময়পূর্ণস্বরে সত্যব্রত বলে উঠল—লুকিয়ে কেন ?…ছি—ছি—

রজনীর মনোবৃত্তি সম্বন্ধে সত্যব্রতর ধারণা হঠাৎ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

ছি ! ছি ! রজনী বলে কি ? ওর মনটাও কি তবে দেহেব চামড়ারই অনুরূপ ?

সত্যব্রতর রক্তহীন বিবর্ণ মুখ তীব্র ঘৃণায় আরক্তিম হয়ে উঠল। বললে…ঐ কথা তুমি কল্পনা করলে কি করে রজনি ?… তোমাব মত পেলে আমি তোমায়…তোমায় বিবাহ করতে প্রস্তুত ছিলুম …এই কথাই তো বলেছি…

রজনী অসঙ্কোচে হাসিমুখে সত্যব্রত'র বিছানার পাশে টুলের উপরে ফর্সা ন্যাপকিন্‌খানি বিছিয়ে তার উপরে পথ্যগুলি সাজিয়ে রাখতে রাখতে বললে… না, আপনি তো বিয়ের কথা বলেননি। ব্যাঙ্গালোবে আপনার সঙ্গে যেতে পারবো কিনা জিজ্ঞেসা করছিলেন।

সত্যব্রত রাঙা হয়ে উঠল। উত্তেজিতস্বরে বললে…তাব কি ঐ অর্থ হয় ? অত বড় মেয়ে হয়েছো এ'কথারও ঠিক মানেও জানোনা কি ?

রজনী পূর্ব্ববৎ ভাবেই উত্তর দিলে… কি ক'রে জানবো বলুন ? এর আগে তো কেউ বিয়ে করতে চায়নি আমাকে !… মতও চায়নি !…ব্যাঙ্গালোরে সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাবও তোলেনি কেউ এর আগে…

সত্যব্রত ক্রুদ্ধস্বরে বলে ফেল্‌লে…কারুব তো এত বড় অধর্ম্মের ভোগ ঘটেনি যে তোমার মতন সুন্দরীকে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করতে চাইবে !…

এইবার রজনীর হাসির ফোয়ারা উৎসারিত হয়ে পড়ল। অফুরন্ত স্বচ্ছ জলস্রোতের মত সে হাসি যেন আব থামতে চায় না !

সত্যব্রত ধপ্‌ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে অন্যদিকে পাশ ফিরে শু'লো।

সে রজনীর কুরূপ সহ্য করতে পারে, সহ্য করতে পারেনা ঐ হাসি !

৪

স্নানাহারে সুস্থ হয়ে উঠবার পর রজনীকে একদিন সত্যব্রত স্পষ্টই বল্‌লে—পাড়ায় আমাদের নিয়ে নানারকম মিথ্যা গুজব উঠেছে ! আমি পুরুষমানুষ, আমার কিছুই ভয় ক'রবার নেই।

এই তো ব্যাঙ্গালোরে আসছে হপ্তায় চলে যাব,—তারপর আর আমার কোনও ভাবনাই থাকবে না! কিন্তু রজনি, এটা তোমার পক্ষেই কঠিন সমস্যা হয়ে রইল!—

রজনী বেহালার ছড়িতে রজন্ দিতে দিতে বল্‌লে—রইল বৈকি!

সত্যব্রত গম্ভীরমুখে বল্‌লে—এর জন্যে প্রকারান্তরে আমিই দায়ী। তোমাকে এমনভাবে নিন্দিত করে রেখে চলে যাওয়া আমার উচিত নয়!

রজনী বল্‌লে—নয়ই তো!

সত্যব্রত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রজনীর মুখের পানে তাকিয়ে বল্‌লে—তুমি আমার কথাগুলি 'সীরিয়াস্‌লি' নিচ্ছ তো?—

রজনী গুরুতর ভঙ্গীতে বল্‌লে—নিশ্চয়ই—

সত্যব্রত বল্‌লে—চন্দ্র আমার যা' করেছে, সে ঋণ পরিশোধের অতীত। কিন্তু রজনি, তোমার অন্তরের ঋণ আমায় যেন দৃঢ় শৃঙ্খলে বেঁধেছে!—আমি জানি তুমি আমায় কত—

সত্যব্রতর কথা শেষ না হতেই রজনী হঠাৎ এমন ক'রে হাসতে হাসতে মেঝেয় লুটিয়ে পড়্‌ল যে বেহালাটি কোল থেকে গড়িয়ে মাটীতে পড়ে গেল। দম আট্‌কে নিঃশ্বাস রোধ হ'বার উপক্রম, তবুও সে-হাসি আর বন্ধ হয়না:—

অপমানে সত্যব্রতর মুখ নিবিড় অন্ধকার হ'য়ে উঠ্‌ল। সেখান থেকে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে টাইম্ টেব্‌ল্ খুলে বস্‌ল। এখানে আর সে একদিনও অপেক্ষা করবেনা,—কালই কর্ম্মস্থানে যাত্রা করবে!

* * * * *

বছরখানেক পরের কথা।

শ্রাবণের অকাল-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

মেঘে মেঘে আকাশের সর্ব্বাঙ্গ পুরু আলোয়ানে ঢাকা।

ভাগলপুরে রজনীদের বাড়ীর সদর দরজার কড়া বেজে উঠ্‌ল।

রজনী উপর থেকে নেমে এসে দরজা খুলে দিলে।

স্যুট্‌কেস্ হাতে সত্যব্রত মৃদু হেসে বললে—চিন্‌তে পারো রজু?

রজনী হেসে বল্‌লে—পারি। আসুন।

সত্যব্রত বললে—তোমাদের বাড়ী একটি নতুন অতিথি বেড়াতে এসেছেন এবার।

সত্যব্রতর পাশে একটি তন্বী সুন্দরী তরুণী দাঁড়িয়েছিল। তার রত্নালঙ্কারের দ্যুতি বিচিত্র সুন্দর ভঙ্গীতে পরা সৌখীন্ রেশমী শাড়ী, জরীর পাদুকা'র ঔজ্জ্বল্য ও বিলাতী পুষ্পসারের মধুর সুরভি, দুয়ারের সামনেটি বর্ণে গন্ধে ঔজ্জ্বল্যে আমোদিত ও দীপ্ত করে তুলেছিল।

রজনী হেসে বল্‌লে—আসুন বৌদিদি?

সত্যব্রত বল্‌লে—উনি যে বৌদিদি, বুঝলে কি করে?…ভুলও তো হ'তে পারে!

রজনী অগ্রসর হয়ে পথ দেখিয়ে অতিথিদ্বয়কে উপরে নিয়ে যেতে যেতে বল্‌লে—আমার বোঝবার ভুল হয় না।

সত্যব্রত আর একটিও কথা বল্‌লে না।

রজনী সত্যব্রত'র স্ত্রী সুষমার হাত ধরে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে বল্‌লে—কাপড় ছাড়ো বৌদিদি, আলনায় শাড়ী আছে,—জল সাবান সব আছে—আমি তোমাদের চা জলখাবার তৈরী করে নিয়ে আসি।

সুষমা বিস্মিতমুখে এই কালো মেয়েটির ব্যবহার দেখছিল। তার স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে কিছুতেই মনে হয়না,—সুষমারা তার অভাবিত-অতিথি!

যেন প্রতিদিনই এমনি সময়ে সুষমা ও সত্যব্রত তার কাছে এসে থাকে এমনিই নিরুদ্বিগ্ন সহজ ভাব তার।

সুষমা রজনীর নিবিড় কালো মুখখানির দিকে বিস্মিতদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে ফেল্‌লে—আশ্চর্য!…হ্যাঁ ভাই, তুমিই না রজনী?…

রজনী মৃদুহেসে বল্‌লে—আশ্চর্য্য কি না সেটা ঠিক জানিনা বৌদিদি, তবে আমিই যে রজনী তাতে কোনোভুল নেই।

সুষমা অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লে—কিছু মনে ক'রনা ভাই। সব কথাতেই 'আশ্চর্য্য' বলে ফেলা—ওটা আমার একটা মুদ্রাদোষ।

রজনী হেসে বল্‌লে—আমারও একটা মুদ্রাদোষ আছে। সব কথাতেই হেসে ফেলি। হাসিটাই আমার মুদ্রাদোষ।

রজনী পরিপাটী করে চা ও জলখাবার তৈরী করে এনে সুষমা ও সত্যব্রতকে খাওয়ালে।

সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করলে—চন্দ্র কখন বাড়ী ফিরবে?

রজনী বল্‌লে—কাটিহারে গেছেন। আটটার ট্রেণে ফিরবেন।

সত্য বল্‌লে—কাটিহারে কেন?

—একটা বিবাহের সম্বন্ধের খোঁজ নিতে।

সত্যব্রত বিস্ময়-বিমূঢ় নেত্রে রজনীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—চন্দ্র কি আবার বিয়ে ক'র্‌ছে?

রজনী বললে—না, দাদার নয়, আমার।

সুষমা বিস্মিতমুখে কালো মেয়েটির এই লজ্জাহীন কথাবার্ত্তা শুনছিল।

সত্যব্রত কথাটা চাপা দেবার জন্যই যেন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলে—নিশীথ কোথায়? পিসিমা কই—

রজনী বললে—নিশু ফুটবল খেলতে গেছে। এখনো ফেরেনি। পিসিমা মারা গেছেন।

সত্যব্রত উৎকণ্ঠিত স্বরে বললে—কবে ?

রজনী মৃদু হেসে বললে—মাস আষ্টেক হবে বোধ হয়! হাসিটা কিন্তু এবার তার মুদ্রা-দোষেরই হাসি !

সত্যব্রত তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে একখানি অয়েলপেন্টিং ছবির প্রতি দৃষ্টি নিবেশ করলে।

চা'পান শেষ করে উঠে সত্যব্রত সারাবাড়ী ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল, এক বছরে কোথাও কিছুই বদলায় নি। সে একতালায় যে ঘর খানিতে থাকতো, সে ঘরটি ঠিক তেমনি ভাবেই সাজানো আছে। খাট, আলনা; টেবিল,—দেয়ালের গায়ে ব্রাকেটের উপরে রূপালী ফ্রেমের মধ্যে চন্দ্র ও সত্যব্রত'র ফটো সব ঠিক তেমনই আছে। মনে হয়না যে সত্যব্রত এক বৎসর এ ঘরে নেই। তার সব চিহ্নই সেখানে এমনি সুস্পষ্ট বর্ত্তমান !—

সত্যব্রতর মনটা অকারণে উদাস হয়ে উঠল।

সুষমা রজনীর সাথে তে'তলার ছাদে উঠে বললে—তোমার গান শুনবো ভাই—

রজনী হেসে বললে—গান গাওয়া তো অভ্যাস নেই বৌদিদি—বাজাতে বল তো পারি !

সুষমা বললে—তবে তাই-ই।

রজনী বেহালা নিতে নীচে নেমে এল। একটা বড় সিন্দুকের তলায় বেহালার বাক্সটি ধূলি বিবর্ণ হয়ে পড়েছিল। রজনী সেটাকে ধূলো ঝেড়ে টেনে বের করলে।

সুষমা বললে—তুমি কি এখন আর বাজাও না ভাই ? অমন ভাবে সিন্দুকের নীচে বাজনাটা পড়ে আছে যে !—

রজনী হেসে বললে—না, অনেকদিন বাজাইনি।

সুষমা বললে—কতদিন ?

রজনী উত্তর দিলে—তা—বছর খানেক হবে বোধ হয় !

খানিক বাদে সত্যব্রত নীচেয় বাড়ীর সামনের বাগানে চন্দ্রভূষণ বাবুর অপেক্ষায় পায়চারি করতে করতে শুনতে পেলে—তেতালার ছাদে বেহালায় জয়জয়ন্তী বাজছে,—অনিন্দ্য চমৎকার! কোনও খানে এতটুকু জড়তা বা ত্রুটী বিচ্যুতির লেশ নেই। সুনিপুণ মিঠাহাতে সুরের তরঙ্গ —শ্রাবণের শুক্লা-চতুর্দ্দশীর আধহাসি আধকান্না ভরা আকাশের আলোছায়াকে যেন বিমুগ্ধ বিধুর করে তুলেছে !

সত্যব্রত বিস্ময় স্তব্ধ মুখে অচল হ'য়ে বাগানের ভিতরে দাঁড়িয়ে রইল।

চন্দ্রবাবু বাড়ী ঢুকেই ভয়ঙ্কর চেঁচামেচি সুরু করলেন।—রুজ—রুজ—রুণু—রজনী তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এল।

—কাটিহারের সেই সম্বন্ধটার ভাল করে' খবর নিয়ে 'লুম রে! দ্বিতীয় পক্ষ। ছেলে-পিলেও অনেকগুলি। ভদ্রলোক কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ভারী বিপদে পড়েছেন। কালাশৌচটা গেলেই বিয়ে করতে চান্। আশ্বিনমাসে কালাশৌচ যাবে।—বললেন—'আমার রূপ টুপের দরকার নেই মশায়,—বয়স কুড়ি কেন,—পঁচিশ হলেও আমার দুঃখ ছিল না বরং সে আমার পক্ষে ভালই মেয়েটি একটু পরিশ্রমী ও শান্তশিষ্ট হলেই যথেষ্ট। যেন বুড়ো বয়সে এতগুলো কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে দ্বিতীয় পক্ষের হাতে দুর্ভোগ না ঘটে!—

তা' আমিও তাঁকে বলে এসেছি—দেখবেন মশায়, আমার বোনের বাইরেটা সুন্দর নয় বটে, কিন্তু অমন সুন্দর প্রাণ অল্পই মেলে—

রজনী দাদার গর্ব্বিত-বচন ভঙ্গীতে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

চন্দ্রবাবু আবার অনর্গল স্রোতে বল্‌তে লাগলেন—শুনলুম এঁর আগের স্ত্রীও কালো ছিলেন। ভদ্রলোক নিজেও কালো, তবে মনটি ভালো। তাঁর ভাবনা হয়েছে—সুন্দরী অল্প বয়সী বৌ এলে শেষকালে আধাবুড়ো কালো কুৎসিৎ স্বামীকে ঘেন্না কর'বে—

রজনী চুপ করেই রইল।

চন্দ্রবাবু ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন—কি রে? চুপ করে রইলি কেন?…কথা দেব কিনা বল্?

রজনী হাসিমুখে মাথা হেলিয়ে বল্‌লে—হাঁ, এই বেশ হবে দাদা! এইখানেই তুমি পাকা করে' ফেল।

সেকালে—
একালে
কুমকুম
এক আউন্স একটাকা চার আনা
শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং
৪৩, স্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

Velvet
HAIR-CREAM